বি. চাঁদ এণ্ড সন্স

১/৪ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া, ১৩৬৩

প্রকাশক :
তপনকুমার দাশ
বি. চাঁদ এণ্ড সন্স
৯/৪ পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :
কণাদ বসু
জাগরণী প্রেস
৪০/১বি শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলকাতা-৭০০০১২

প্রচ্ছদ ও বর্ণলিপি :
অরুণ বণিক

একজন সত্যিকারের রাজা

এক

১৮০৯ সালের ১লা জানুয়ারী। ভাগলপুরের ঘাটে একটা নৌকো এসে লাগলো। নৌকোর ওপর বসে দীর্ঘকায় সুপুরুষ এক বাঙালী, বয়স সাঁইত্রিশের কাছাকাছি। নৌকো থেকেই একজন লোক পাঠালেন, শহরে একটা বাড়ি ভাড়া করবার জন্যে।

বাড়ির খবর আসতেই তিনি নৌকো থেকে নামলেন। একটা পাল্কী করে শহরে নির্দিষ্ট বাড়ির দিকে চললেন। পাল্কীর আগে আগে চললো ভদ্রলোকের চাপরাসী।

পাল্কীর দরজা রাস্তার একদিকে বন্ধ ছিল, তাই যাত্রী সেদিককার রাস্তার কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু মাঝপথে হঠাৎ তাঁর কানে এলো, কে যেন ক্রুদ্ধকণ্ঠে কাকে থামতে হুকুম করছে। পাল্কী-বেয়ারারা পাল্কী থামায়। সঙ্গের চাপরাসী ভীতকণ্ঠে জানায়—হুজুর, সাহেব।

রাস্তার একধারে জেলার ইংরেজ শাসনকর্তা স্যার ফ্রেডারিক হ্যামিলটন ঘোড়ায় চড়ে একটা ইটের পাঁজা তদারক করছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো, কে একজন লোক সঙ্গে চাপরাসী নিয়ে পাল্কী চড়ে তাঁর সামনে দিয়ে যাচ্ছে। স্যার হ্যামিলটন রাগে ক্ষেপে উঠলেন। কেন?

অসাড় মৃতদেশে তখন দ্বাদশ আদিত্যের তেজে জ্বলছে বৃটিশভানু। মুঘল-বাদশাহীর উত্তরাধিকারীরূপে তখন ইংরেজ শাসকেরা নেটিভ লোকদের কাছ থেকে নবাবী সম্মান দাবী করতেন, ইংরেজপ্রভুর সামনাসামনি পড়ে গেলে, কোন নেটিভ ছাতা মাথায় দিয়ে কিম্বা ঘোড়ায় বা পাল্কীতে চড়ে যেতে পারবে না, রাস্তায় ইংরেজপ্রভুর সামনাসামনি পড়ে গেলে, ছাতা বন্ধ করে কিম্বা পাল্কী থেকে নেমে হেঁটে যেতে হবে। তাই একজন নেটিভকে তাঁর সামনে দিয়ে ভ্রূক্ষেপহীনভাবে পাল্কী চড়ে

যেতে দেখে, জেলার শাসক স্যার হ্যামিলটনের মাথা গরম হয়ে গেল। ঘোড়ার ওপর থেকেই তিনি আদেশ করলেন, উতার্ দেও!

পাল্কীর ভদ্রলোক সে আদেশে কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করলেন না, বেয়ারাদের পাল্কী চালাতে বললেন। একজন নেটিভের সেই ঔদ্ধত্য সহ্য করা স্যার হ্যামিলটনের পক্ষে সম্ভব হলো না। ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি পাল্কীর সামনে এসে অভদ্র ভাষায় পাল্কীর ভদ্রলোককে পাল্কী থেকে নামতে আদেশ করলেন।

ভদ্রলোক পাল্কী থেকে নামলেন। শান্তকণ্ঠে ইংরেজ-প্রভুকে বললেন, আমি জানতাম শিক্ষিত ইংরেজরা ভদ্রলোক!

স্যার হ্যামিলটন গালাগাল দিয়ে উঠলেন। ভদ্রলোক মৃদু হেসে অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, তোমার মতন লোকের সঙ্গে কথা কওয়া নিষ্প্রয়োজন।

এই বলে গম্ভীরভাবে পাল্কীতে গিয়ে উঠলেন এবং পাল্কীবাহকদের চলতে আদেশ দিলেন। সেই নেটিভ ভদ্রলোকের সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহের দিকে চেয়ে স্যার হ্যামিলটন তখনই শাস্তি দেবার সঙ্কল্প ত্যাগ করে বললেন, আমি দেখছি, কি করে ভাঙতে হয় তোমার মত নেটিভের আস্পর্ধা!

পাল্কী চলে গেল। চারদিক থেকে সাহেবের লোকেরা এসে পড়লো। স্যার হ্যামিলটন খবর নিয়ে জানলেন, সেই উদ্ধত অসভ্য নেটিভ হলো একজন বাঙালী, নাম রামমোহন রায়।

দুই

দেড়শো বছর আগেকার এই পরাধীন মৃতদেশে ভাগলপুরের রাস্তায় সেই একটি মুহূর্ত, বীজের মত ধারণ করে আছে সমগ্র বাঙালী জাতির বৈপ্লবিক আত্মমর্যাদাকে। সেই বিস্মৃতপ্রায় মুহূর্তের মধ্যে আমরা দেখলাম রামমোহনকে, দেখলাম বাংলার অবিনাশী ঐতিহাসিক চেতনার পুনরাবির্ভাবকে, দেখলাম প্রাচীন ভারতবর্ষে নতুন জাতের মানুষের

আদিপুরুষকে, দেখলাম বর্তমান ভারত ইতিহাসের আদি বিপ্লব-পুরুষকে।

স্যার হ্যামিলটন সেদিন বাড়ি ফিরে উদ্ধত নেটিভকে শায়েস্তা করবার জন্যে কি ব্যবস্থা করেছিলেন, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসন্ধিৎসার ফলে আজ আমরা জানি রামমোহন কি করেছিলেন। রামমোহন তাঁর অসাধারণ ঐতিহাসিক চেতনার সাহায্যে সেদিনকার সেই ছোট্ট ব্যক্তিগত ঘটনার মধ্যে দেখেছিলেন, দুটি জিনিস……একটি হলো বিজিত জাতির অপমান, আর একটি হলো বিজয়ী জাতির অধঃপতন। যে জাতীয়তাধর্মের অভিনব ব্যাখ্যা কয়েক যুগ পরে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী নিয়ে এসেছিলেন, যার ফলে ইংরেজ-সভ্যতার পুরো মর্যাদা দিয়ে তাঁরা ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, রামমোহন ছিলেন সেই বিদ্বেষহীন নব জাতীয়তার জন্মদাতা। তাই সেদিন বাড়ি ফিরে এসে তিনি সেই সময়কার গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোকে একখানি পত্র লেখেন। দীর্ঘপত্র। রামমোহনের কোন জীবনীতেই সেই চিঠিখানির পরিচয় ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ সেই ঐতিহাসিক চিঠিখানিকে উদ্ধার করেছেন এবং এই চিঠিখানির মধ্যে যে রামমোহনকে আমরা খুঁজে পাই, কিংবদন্তীমূলক গল্পের কাঠের-দেবতা-স্বরূপ রামমোহনের চেয়ে তা আমাদের কাছে ঢের বেশী বরণীয়। এই চিঠিতে রামমোহন স্যার হ্যামিলটন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার লর্ড মিন্টোকে জানান এবং সেই প্রসঙ্গে সমগ্র জাতির হয়ে তিনি ইংরেজ রাজপ্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন, যাতে এইজাতীয় সরকারী ব্যবহারে বিজিত ও বিজয়ীর সম্পর্ক, এক পক্ষে অপমান অপর পক্ষে ঘৃণায় না কলঙ্কিত হয়। অতি স্পষ্টভাষায় সেই চিঠিতে রামমোহন বলেছিলেন, পূর্ব ও পশ্চিমের এই ঐতিহাসিক সংযোগের একান্ত প্রয়োজন আছে, বৃহত্তর জগৎ-ব্যাপারে আছে তার সার্থকতা। সেই বিরাট সার্থকতাকে সামনে রেখেই তার নিজের দেশে ইংরেজ যে ব্যক্তি-মর্যাদাকে জাতীয় ধর্ম হিসাবে গড়ে তুলেছে, এদেশেও অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে সেই ব্যক্তি-মর্যাদাকে দিতে হবে যোগ্য সম্মান।

এই হলো রামমোহনের চিঠির মর্মকথা। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই চিঠিখানি হলো বাংলার তথা ভারতের নবজাগরণের প্রথম প্রকাশ্য দলিল। লর্ড মিণ্টো চিঠিখানিকে কার্যত স্বীকার করেন।

তিন

এই প্রসঙ্গে দু'একটা কথা বলতে চাই, যে-কথাগুলো খুলে বলবার সময় এসেছে আজ। বাংলাদেশে, তথা ভারতবর্ষে, গত দেড়শো বছরের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন জাতের যে-সব বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে, ব্যক্তিত্বের ইতিহাসে তাকে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর বলা যেতে পারে। কিন্তু এই সব বিচিত্র বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষদের জীবনী যখনি পড়তে যাই, তখনি সর্বক্ষেত্রে দেখি, তাঁদের জীবনের অন্তঃপুরে ঢোকবার দরজা-জানলা সব তালাবন্ধ, এমন কি দেয়ালের ফাটলগুলোতে পর্যন্ত ছেঁড়া ন্যাকড়া গুঁজে রাখা হয়েছে, ভুলেও যাতে ভেতরের ব্যাপার দেখতে না পাওয়া যায়। তাই আমাদের দেশের জীবনচরিত-লেখকদের ভাগ্যে পড়ে থাকে শুধু কতকগুলি তারিখ, নৈর্ব্যক্তিক কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার সংবাদ, আর ভিত্তিহীন কতকগুলি কিংবদন্তী এবং সকল জীবনীর মূল কথা হলো, তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বেছে বেছে শুধু ভাল কাজ করে গিয়েছেন, সুতরাং তিনি মহাপুরুষ, পুণ্যাত্মা, মহর্ষি অথবা মহাত্মা। এই হলো আমাদের ঐতিহাসিক পুরুষদের জীবনী লেখার ফরমূলা এবং এইভাবে বড়লোকদের জীবনী আলোচনা করা মানে হলো তাঁদের প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো। আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমির জল-হাওয়ার গুণে এখানে কোন কৃতী পুরুষ জন্মগ্রহণ করলেই মহর্ষি বা মহাত্মা বা ঋষিকল্প হয়ে যান, তাঁর আপত্তি থাকলেও ভক্ত জীবনীকাররা শুনবেন না। আমাদের দেশে মানুষকে শ্রদ্ধা জানানোর একমাত্র পথ হচ্ছে, মানুষকে কাঠের দেবতায় পরিণত করা। এই কাষ্ঠ-পৌত্তলিকতা এমনভাবে আমাদের মনকে চেপে বসে আছে যে, ভক্তের বাঞ্ছা ভক্তিভাজনদেরও প্রভাবান্বিত

করে এবং তাঁরাও তাঁদের উত্তপ্ত প্রাণধারার বিচিত্র প্রকাশগুলিকে নিজেদের জীবনের সঙ্গোপন অন্তঃপুরে লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রেখে চাবিটি অতল সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে যান। এই জাতীয় মনোবৃত্তির প্রভাবে আজ আমরা জীবনকে, সমগ্র জীবনকে, বলিষ্ঠভাবে, সহজভাবে, সত্যভাবে দেখতে ভুলে গিয়েছি। প্রাণকে বাদ দিয়ে আমরা জীবনকে দেখি, তাই আমাদের জীবনী হয় প্রাণহীন, সাড়ে পাঁচ শ পাতার জীবনীর মধ্যে জ্বলে না একটাও প্রাণের শিখা, মরা-প্রদীপের শুকনো সলতের মতন তা দীপ্যমান করে তুলতে পারে না নতুন প্রদীপকে। সমাজ-চেতনা ও সাহিত্য দুই-ই পড়ে থাকে প্রাণহীন, অচল। যে বিচিত্র পথ দিয়ে এক-একটি জীবনকে আশ্রয় করে এগিয়ে চলে তপ্তপ্রাণের ধারা, সে-পথে আলোও যতখানি সত্য, আঁধারও ততখানি সত্য, সে-পথে পতন-স্খলন আছে বলেই আছে বীরত্ব, আছে মহত্ত্ব, আছে অশ্রু, আছে হাসি, আছে মানুষের তুচ্ছতা, তাই আছে দেবত্বে পৌঁছবার মহত্ত্ব। আমরা যাঁদের মহাপুরুষ বলি, তাঁদের মধ্যেই বেশী করে প্রকাশ পায় প্রাণের এই বিচিত্রলীলা এবং প্রাণের এই বিচিত্রলীলা হলো আমাদের সামাজিক ভাল ও মন্দের বিচারের বাইরে।

রামমোহনের যে জীবনী প্রচলিত হয়ে আসছে, সে হলো ভারতবর্ষের ধর্মগুরুদের সনাতন জীবনী এবং আমার বিশ্বাস, ভারতের অসংখ্য ধর্মগুরুদের মধ্যে আর একজন ধর্মগুরুকে পেতে গিয়ে আমরা আধুনিক কালের একটি বিচিত্রতম বিরাট প্রাণময় ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছি। রামমোহনের কথা ভাবলেই মনে পড়ে, এক বিরাট সাগরের মোহনা, তিনদিক থেকে তিনটি বিভিন্ন নদীর প্রচণ্ড স্রোত প্রবল বেগে সেই মোহনায় এসে পড়েছে, বিশাল বিস্তার প্রচণ্ড গতির আবেগে নিত্য স্পন্দমান, সেই স্পন্দমান প্রাণ-সিন্ধুর তরঙ্গ শীর্ষে শীর্ষে এসে পড়েছে প্রভাতের নব-সূর্যের রক্তিম ছটা। সুদূর দুর্গম শৈল-শিখর হতে একদিক থেকে আসছে প্রাচীন ভারতের প্রাণ-স্রোতস্বিনী, আর একদিক থেকে ছুটে আসছে উপল-বিক্ষত তরঙ্গ-সঙ্কুল প্রান্তর-বাহিনীর মত মুঘল-সভ্যতার সফেন ধারা, তৃতীয় দিক থেকে আসছে সদ্য-বন্ধনমুক্ত গিরি-

প্রপাতের বেগে পশ্চিমের প্রাণতরঙ্গিনী, তিনটি বিভিন্ন বিচিত্র ধারা প্রচণ্ডবেগে এসে পড়ছে একটি জীবনসমুদ্রের অগাধ নীলাম্বু-বিস্তারে...... সমুদ্রের বুকের ভেতর থেকেই উঠেছে রক্ত-গোলকের মত প্রভাত-সূর্য, ভারতের নবজীবন। সেই প্রচণ্ড প্রাণের সংযোগকে ধারণ করবার জন্যে তখন ভারত-ইতিহাসের প্রয়োজন ছিল প্রাণময় এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের, রামমোহন ভারত-ইতিহাসের সেই প্রাণময় পুরুষ। রামমোহন মহর্ষি কি ব্রহ্মর্ষি, তা জানি না, তবে রামমোহন যা তা তাঁর নামের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই জুড়ে গিয়েছে, রামমোহন হলেন রাজা। তাঁর মাথার বিরাট পাগড়ী টুপি যেমন আর কোন ভারতীয়ের মাথায় খাপ খায় না, কারণ অত বড় মাথা আর কোন ভারতীয়ের হয়নি, তেমনি আধুনিক ভারতীয়দের মধ্যে যদি কাউকে রাজা বলতে হয়, তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়......দিল্লীর শেষ হতভাগ্য বাদশাহ নয়, স্বয়ং ভারত-ভাগ্যবিধাতা তাঁকে রাজতিলক দিয়েই এই ভীত অর্ধমৃত মানবকদের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন। রাজার মতই ছিল তাঁর ঐশ্বর্য ও শক্তির বৈচিত্র্য।

একটি মারাত্মক ভুল

এক

১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ······কোম্পানীর আমলের শেষ বছর··· ··

বাংলাদেশে ব্যারাকপুরে কোম্পানীর সামরিক ছাউনীর প্যারেড মাঠে সকালবেলা হঠাৎ এক ক্ষিপ্তপ্রায় দেশী সিপাই, নাম মঙ্গল পাণ্ডে, একা বন্দুক হাতে চিৎকার করে উঠলো, ভাই সব, আর চুপ করে বসে থেকো না, ভগবানের দোহাই, বেরিয়ে এসো, গুলি করে মেরে ফেলো ফিরিঙ্গী শয়তানদের! মারো! মারো!

সার্জেণ্ট মেজর হিউসন্ সেখান দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সেই দৃশ্য দেখে এবং মঙ্গল পাণ্ডের সেই মারাত্মক ঘোষণা শুনে তৎক্ষণাৎ সামনের ছাউনির দেশী সিপাইদের আদেশ করলেন—গ্রেফতার করো।

কিন্তু হিউসন্ অবাক্ হয়ে দেখলেন, একজন সিপাইও তাঁর আদেশে নড়লো না! একি অসম্ভব ব্যাপার! দ্বিতীয় কথা উচ্চারণ করবার আগেই মঙ্গল পাণ্ডের বন্দুক থেকে একটা গুলি সশব্দে হিউসনের বুকে এসে লাগলো, হিউসন্ সেইখানেই মরে পড়ে গেলেন। গোলমাল শুনে লেফ্‌টন্যাণ্ট বাফ্ ঘোড়ায় চড়ে ছুটে সেই দিকে আসতেই, মঙ্গল পাণ্ডের বন্দুক থেকে আর একটা গুলি ঘোড়ার পেটে এসে লাগলো, ঘোড়-সওয়ার সুদ্ধ ঘোড়া মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাফ্ মঙ্গল পাণ্ডেকে লক্ষ্য করে পিস্তল ছুড়লেন, কিন্তু গুলি পাণ্ডের মাথা ঘেঁষে চলে গেল······পাণ্ডের বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল, কোমর থেকে নাঙ্গা তলোয়ার খুলে বাফের দিকে ছুটলো······

বাফ্ তখন কোমর থেকে নিজের তলোয়ার খুলে যেই উঠাতে যাবে, অমনি পাণ্ডে বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে তলোয়ারের এক আঘাতে বাফের মাথা ঘাড় থেকে নামিয়ে দিলো।

মঙ্গল পাণ্ডে লক্ষ্য করেনি, বাফের পেছনে আর একজন ইংরেজ

অফিসার ছুটে এসেছিল। বাফ্‌কে খুন করে পাণ্ডে যেই ফিরতে যাবে, অমনি সেই ইংরেজ অফিসার পাণ্ডেকে লক্ষ্য করে পিস্তল তোলে······কিন্তু ছোঁড়বার সময় পায় না, আর একজন দেশী সিপাই ছুটে এসে তলোয়ারের আঘাতে তাকে শেষ করে দিলো······

ইতিমধ্যে কর্ণেল হুইলার এসে পড়েছেন। পাণ্ডেকে দেখে গর্জে ওঠেন, পাকড়ো বদমাশকো! সিপাইদের মধ্যে একজন শান্ত সুউচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো, মঙ্গল পাণ্ডের গায়ে আমরা কেউ হাত দেবো না।

অভিজ্ঞ কর্ণেল নিমিষের মধ্যে বুঝতে পারেন,······তিনি একা। সামনাসামনি বীরত্ব না দেখিয়ে হুইলার বুদ্ধিমানের মতন ঘোড়া ছুটিয়ে জেনারেল হিয়ারসে-কে খবর দিলেন। হিয়ারসে তৎক্ষণাৎ ছাউনির য়ুরোপীয় বাহিনীকে আদেশ করলেন মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেফতার করতে।

প্যারেড মাঠ ঘিরে সশস্ত্র য়ুরোপীয় বাহিনী পাণ্ডেকে আক্রমণ করবার জন্যে ছুটলো······পাণ্ডে বুঝলো একা এতগুলো সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়······ততক্ষণে সে তার বন্দুকে নতুন করে গুলি ভরে নিয়েছিল······নিজের বুকে বন্দুক রেখে চালিয়ে দিলো······রক্তাক্তদেহে মঙ্গল পাণ্ডে পড়ে গেল······কিন্তু মরলো না।

ইংরেজ অফিসাররা তখনি পাণ্ডের রক্তাক্ত দেহ টেনে হাসপাতালে নিয়ে গেল এবং তাকে সারিয়ে তোলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চললো। পাণ্ডের প্রতি দরদে নয়, পাণ্ডে তো মরবেই, কিন্তু মরবার আগে তার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে, এ ব্যাপারটা কি? কে কে আছে এই বিদ্রোহের সঙ্গে সংযুক্ত?

দুই

নানাসাহেবের অসাধারণ বিপ্লব-বুদ্ধি ও সংগঠন-কৌশলের ফলে সেদিনও পর্যন্ত ইংরেজ-শাসকেরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি, সারা ভারত জুড়ে চলেছে কি প্রচণ্ড বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র। মঙ্গল পাণ্ডের সেই অসহিষ্ণু বীরত্ব ইংরেজ শাসকদের সতর্ক করে দিল। মঙ্গল পাণ্ডে

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রথম আত্মবলি দেবার গৌরব অর্জন করলো কিন্তু বিপ্লবের নীতি অনুসারে মঙ্গল পাণ্ডে ভুল করেছিল······ প্রচণ্ড ভুল করেছিল, সেই একটি অসহিষ্ণু মুহূর্তের ভুলের জন্যে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেই বিপুল আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায়, সমস্ত দেশকে পরাধীনতায় প্রায় আরও একশো বছর অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

জ্বলন্ত উল্কার মত মঙ্গল পাণ্ডে ভারতের স্বাধীনতার আকাশে একটি অগ্নি মুহূর্তের সৃষ্টি করে নিঃশেষে মিলিয়ে যায়। হাসপাতালে আংশিক সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক কর্তৃপক্ষ মঙ্গল পাণ্ডের কাছ থেকে খবর আদায় করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু সেই তরুণ ব্রাহ্মণ, আদর্শ বিপ্লবীর মতন, দ্বিতীয় কোন নামই উচ্চারণ করলো না। শুধু বললো, এ হলো তার ব্যক্তিগত জ্বালার প্রকাশ, ইংরেজ শাসনকে সে ঘৃণা করে, তাই এইভাবে সে প্রতিবাদ জানিয়েছে, যে ইংরেজ অফিসারদের সে খুন করেছে, ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই নেই তার। কর্তৃপক্ষেরা যখন বুঝলেন, মঙ্গল পাণ্ডের কাছ থেকে কোন খবরই আদায় করা যাবে না, তখন সামরিক বিচারে তার ফাঁসীর হুকুম হলো। ৮ই এপ্রিল ফাঁসীর দিন ধার্য হয়। কিন্তু ফাঁসীর আগের দিন, যেসব ডোম জল্লাদের কাজ করতো, তারা প্রত্যেকে অস্বীকার করলো, সেই দেশ-প্রেমিকের ফাঁসীতে তারা কেউই হাত লাগাবে না। কর্তৃপক্ষ সারা ব্যারাকপুর অঞ্চলে একজন লোককেও রাজী করাতে পারলেন না, অবশেষে কলকাতায় লোক পাঠিয়ে বিশেষ প্রলোভন দেখিয়ে গোপনে চারজন ডোমকে আনানো হলো······৮ই এপ্রিল ভোরবেলাতেই মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসী হয়ে গেলো।

মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ ও শাস্তি ব্যারাকপুরের দেশী সিপাইদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিলো, ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষেরা তাতে সহায়তা করলেন।

ব্যারাকপুর ছাউনির ইংরেজ সেনাপতি মঙ্গল পাণ্ডের রেজিমেন্টের যে দেশী সুবেদার ছিলেন, ষড়যন্ত্রের অপরাধে তাঁরও ফাঁসীর হুকুম দিলেন

এবং ছাউনি খানাতল্লাস করে যে সব কাগজপত্র পেলেন তা থেকে অনুমান করলেন যে, ছাউনির ভেতর রাত্রিবেলায় গোপনে ৩৪নং আর ১৯নং দেশী রেজিমেণ্ট মিলিতভাবে বিদ্রোহের জন্য পরামর্শ-সভা পরিচালনা করেছে। শাস্তিস্বরূপ এই দুই রেজিমেণ্টের সিপাহীদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হলো এবং সাময়িকভাবে রেজিমেণ্ট ভেঙে দেওয়া হলো।

ইংরেজ সেনাপতি ভেবেছিলেন, অনুতপ্ত হয়ে সিপাইরা ক্ষমা চাইবে, কিন্তু তার পরিবর্তে সিপাইরা নীরবে অস্ত্র রেখে দিয়ে চলে গেল এবং সকলে মিলে গঙ্গায় স্নান করে আনন্দে পাপ-মুক্ত হলো।

ব্যারাকপুরের ছাউনির সিপাইদের খবর যখন আম্বালার ছাউনিতে গিয়ে পৌঁছলো, আম্বালার ছাউনির সিপাইরাও বিদ্রোহের শপথ গ্রহণ করেছিল, তারাও উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং অদৃশ্য বিপ্লব-নেতার আদেশ ভুলে গিয়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে ইংরেজ অফিসারদের ওপর খণ্ড অত্যাচার শুরু করে দিলো। প্রতিদিনই ইংরেজ-অফিসারদের তাঁবুতে কিংবা বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে লাগলো। এই সমস্ত খণ্ড অনাচার থেকে ইংরেজ শাসকদের বুঝতে আর দেরি হলো না তলায় তলায় একটা বিরাট ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে। সেই মুহূর্তেই ইংরেজরা সতর্ক হয়ে উঠলো।

অদৃশ্য বিপ্লব-অধিনায়ক নানাসাহেবের পরিকল্পনা ছিল, সারা ভারতের বিভিন্ন ছাউনির দেশী সিপাইদের বিদ্রোহে রাজী করিয়ে, একটি নির্দিষ্ট দিনে একসঙ্গে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এই বিদ্রোহের অভ্যুত্থান হবে......এবং যতদিন না সেই নির্দিষ্ট তারিখ আসে, ততদিন কোন ষড়যন্ত্রকারী যেন ঘুণাক্ষরে বিপ্লবের কোন কথা বা ভঙ্গী প্রকাশ না করে। নানাসাহেব স্থির জানতেন যে, তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি অকস্মাৎ একদিন ভারতময় বিভিন্ন শহরে এই বিপ্লব-উত্থান হয়, তা হলে মুষ্টিমেয় ইংরেজ-সৈনিক আর তাদের সহায়কারীদের এক সপ্তাহের মধ্যে সমূলে উচ্ছেদ করে ভারতকে স্বাধীন করা আদৌ কঠিন হবে না। নানাসাহেব চেয়েছিলেন, এই আকস্মিক অভ্যুত্থানের বিদ্যুৎ আঘাতে যেন শত্রুপক্ষ সঙ্ঘবদ্ধ হবার অথবা আত্মরক্ষা করবার কোন সুযোগই না পায়।

ভারতের এই প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যিকারের ইতিহাস ইংরেজ আমাদের জানতে দেয়নি, এই সংগ্রামকে তারা শুধু কয়েক দল দেশী সিপাইয়ের বিদ্রোহ বলে জগতের কাছে পরিচয় দিতে চেষ্টা করে; কিন্তু আজ আমরা জানি, এই সিপাই-বিপ্লবই হলো ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং এই সংগ্রামের সর্বপ্রধান অধিনায়ক নানাসাহেব সেদিন ইংরেজের চোখের সামনে যে অসাধারণ কৌশলে ও মন্ত্রগুপ্তিতে সারা ভারতময় এই বিরাট ষড়যন্ত্র নিখুঁতভাবে গড়ে তুলেছিলেন, বিপ্লবের ইতিহাসে তা রাজনৈতিক প্রতিভা ও কূটনীতির অন্যতম চরম নিদর্শন।

আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ফরাসী-বিপ্লবের রোমান্টিক কাহিনী পড়ে বিমুগ্ধ হয়, কিন্তু আমাদের নিজেদের নিকটতম ইতিহাসের এই বিপ্লব-কাহিনী যে কতদূর রোমান্টিক এবং তার ভেতর যে কী প্রচণ্ড ভাবশক্তি, রাজনৈতিক কৃতিত্ব আর সামরিক বীর্য পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তার খবর আজও আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা জানে না। এই মারাঠা ব্রাহ্মণ উচ্ছ্বাসহীন সংগঠনশক্তি ও আবেগহীন মন্ত্রগুপ্তির অসাধারণ প্রয়োগে যে বিরাট বিপ্লবের আয়োজনকে সম্পূর্ণ করে এনেছিলেন, মঙ্গল পাণ্ডের একটি মুহূর্তের বল্গাহীন আবেগ তাকে অকালজাত শিশুভ্রূণের মত নষ্ট করে ফেলে। যে অসুবিধায় শত্রুপক্ষকে ফেলতে চেয়েছিলেন নানাসাহেব, মঙ্গল পাণ্ডের এই অসহিষ্ণু ভুলের জন্যে সেই অসুবিধাতে তাঁরাই হলেন ছত্রভঙ্গ, ব্যর্থ হয়ে গেল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রাণান্ত চেষ্টা।

তিন

সিপাই-বিপ্লবের বিরাট কাহিনী বলবার জায়গা এখানে নেই, তার ক্ষেত্রও এটা নয়। এখানে শুধু এই কথাটাই বলতে চাই, আজ সময় এসেছে, শুধু কংগ্রেসের উত্থানের ইতিহাস নয়, গত দুশো বছরের ভারতের বিপ্লব-সাধনার ইতিহাস লেখবার, যে দুশো বছরের বিপ্লব-

সাধনার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন নানাসাহেব আর এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র, একজন মারাঠা, আর একজন বাঙালী······আশ্চর্যের ব্যাপার, এই দুজনেরই বিপ্লব-নীতি, কৌশল, রাজনৈতিক ও সামরিক চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা···রাজনীতি ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র হলেন, মহাত্মা গান্ধীর নয়, নানাসাহেবেরই উত্তর-সাধক। এবং বর্তমান ভারতের এই দুই সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব-অধিনায়কের রাজনৈতিক সাধনার মূলে ছিল একই জিনিস, হিন্দু ও মুসলমানের অভেদ বিপ্লব-সাধনার ভেতর দিয়ে এক পতাকার তলে হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত ভারতবর্ষকে গড়ে তোলা। কংগ্রেস মুখে প্রচার করেছে হিন্দু ও মুসলমানের মিলন; কিন্তু ঘটাতে পারেনি তাদের মিলন, যার ফলে বাংলা আর পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করে পাকিস্তানের সৃষ্টি দ্বারা এই সমস্যাকে তাঁরা এড়িয়ে গিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী যে বিপ্লব এনেছিলেন, তাতে হিন্দুর ঈশ্বর ও মুসলমানের আল্লা চরকার সূতোয় মিলিত হয়েছিলেন; কিন্তু নানাসাহেব যে বিপ্লব এনেছিলেন, তাতে হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত এক হয়ে মিশেছিল। নেতাজী যে বিপ্লব এনেছিলেন, তাতেও হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত এক হয়ে মিশেছিল। এই রক্তের রসায়ন ছাড়া এই জাতীয় মিলনের রক্ত পাকা হয় না। এঁদের দুজনের বিপ্লব যদি জয়যুক্ত হতো, নিঃসংশয়ে বলা যায় ভারত দ্বিখণ্ডিত হবার কথা উঠতো না।

আজ আমরা অনেকেই জানি না, মারাঠা নানাসাহেবের বিপ্লব-সাধনার সব চেয়ে বড় সহায় ও সঙ্গী ছিলেন একজন অসাধারণ মুসলমান, আজিমুল্লাহ্ খাঁ তাঁর নাম। সিপাই-বিপ্লবের সমস্ত পরিকল্পনা এই দুজনের প্রতিদিনের মিলিত চেষ্টার ফল। সামান্য বাবুর্চি থেকে এই অসামান্য প্রতিভাধর লোকটি নিজের চেষ্টায় নিজেকে সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লোকদের সমকক্ষ করে তোলেন এবং আজ একশো বছর আগে এই লোকটি, ঠিক নেতাজীর মতই বেরিয়েছিলেন য়ুরোপে, ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন সেই সময়কার য়ুরোপের রণক্ষেত্রে রণক্ষেত্রে আর রাজাদের দরবারে দরবারে ভারতের বিপ্লব-সাধনার সাহায্যের অনুসন্ধানের জন্য। ভারতে

ফিরে নানাসাহেব আর আজিমুল্লাহ্ খাঁ একই সঙ্গে গড়ে তুললেন সংযুক্ত ভারতরাষ্ট্রের প্রথম পরিকল্পনা। আজ সময় এসেছে, এইসব মানুষের দিকে ফিরে তাকাবার, উদাসীন বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে তাঁদের টেনে আনতে হবে আজকের জীবনের চেতনার বাস্তবতায়······ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিরাট ইতিহাস ভর্তি হয়ে আছে একজাতীয় অপরূপ ব্যক্তিত্বে, যাঁদের জীবন ও চরিত্রের সঙ্গে আজকের স্বাধীন ভারতের তরুণ-তরুণীদের জীবন-পরিচয় ঘটা দরকার। ঝাঁসির রাণীকে আমরা যতখানি জানি, ঠিক সেই পরিমাণে জানি না আজিমুল্লাহ্ খাঁকে, জানি না নানাসাহেবকে, জানি না তাত্তিয়া টোপীকে।

এই জানা ও না-জানার মধ্যে আছে আমাদের জাতীয় চরিত্রের অন্ধকারময় বহু গহ্বর, সেগুলো আজ ভরাট হওয়া দরকার।

তেরোর বদলে চোদ্দ

এক

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন শনিবার রাত্রিবেলা। মুর্শিদাবাদ শহরের পথঘাট নির্জন হয়ে এসেছে। একটা পর্দা-ঢাকা ডুলি কাঁধে নিয়ে বাহকেরা হুম্ হুম্ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। ডুলির সামনে চলেছে মুর্শিদাবাদের একজন আর্মেনিয়ান নাগরিক, খোজা পেত্রুস। রাস্তায় চৌকিদার ডুলিটা থামালো। পেত্রুস গম্ভীরভাবে জানালো, জেনানা ……চৌকিদার সম্ভ্রমে সরে দাঁড়ালো। ডুলি-বাহকেরা জেনানা-সওয়ারী নিয়ে এগিয়ে চললো।

অন্ধকার জনবিরল পথ। ডুলি মীরজাফরের প্রাসাদের পেছন-দিককার জেনানা দরওয়াজায় এসে দাঁড়ালো। দু'জন পর্দাওয়ালা দুদিক থেকে দুটো লম্বা পর্দা টেনে ধরলো, যাতে করে রাস্তার লোকের দৃষ্টি জেনানার আব্রু নষ্ট করতে না পারে। ডুলির পর্দা সরিয়ে ডুলি থেকে নামলো……কর্ণেল ওয়াট্‌স্। রাত্রি-নিশীথে তখন নবাবের মুর্শিদাবাদ ঝিঁঝির ডাকে থমথম করছে। পেচকেরা জেগে উঠে শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছে। মাটিতে বুক দিয়ে অন্ধকারে সাপেরা চলেছে ব্যাঙের খোঁজে। বাদুড়ের পাখায় প্রেতযোনিরা বেরিয়েছে পরিত্যক্ত আবাসের সন্ধানে। সেই প্রেত-মুহূর্তে জেনানার আবরণের আড়ালে ওয়াট্‌স্ এসেছে একটি স্বাক্ষরের জন্যে, একটা সমগ্র জাতির অপমৃত্যুর স্বাক্ষর……

দুই

আমীরচাঁদের সহায়তায় নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আয়োজন মৌখিক ঠিক হয়ে গিয়েছে। একান্ত সন্তর্পণে একাজ করতে হয়েছে। সিরাজের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে, একজনও ইংরেজ আশেপাশে

জীবিত থাকতো না। তাই ক্লাইভ আর ওয়াট্‌স্ আমীরচাঁদকেই তাদের প্রতিনিধিত্বের সম্মান দেয়। মুর্শিদাবাদের ভেতরে থেকে আমীরচাঁদই ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে দেখাশোনা, বোঝাপড়া সমস্তই ঠিকঠাক করে। এখন দরকার, মুখের কথাকে রাজনৈতিক শর্তের লিখিত মর্যাদা দেওয়া।

নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীদের যে সব শর্ত ঠিক হয়েছে, তাতে প্রথম প্রয়োজন ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা মীরজাফরের স্বাক্ষর। মীরজাফরের সেই স্বাক্ষর নেবার জন্যে ওয়াট্‌স্ রাত্রি-নিশীথে জেনানা-ডুলির আড়ালে পর্দানশীন হয়ে ৪ঠা জুনের রাত্রির সেই প্রেতমুহূর্তে আসে মীরজাফরের প্রাসাদে। ওয়াট্‌স্‌য়ের মনে নিদারুণ ভয়, যদিও আমীরচাঁদ সব রকমে তাদের সাহায্য করেছে, আমীরচাঁদের প্রাণান্ত চেষ্টার ফলেই আজ এই ষড়যন্ত্র সম্ভব হয়েছে, তবুও আমীরচাঁদকে বিশ্বাস নেই……পাশ্চাত্য রাজনৈতিক বিদ্যার গূঢ়তত্ত্ব আমীরচাঁদ তাদের কাছ থেকেই বহুদিনের অধ্যবসায়ে শিখেছে……যদি তাদেরই ওপর তা প্রয়োগ করে! তাই আমীরচাঁদকেই লুকিয়ে ওয়াট্‌স্ খোজা পেক্রুসের সাহায্যে এসেছে রাজনৈতিক চুক্তি-নামায় মীরজাফরের স্বাক্ষর নিতে। প্রবাদ আছে, চোরদের মধ্যে নাকি একটা সততার আত্মীয়তা থাকে, কিন্তু সেদিন ইংরেজ-জাতির চিরকলঙ্ক-স্বরূপ যে একদল রাজ্যচোর এসেছিল এদেশে, 'হেভেনবর্ণ-জেনারেল' ক্লাইভ যার দলপতি, তারা তাদের প্রত্যেক কাজে প্রমাণ করে দিয়ে যায় যে, সে প্রবাদ কত বড় মিথ্যা। হেন নীচ আর হেয় কাজ নেই যা ক্লাইভ আর ওয়াট্‌স্ কোম্পানী বুক ফুলিয়ে না করেছে এবং সকলের চেয়ে বড় অভিযোগের কথা, তাদের সেই নীচতা আর জঘন্যতাকে তারা এদেশের ঘুণ-ধরা মানুষের মনে এমনভাবে সংক্রমিত করে দিয়ে যায় যে, রাজনীতির নামে আমরা আজও সেই মানবতা-ধ্বংসকারী চরিত্র-ধ্বংসকারী শিক্ষিত শয়তানীকে মস্তিষ্কে বহন করে চলেছি। ক্লাইভের দল ইংরেজ-জাতির হাতে তাদের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য তুলে দিয়ে যায়, কিন্তু তার বিনিময়ে ইংরেজ-জাতির বিরাট ঐতিহাসিক মর্যাদাকে তারা

পূর্ব জগতের নর্দমার পাঁকে ফেলে দিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে টেনে পরিশুদ্ধ করে তুলতে বার্ক-উড্রফ্-কেরী-নিবেদিতা-এণ্ড্রুজের মতন ইংরেজের জীবনসাধনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে অন্য কথা।

তিন

আমীরচাঁদকে লুকোবার আর একটা বড় কারণ ছিল। যখন ষড়যন্ত্রের আয়োজন সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, তখন আমীরচাঁদ তার শয়তানীর মূল্য দাবী করলো। কোম্পানীর লোক যদিও ব্যবসায়ী, আমীরচাঁদও কম ব্যবসায়ী নয়। ত্নটো পয়সার জন্যেই সে এসেছে সুদূর পাঞ্জাব থেকে এই বাংলা মুলুকে। মসনদ সে চায় না, বড় হাঙ্গামা, সে নিক মীরজাফর, কিন্তু টাকা, ধন-দৌলত তার চাই-ই।

আমীরচাঁদ ইংরেজদের চিনতো, অন্তত তার সেই ধারণা ছিল··· সে জানতো, এই ইংরেজদের মুখের কথার কোন দাম নেই, কিন্তু তখনো তার বিশ্বাস ছিল লিখিত চুক্তিনামার দাম ইংরেজ দেবে। তাই আমীরচাঁদ ধরে বসলো, তাদের সঙ্গে যে লিখিত চুক্তি হবে, যাতে উভয়পক্ষের স্বাক্ষর থাকবে, তাতে আমীরচাঁদের বখরার কথা স্পষ্টত লেখা থাকা চাই, নইলে সে চুক্তিতে আমীরচাঁদ সই করবে না এবং আমীরচাঁদের সই না করার মানে, আমীরচাঁদ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল, চুক্তির আগেই ষড়যন্ত্রের সমস্ত কথা নবাবের কানে গিয়ে পৌঁছবে। সেই সঙ্গে আমীরচাঁদ তার বখরার অঙ্কটাও জানিয়ে দিলো, সিরাজকে পরাজিত বা হত্যা করার পর নিশ্চয়ই নবাবের কোষাগার ও ধনরত্ন লুণ্ঠিত হবে, আমীরচাঁদ কোষাগারের কাঁচা টাকার শতকরা মাত্র ৫ ভাগ অংশ চায় এবং মণিমুক্তা অলঙ্কার যা পাওয়া যাবে তার একটা ন্যায্য অংশ। এমন কিছু বেশী দাবী নয়।

ক্লাইভের কাছে ওয়াট্‌স্ আমীরচাঁদের দাবীর কথা জানালো, চুক্তি-পত্রে তার বখরার কথা একটা আলাদা শর্ত হিসাবে লিখতে হবে। সেই কথা শুনে হেভেনবর্ণ-জেনারেল ঠিক করলেন, আমীরচাঁদকে

একটা কাণাকড়িও দেওয়া হবে না অথচ আমীরচাঁদকে চুক্তিতে সই করিয়ে নেওয়া হবে এবং কার্যোদ্ধার না হওয়ার আগে পর্যন্ত আমীরচাঁদ কল্পনাতেও সন্দেহ করবার অবকাশ পাবে না।

ইংরেজের রাজনৈতিক প্রতিভা যে কতদূর যেতে পারে, অতি বুদ্ধিমান আমীরচাঁদও তা জানতো না। ক্লাইভ ওয়াট্‌স্‌কে চিঠি লিখলো, ঠিক আছে ······আমি ব্যবস্থা করছি······ইতিমধ্যে তুমি দু'বেলা আমীরচাঁদকে প্রাণখুলে খোসামোদ আর প্রশংসা করো···আমার নাম করে বলো, আমীরচাঁদ আমাদের যে উপকার করেছে, তাতে সে দেখবে, বিলাতে তার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, 'His name will be greater in England than ever it was in India.'

ক্লাইভ ঠিক করলো, দুটো আলাদা কাগজে দুটো চুক্তিপত্র তৈরি হবে······একটা হবে সাদা কাগজে আর একটা হবে লাল কাগজে। সাদা কাগজের চুক্তিটা হবে আসল চুক্তি, লাল কাগজের চুক্তিটা হবে জাল। সাদা কাগজের চুক্তিতে থাকবে ১৩টা শর্ত, আমীরচাঁদের নাম-গন্ধও থাকবে না। লাল কাগজের চুক্তিতে থাকবে ১৪টা শর্ত, বাড়তি চতুর্দশ শর্তটি হবে আমীরচাঁদের কথামত তার বখরার অঙ্ক ও অংশের স্বীকৃতি।

ক্লাইভের দলের মধ্যে একমাত্র কর্ণেল ওয়াটসন সেই জঘন্য জালিয়াতির প্রতিবাদ করেছিল এবং সেই জাল লাল চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে রাজী হয়নি। ওয়াটসন সই না করাতে ক্লাইভ বিপন্ন হলো, আমীরচাঁদ সই করবার আগে নিশ্চয়ই কোম্পানীর তরফ থেকে ওয়াটসনের স্বাক্ষর দেখতে চাইবে। কিন্তু ক্লাইভের রাজনৈতিক প্রতিভার কাছে প্রতিবন্ধক বলে কিছুই ছিল না। জালিয়াতি যখন করতে হচ্ছে, তখন ডবল জালিয়াতি করতে বাধা কোথায়? ক্লাইভ লুসিংটন নামে কোম্পানীর আর একজন সাহেবকে দিয়ে জাল চুক্তিতে কর্ণেল ওয়াটসনের স্বাক্ষর জাল করালো, লুসিংটন অবলীলাক্রমে কর্ণেল ওয়াটসনের নাম চুক্তিতে সই করে দিল। পার্লামেণ্টে ক্লাইভের বিচারের সময় যখন এই সই জালের কথা ওঠে, তখন ক্লাইভ বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বলেছিল,—

"……I hold it was a matter of policy and justice to deceive so great a villain (Amirchand)."

সেই সময় ইংলণ্ডে বৃটিশ-আইনে জালিয়াতির শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। কিন্তু ক্লাইভ তার পরিবর্তে ইংলণ্ডের রাজ-সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিল সবচেয়ে বড় সম্মান, লর্ড উপাধি…ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজাত-মহলে ঐতিহাসিক আসন।

চার

কিন্তু আমার কাহিনী ক্লাইভকে নিয়ে নয়, আমীরচাঁদ ওরফে উমিচাঁদকে নিয়ে। জীবনের বাঁধা নীতির খাতায় উমিচাঁদেরা এসে নির্ভুল অঙ্কের মধ্যে হিসেব গুলিয়ে দিয়ে যায়। যে-নীতি অনুসরণ করে বিপ্লবী উপবাসে, অত্যাচারে মারা যায়, আদর্শনিষ্ঠ মানুষ আদর্শের চাপে পিষে শুকিয়ে যায়, সেই নীতিকে দু'পায়ে মাড়িয়ে উমিচাঁদেরা যখন দুধের ওপর থেকে সরটুকু খেয়ে মত্ত হাতীর মতন বিচরণ করে, তখন সাধারণ লোকের কাছে জীবনের অঙ্কের হিসাব সব গুলিয়ে যায়, সততার বাজার-দর দেখতে দেখতে পড়ে যায়। দার্শনিকের কোন তত্ত্বেই তখন মন ভুলতে চায় না। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে বৃহৎ সান্ত্বনার বিষয়, ইতিহাসে মাঝে মাঝে তার ব্যতিক্রমও ঘটে। তখন দেখা যায়, মধ্যযুগের নাটকের মত প্রমত্ত অন্যায় তার পুরো শাস্তি নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় হচ্ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, যে নাটকে উমিচাঁদ ছিল প্রধান অভিনেতা, সে-নাটকের প্রত্যেক "ভিলেন্"ই নাটকের শেষে তার প্রাপ্য পুরো শাস্তি নিয়েই বিদায় নিয়েছে। গলিত কুষ্ঠের পচা-দুর্গন্ধকে রেশম আর আতর দিয়ে সযত্নে ঢেকে রাখবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও, প্রাসাদের ভৃত্যরাও মীরজাফরের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করতো, শূন্য ঘরের প্রেত-বিভীষিকার মধ্যে চলৎশক্তিহীন মীরজাফর প্রচণ্ড আফিঙের নেশার ভেতর দিয়ে শুনতো, নিচে রাজপথ দিয়ে মন্বন্তর-পীড়িত মুমূর্ষু জনতা অভিশাপ দিতে দিতে যাচ্ছে…সিরাজের দেহ টুকরো টুকরো করে

হাতীর ওপর নিয়ে মীরণ পৈশাচিক আনন্দে সিরাজ-জননীকে দেখাতে এসেছিল পুত্রের মুখ···জননীর অভিশাপ অচিরকালের মধ্যে বজ্রাঘাতে এসে পড়লো তার মাথায়······মীরজাফরকে দাঁড়িয়ে দেখতে হলো সেই বজ্র-শাসন। ভারত-সাম্রাজ্যবিজয়ী লর্ড ক্লাইভ গায়ে-মুখে জনতার থুৎকার নিয়ে নিজের হাতের রিভলবার দিয়ে নিজের নিক্রমণপথ তৈরি করে নিতে বাধ্য হলো······জগৎশেঠের বাড়ি, একদিন রাত্রি-নিশীথে অকস্মাৎ লোকজন সুদ্ধ গঙ্গার ক্ষিপ্ত বন্যায় গেল ভেঙ্গে তলিয়ে অদৃশ্য হয়ে।

পলাশীর যুদ্ধের অভিনয়ের পর ক্লাইভ যখন সংশয়ভয়-ভীত মীরজাফরকে নবাবের সিংহাসনে বসালো, মহানন্দে আমীরচাঁদ এসে শর্ত অনুযায়ী তার দাবী চাইলো। ক্লাইভ আমীরচাঁদকে আলাদা ঘরে ডেকে নিয়ে একান্ত সহজভাবে জানালো, তার সঙ্গে কোন চুক্তিই হয়নি। আমীরচাঁদ ক্ষেপে উঠলো, চুক্তি সে নিজে দেখেছে, তাতে সে সই করেছে! অবিচলিতভাবে ক্লাইভ আসল চুক্তিনামাটা বার করে তাকে দেখালো। আমীরচাঁদ চিৎকার করে উঠলো, এ সাদা চুক্তি নয়, আমি লাল কাগজের চুক্তিতে সই করেছি······এ সাদা চুক্তি জাল! ক্লাইভ শান্তকণ্ঠে আমীরচাঁদকে জানালো, এই সাদা চুক্তিটাই আসল······সেই লাল চুক্তিটাই জাল!

এতদিন পরে আমীরচাঁদের পূর্ণ জ্ঞান হলো, ইংরেজের রাজনীতি কি বস্তু! কিন্তু সেই জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পৈতৃক জ্ঞানটুকু বিলুপ্ত হয়ে গেল। ক্ষিপ্ত আমীরচাঁদকে দয়ালু ক্লাইভ উপদেশ দিলো, বয়স হয়েছে, আর কেন, মুর্শিদাবাদ ছেড়ে কিছু দিনের জন্যে তীর্থে বেড়িয়ে এসো!

বাংলার ইতিহাসের ধারা সেদিন থেকে আমীরচাঁদকে নিশ্চিহ্নভাবে ভুলে তার নিজস্ব পথে এগিয়ে চললো। আমীরচাঁদের খবর রাখা আর কারুরই কোন প্রয়োজন ছিল না।

সেই ঘটনার বছর দেড়েক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ছিন্নমলিন বাসে, সারা অঙ্গে পথের ধুলো, মুর্শিদাবাদের পথে ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়ালো

এক পাগল! চারিদিকে চেয়ে সে যেন কি খোঁজে! বড় বড় প্রাসাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, অবাক্ হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চায়, ক্ষুধিত পাষাণের মেহের আলীর মত চিৎকার করে ওঠে···তবে কি বলে চিৎকার করেছিল, তার কোন নজীর কেউ রেখে যায়নি। পাগল উমিচাঁদকে পথের লোক চিনতেই পারেনি!

ভগ্ন-হৃদয়ের ব্যথাকে জুড়োবার জন্মে ইতিহাস বলে, আমীরচাঁদ নিজের যা কিছু সম্পত্তি ছিল, উইল করে দিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিল। কিন্তু তীর্থ-দেবতা তাকে ফিরিয়ে দেন। উন্মাদ হয়ে আমীরচাঁদ স্মৃতির আকর্ষণে মুর্শিদাবাদেই ফিরে আসে। মুর্শিদাবাদের কোন গাছের তলায় তার ক্লান্ত দেহ ঘুমিয়ে পড়ে। মাটি কাউকেই প্রত্যাখ্যান করে না।

দক্ষিণ মেরুতে একদা—

এক

১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাস !

ক্যাপটেন রবার্ট ফকন স্কট তাঁর দুঃসাহসী সঙ্গীদের নিয়ে দক্ষিণ-মেরু-বিজয়ের পথে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বন্দরে এসে পৌঁছলেন। সেখান থেকে সোজা দক্ষিণ মেরুর দিকে···

দক্ষিণ-মেরু···চির-তুষারের মহাদেশ। বৃক্ষহীন, তৃণহীন, প্রাণীহীন! তার নিষ্কলঙ্ক তুষারে পড়েনি কোন প্রাণীর পায়ের চিহ্ন, তার প্রচণ্ড শুভ্র নিস্তব্ধতায় জাগেনি একটি পাখীরও কাকলি। বারবার চেষ্টা করেছে মানুষ তার দুর্গম দূরত্বকে জয় করতে, কিন্তু অ্যাভালাঁশ-কণ্টকিত তার মৃত্যুহিম প্রবেশ-পথের দ্বার থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে ফিরে এসেছে···দূর থেকে সভয়ে দেখেছে, সুবিশাল তুষার-প্রাচীর, স্তম্ভিত সমুদ্রের তট থেকে উঠেছে মহানিষেধের মত···সেই দুর্গম তুষার-প্রাচীর থেকে দক্ষিণ মেরু হলো আরো আটশো মাইল দূরে···যে-আবহাওয়ায় জল জমে বরফ হয়ে যায়, তারও বাইশ ডিগ্রী নিচে যেখানকার আবহাওয়া, বাতাস যেখানে শাণিত তলোয়ারের মত নিমেষের স্পর্শে এনে দেয় মৃত্যু-অবশতা, পায়ের তলায় যেখানে যে-কোন অসতর্ক মুহূর্তে তুষারপথ সরে গিয়ে দেখা দেয় সমুদ্রের অতল নীল গভীরতা, সুনিশ্চিত সলিল-সমাধি···

তবু বারে বারে দুঃসাহসী মানুষ ছুটেছে সেই দুর্জয়কে জয় করবার জন্যে···কেউ হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে, কেউ আর ফিরে আসতে পারেনি···প্রত্যেক ব্যর্থতা মানুষকে করে তুলেছে আরো দুঃসাহসিক, জাগিয়েছে তার বুকে মৃত্যুঞ্জয় পণ। সমগ্র সভ্যজগৎ অপেক্ষা করে আছে, কোন্ সে মানুষ, কোন্ জাতির, কোন্ দেশের প্রতিনিধি করবে এ অসাধ্য সাধন !

ক্যাপটেন স্কট যেদিন ইংলণ্ডের তীর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন, সেদিন

তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন, এ-যাত্রা তিনি আর ব্যর্থ হয়ে ফিরবেন না, দক্ষিণ মেরুর বুকে প্রথম পড়বে একজন ইংরেজের পায়ের চিহ্ন, উড়বে সমুদ্র-বিজয়ী ইংরেজের য়ুনিয়ন জ্যাক দক্ষিণ মেরুর বুকে। তাই রাণী আলেকজাণ্ড্রা নিজের হাতে একটা সিল্কের য়ুনিয়ন জ্যাক তৈরি করে স্কটের হাতে দিয়েছিলেন···

মেলবোর্ণে এসে স্কট টেরানোভায় শেষ কয়লা ভরে নিলেন··· শেষবারের মতন তন্ন তন্ন করে সমস্ত আয়োজন মিলিয়ে দেখে নিলেন ·· সব ঠিক আছে···এবার সোজা গন্তব্যের দিকে···

জাহাজ ছাড়বার মুখে হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পেলেন···তাঁর জন্যে সেই টেলিগ্রাম অপেক্ষা করছিল। টেলিগ্রাম খুলে পড়েন, "Beg leave to inform you proceeding Antarctic—Amundsen."

"সবিনয়ে আপনাকে জানাচ্ছি দক্ষিণ মেরুর পথে যাত্রা করলাম। —ইতি আমুণ্ডসেন"

আমুণ্ডসেন···নরওয়ের লোক···এর আগে আর কোনদিন মেরু-অভিযানে বেরোয়নি···দক্ষিণ মেরুর কোন অভিজ্ঞতা নেই···ক্যাপটেন স্কট এই অভিযানের আগে আর একবার প্রত্যক্ষভাবে তুষার-প্রাচীর পেরিয়ে দক্ষিণ মেরুর তুষার-পথে দুশো মাইল পর্যন্ত গিয়েছেন···

তাই ক্যাপটেন স্কট আর তাঁর সঙ্গীরা আমুণ্ডসেনের টেলিগ্রামকে মন থেকে সরিয়ে ফেলেন···তাঁরা যাচ্ছেন, এইটেই তাঁদের কাছে একমাত্র সংবাদ···তাঁরা পৌঁছবেন, এইটেই তাঁদের কাছে একমাত্র সত্য···

নির্বিঘ্ন পথ···নিশ্চিন্ত যাত্রা। নিরুদ্বেগ নিঃশঙ্ক যাত্রীরা বর্ষশেষের দিন দূরবীন তুলে দেখলো, রৌদ্রময়ী রাত্রির আলোয় অদূরে ঝিকমিক করছে তুষার-মহাদেশের প্রান্ত রেখা···

তুষার-প্রাচীরের সংলগ্ন নামহীন এক উপদ্বীপে ক্যাপটেন স্কট সঙ্গীদের নিয়ে টেরানোভা থেকে নামলেন। তাঁর সঙ্গী ইভানসের নামে সেই উপদ্বীপের নাম রাখলেন কেপ ইভানস্। সেখান থেকে টেরানোভা ফিরে গেল, সঙ্গে নিয়ে গেল স্কটের চিঠি, তাঁর স্ত্রীকে লেখা···

"যে রকম নির্বিঘ্নে সমস্ত ব্যাপার ঘটছে, তাতে আমি নিঃসন্দেহ, ভগবানের দয়ায় এবার আমরা জয়-গৌরব নিয়ে ফিরবো···নিশ্চয়ই···"

স্কটের অনুমান মিথ্যা হয়নি···তিনি শুধু জানতেন না, দক্ষিণ-মেরু-বিজয়ের চেয়েও বৃহত্তর, মহত্তর আর এক জয়-গৌরবের জন্যে বিধাতা-পুরুষ তখন আয়োজন করছিলেন···

দুই

মেরু-অঞ্চলে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হিসেব গেল গোলমাল হয়ে। প্রত্যেক সুযোগ যেন চক্রান্ত করে দুরন্ত দুর্যোগের মূর্তিতে দেখা দেয়। সুবিধা হবে বলে যা কিছু আয়োজন করে এনেছিলেন, অকস্মাৎ সেই-গুলিই হয়ে উঠলো প্রচণ্ড বাধা। দিনের পর দিন, নিখুঁত হিসেব করে, সমস্ত পূর্ব অভিজ্ঞতার ভুল-ত্রুটির অঙ্ক কষে যে চার্ট তৈরি করেছিলেন, কোথায় ধুয়ে মুছে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল তার অঙ্কের হিসেব। এই দুর্গম তুষারপথে সহায় হবে বলে সারাজগৎ থেকে বেছে কঠিন-প্রাণ পনি-ঘোড়াদের যোগাড় করেছিলেন, সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা-অঞ্চলের হিমে আর তুষারে তাদের গড়ে পিটে তুলেছিলেন, পরমাত্মীয়ের মতন তাদের সেবা-যত্ন করে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু দক্ষিণ মেরুতে এক শিবির থেকে আর এক শিবিরে যাবার পথে, তারাই হলো এগিয়ে চলার সব চেয়ে বড় বাধা। গুঁড়ো গুঁড়ো হাল্কা অগঠিত তুষারের ভেতর হঠাৎ মালসুদ্ধ তারা ডুবে যায়, তাদের সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যায় ওজন-করা হিসাব-করা জিনিস-পত্র-খাদ্য, জীবন দিলেও যে খাদ্যের এককণা আর সে-অঞ্চলে পাওয়া যাবে না···চলতে চলতে তুষারের চোরা-ফাটলে পড়ে ভেঙ্গে যায় তাদের পা, নিজের হাতে তখন গুলি করে মেরে ফেলতে হয়! স্লেজ টানবার জন্যে য়ুকোন অঞ্চল থেকে বেছে বেছে নিয়ে এসেছিলেন হিমেল দেশের কুকুর, দক্ষিণ মেরুর বিমুখ বাতাসে তারা অকস্মাৎ ওঠে ক্ষেপে, স্লেজসুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ে ফাটলের ভেতর দিয়ে অতল হিম সমুদ্রের বুকে।

এই দুর্যোগের ভেতর দিয়েই তাঁবু ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেন স্কট। অভিযোগ করবার সময় নেই, সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকবার উপায় নেই…চলতেই হবে…সামনে আর মাত্র ১৪৫ মাইল। সেইখান থেকে শুরু হলো দক্ষিণ-মেরু-বিজয়ের শেষ-যাত্রা। ক্যাপটেন স্কট সঙ্গে মাত্র চারজন সঙ্গীকে নিলেন, উইলসন, ইভানস, বোয়ার্স আর ওটস্। 'শী'-তে করে সেই শেষ পথটুকু যাবেন…চলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরই টানতে হবে বোঝা…

তুষারের আঘাতে, দুর্যোগে, অপঘাতে যে প্রচণ্ড ক্ষতি ও ব্যথা পেতে হয়েছে, কে করে তার ভাবনা? সামনেই রয়েছে পরম লক্ষ্য…কি তীব্র তার আকর্ষণ!

তিন

১৫ই জানুয়ারী…সামনে আর মাত্র সাতাশ মাইল…পরমোল্লাসে সেখানে তাঁরা শেষ খাদ্যের ডিপো গড়ে তোলেন…ফেরবার পথের জন্যে, ন'দিনের মত খাদ্য সেখানে সঞ্চয় করে রাখেন লঘুভার…জয়ের সুতীব্র আকর্ষণে তাঁবু তুলে বেরিয়ে পড়েন……মাত্র সাতাশ মাইল…আর একটা দিন…তারপর…

১৬ই জানুয়ারী…বারবার স্কট ঘড়ি আর থিওডোলাইট যন্ত্র বার করে হিসেব করেন, মাপেন…

এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ে, নিষ্কলঙ্ক শুভ্র তুষারে যেন কিসের ছাপ পড়েছে…যত এগিয়ে যান, ততই সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ছাপ…কুকুরের পায়ের ছাপ…

মনের ভেতর ধোঁয়ার মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে মৌন আশঙ্কা…

হঠাৎ দূরের দিকে চেয়ে বোয়ার্স দেখতে পায়, শুভ্র তুষারের মধ্যে কালো বিন্দুর মত কি যেন দেখা যাচ্ছে…অবিচ্ছেদ শুভ্র-তুষারের মধ্যে কৃষ্ণ প্রেত-মূর্তির মত ও কে অপেক্ষা করে আছে তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে?

মেরুর হিমেল নিস্তব্ধতা যেন জমাট বেঁধে নেমে আসে যাত্রীদের মনে ···প্রত্যেক পদক্ষেপের সঙ্গে বড় হতে থাকে অপেক্ষমান কৃষ্ণ-বিন্দু···

১৭ই জানুয়ারী···স্কট থিওডোলাইট যন্ত্র দিয়ে মেপে দেখেন···দাক্ষিণ মেরুর হৃদ-কেন্দ্রে এসে তাঁরা দাঁড়িয়েছেন···যাত্রা শেষ···কিন্তু কিছু দূরে একটু পাশ ঘেঁষে উড়ছে একটা পতাকা···নরওয়ের পতাকা···সর্ব-প্রথমের বিজয়-স্বাক্ষর···

স্কট তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নীরবে এগিয়ে যান পতাকার কাছে··· পতাকার তলায় একটা ভাঙা স্লেজ-চাপা, দেখতে পান একটা ছোট টিন। টিনের ভেতর দেখেন, একটা চিঠি, তাঁকে সম্বোধন করে লিখেছেন, আমুণ্ডসেন···সর্বপ্রথম রেখে গিয়েছেন পরবর্তীর জন্যে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষা···

"প্রিয় ক্যাপটেন স্কট,

আমার বিশ্বাস, আমাদের পরে আপনারাই প্রথম এখানে এসে পৌঁছবেন, সেইজন্যে আপনার কাছে এই পত্রের সঙ্গে একটা মিনতি জানাচ্ছি। (যদি আমি ফিরতে না পারি) আপনার চিঠির সঙ্গে আমি আর একটা চিঠি রেখে গেলাম, আমার দেশের রাজা সপ্তম হ্যাকনকে এই চিঠিটা অনুগ্রহ করে পৌঁছে দেবেন। আমাদের তাঁবুতে কিছু দরকারী জিনিসপত্র আমি রেখে গেলাম। তলায় সেই তাঁবুর স্থান-নির্দেশ দিলাম। যদি তার কোন জিনিস আপনার দরকারে লাগে এবং আপনি ব্যবহার করেন, তাহলে আমি কৃতার্থ হব। আমার শ্রদ্ধা ও শুভ-ইচ্ছা জানবেন। ভগবানের কাছে আপনার নিরাপদ প্রত্যাবর্তন কামনা করি, ইতি—আমুণ্ডসেন, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১১।"

ক্যাপটেন স্কট ও তাঁর সঙ্গীরা সেই সাক্ষীহীন মহানির্জনতায় নতমস্তকে অভিবাদন জানান, বিজয়ী সর্বপ্রথমকে। কোন অভিযোগ করেন না, কোন অজুহাতের কথা তোলেন না, বীরের মতন স্বীকার করে নেন অনিবার্যকে। তাঁর ডায়েরীর মধ্যে কোথাও নেই দুর্বল কাতরতার একটা দীর্ঘশ্বাস। সেই জয়-পরাজয়েরও অপরূপ মুহূর্তে, সাক্ষীহীন মেরু-নির্জনতায়, মানব-মনের যে অপরূপ প্রকাশ সেদিন উদ্ঘাটিত হয়েছিল, তাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় জয়-পরাজয়ের পার্থক্য।

কিন্তু আসল কাহিনী এর পরে।

ক্যাপটেন স্কট তাঁর বীর সঙ্গীদের নিয়ে ফিরলেন। তখন তিনি জানতেন না তাঁর গন্তব্য কোথায়। ফেরবার পথে তিনি যেখানে গিয়ে পৌঁছলেন, সেখানে মৃত্যু নিজে পরিবেশন করে অমৃত। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজন পায় সে অমৃতের স্বাদ। সেই একটি অমৃতস্বাদী মানুষের মধ্যে সমগ্র মানুষ পায় নতুন পরমায়ু।

চার

প্রত্যাবর্তনের পালা। সমস্ত দক্ষিণ মেরু যেন হয়ে উঠলো চেতনাময়। স্তম্ভিত তুষারের শুভ্র রহস্যের ভেতর থেকে জেগে উঠলো প্রমত্ত ঝড়, তুষার-ঝঞ্ঝা। প্রত্যেক পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে অজানা বিপদ, মৃত্যু মূর্তি ধরে অনুসরণ করে সেই পঞ্চ পথিককে। কোন মতে তাঁদের আর ফিরে যেতে দেবে না সভ্যতার মধ্যে।

ঝড় হয়ে ওঠে ব্লিজার্ড···ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটে চলে ঝড়·· আকাশ-পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়ে যায় তুষারে···তীরের মতন ক্ষিপ্ত তুষার হাড়ে গিয়ে বেঁধে, অন্ধ করে দেয় দৃষ্টি···একহাত সামনে কিছুই যায় না দেখা···কোথায় পথ, কোথায় নিশানা, কোথায় তাঁবু!

দলের মধ্যে সব চেয়ে বলিষ্ঠ ছিলেন ইভানস্, ছিন্নমূল গাছের মতন ঝড় তাঁকে তুলে ফেলে দিল এক জমাট তুষার-শৈলের গায়ে, নিমেষের মধ্যে শত টুকরো হয়ে গেল মাথা···তৎক্ষণাৎ বাতাসে তুষার এসে বিছিয়ে দিল শুভ্র আচ্ছাদন···এগিয়ে চলে চারজন···

তুষারে অবশ হয়ে এলো ওট্সের পা···চলতে গেলে পড়ে যান··· কোন রকমে তাঁকে কাঁধে করে বাকি তিনজন পৌঁছল একটা তাঁবুতে··· তাঁবুর বাইরে ব্লিজার্ডের বেগ তখন একটু থেমেছে মাত্র···

ওট্স্ উঠতে পারে না···অর্ধ-অচৈতন্য সঙ্গীরা সেবা করে। দিনের পর দিন চলে যায়, ফুরিয়ে আসে তাঁবুর মাপ-করা সঞ্চিত খাদ্য। একদিন রাত্রিতে হঠাৎ ওট্স্ দাঁড়িয়ে উঠলো, উন্মাদের মতন ছুটে বাইরে ব্লিজার্ডের

মধ্যে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে শুধু বলে গেল, আমি চললাম··· ফিরতে হয়তো একটু দেরি হবে। "I am just going outside and I may be some time···"

সঙ্গীদের বাঁচাবার জন্যে জনহীন নিঃসীম নির্জনতার মধ্যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নিল ওটস্···আকাশে জন্ম নিলো নতুন তারা।

সেই তাঁবুর কাছাকাছি এক জায়গায় মেরু-নির্জনতায় আজ দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট্ট প্রস্তর ফলক, ওট্সের স্মৃতিচিহ্ন···স্মৃতিফলকের গায়ে শুধু লেখা আছে, "Hereabouts died a very gallant gentleman." আজকের যুগে এর চেয়ে বড় কথা কোন মানুষ সম্বন্ধে বলা যায় না।

পাঁচ

সঙ্গে যা খাদ্য ছিল, তা ফুরিয়ে এলো। অবশিষ্ট দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে স্কটকে বেরিয়ে পড়তে হলো। তখনও ব্লিজার্ড বইছে।

মানুষ বলে আর তাঁদের চেনা যায় না। হাতের আঙুল, নাক, পা তুষার-আঘাতে বিকৃত, অবশ হয়ে আসছে। কোথায় কোন্ দিকে কতদূরে পরবর্তী খাদ্যের ডিপো তার কোন নিশানাই মেলে না। সামনে দু'তিন হাত এগিয়ে কিছুই দেখা যায় না। মাতালের মতন টলতে টলতে তবু তাঁরা এগিয়ে চলেন। কিন্তু তা-ও আর সম্ভব হলো না। দ্বিগুণ উন্মাদনায় ধেয়ে এলো ব্লিজার্ড। নিরুপায় হয়ে সেই তুষার-ঝঞ্ঝার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে তাঁরা, সঙ্গে যে তাঁবু ছিল, তাই পাততে বাধ্য হলেন। তাঁবুর ভেতর স্কট আবার সাজালেন দু'দিনের ঘর। সঙ্গে আগুন জ্বালাবার যে উপকরণ ছিল, তাতে কোন রকমে কাপ ছয়েক চা গরম করা হলো···খাবার যা ছিল তাতে কোন রকমে আর দু'দিন বেঁচে থাকা যায়। বোয়ার্স আর উইলসন তুষারের সঙ্গে সংগ্রামে একেবারে অবশ হয়ে ভেঙ্গে পড়লেন···দুরন্ত প্রাণশক্তিতে একমাত্র স্কট নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখেন···সামান্য যে খাদ্য ছিল, নিজেকে বঞ্চিত করে ভাগ করে দেন মৃত্যুপথযাত্রী সঙ্গীদের। ক্রমশ তা-ও ফুরিয়ে গেল।

বাইরে সমানে চলেছে রুদ্রের প্রলয়-মাতন। যাত্রীরা বুঝতে পারে, তাঁবুর ভেতরে তারা চিরবন্দী। ঝড়ের আর্তনাদে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মৃত্যুদূতের আহ্বান।

অধিনায়ক বলে, আমাদের জীবনে যে এই মুহূর্ত আসবে, তা আশা করিনি কিন্তু কল্পনায় এই মুহূর্তের আশঙ্কায় আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম, বিষের মাত্রায় আফিঙ। এই তিল তিল যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হলো, সেই বিষ গ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়া···দলপতি হিসেবে তোমাদের দু'জনের সামনে আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করছি··· তোমরা যদি অনুমোদন করো, তাহলে আমরা তিনজনেই একসঙ্গে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

বোয়ার্স আর উইলসনের দেহে তখন মৃত্যুর ছায়া এসে পড়েছে। দেহ অবশ কিন্তু তখনও মন জাগ্রত, বলিষ্ঠ। ক্ষীণকণ্ঠে তাঁরা দু'জনে বলেন, আমরা ইংরেজ···এভাবে সংগ্রাম ত্যাগ করতে চাই না···

সামনে নীরবে ধীরস্থিরভাবে পথসঙ্গীরা বরণ করে নিচ্ছে অনিবার্যতাকে, মৃত্যুকে···স্কট অবশ আঙুল দিয়ে লিখে চলেন ডায়েরী··· নিজের কথা নয়, দুঃখের কথা নয়, অনুযোগের কথা নয়···যেখানে কেউ সাক্ষী নেই, সেখানে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লিখে চলেন মৃত্যু-আহত ইংরেজ কি করে রক্ষা করেছিল জাতীয় চরিত্রের মর্যাদাকে।

বাইরে ধীরে ধীরে তুষার জমে ক্রমশ ঢেকে ফেলে তাঁবুকে···তাঁবুর ভেতরে ধীরে ধীরে নিভে আসে তিনটি প্রদীপের ক্ষীণ শিখা··· জীবনের শেষ উচ্চারিত বাণীতে বোয়ার্স আর উইলসন্ জয়ধ্বনি করে ওঠে, "Three Cheers for England !"

তারপর ক্লান্ত শিশুর মত পড়ে ঘুমিয়ে।

স্কটেরও চোখে নেমে আসে মৃত্যু-আঁধার। কিন্তু তিনি দলপতি··· তাঁর চোখের সামনে তাঁর সঙ্গীরা এই মেরু-নির্জনতায় রেখে গেল যে অভিনব বীরত্বের আদর্শ, তাঁরই দায়িত্ব তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা···মানুষের প্রয়োজন আছে এই দুর্লভ বীরত্বের···প্রয়োজন আছে

এই মুহূর্তকে বাঁচিয়ে রাখার, যে-মুহূর্তে মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে দেবতা…

মৃত্যু-কম্পিত হাতে স্কট লিখে চলেন সেই অমর মুহূর্তের কাহিনী… মনে পড়ে, সাহিত্য-স্রষ্টা স্যার জেমস বেরীকে…এ মুহূর্ত তাঁর মত স্রষ্টার জন্যে। বেরীকে একখানি ছোট চিঠি লিখলেন…চিঠির শেষ লাইনে লিখলেন, "আমার বিশ্বাস, আপনার কবি-মনে জেগে উঠতো অপার আনন্দ, যদি কোন রকমে এই মুহূর্তে আপনি আসতে পারতেন আমাদের এই তাঁবুতে, শুনতে পেতেন মৃত্যুপথযাত্রীদের মুখে নিঃসঙ্কোচ জয়ধ্বনি!"

সামনে বোয়ার্স আর উইলসন ঘুমুচ্ছে…আর উঠবে না…

স্কটেরও দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে নেমে আসে মৃত্যু-ঘুম…কম্পিত-হাতে তাড়াতাড়ি লিখে চলেন…হঠাৎ শেষ হয়ে আসে লেখা, "It seems a pity but I do not think I can write more".

সঙ্গীদের পাশে ঘুমিয়ে পড়ে দলপতি। বিংশ-শতাব্দীর শত-বিচিত্র কোলাহলের উর্ধ্বে শুকতারার মতন জ্বলছে সেই তুষার-শুভ্র মহানীরব মৃত্যুমুহূর্ত…মৃত্যুময় মানুষের জীবনে অমর ভাগবত মুহূর্ত…

ছয়

এই ঘটনার কুড়ি বছর পরে ইংলণ্ডের লোকেরা স্কটের স্মৃতির সম্মানে একটা মেরু-মিউজিয়াম গড়ে তোলে। সেই স্মৃতিসৌধের দ্বারদেশে স্কট সম্বন্ধে লেখা আছে,

> He sought the secrets of the Pole,
> He found the secrets of God.

তিনি গিয়েছিলেন মেরুর রহস্য সন্ধানে, পেলেন ভাগবত রহস্যের সন্ধান।

প্রতিবেশী আর এক নতুন পৃথিবী

এক

আড়াই শ বছর আগেকার কথা। একটা সম্পূর্ণ আলাদা পৃথিবী। শেষ হয়ে আসছে মধ্য-যুগের রাত্রি। কিন্তু তখনো জন্মায়নি পৃথিবীর আধুনিক যুগ। মহানিঃশব্দে শুধু চলেছে তার নেপথ্য-আয়োজন।

হল্যাণ্ডের একটা ছোট্ট শহর। সেকেলে শহর। সপ্তাহের অধিকাংশ দিনই ঘুমন্ত। ডেলফট্ তার নাম। সেই শহরের নিস্তব্ধ টাউনহলের একধারে বসে একজন আধাবুড়ো লোক আপনার মনে কাঁচ ঘষছে। লোকটির নাম লেউবেন হুক। সে-ই টাউনহলের তত্ত্বাবধায়ক, সোজা কথায় যাকে বলে চৌকিদার। কোন কাজ নেই, সারা দিন শুধু বসে পাহারা দেওয়া। কিন্তু এমনি বসে থাকতে লেউবেন হুকের ভাল লাগে না। খেয়ালী মানুষ। হঠাৎ তার মাথায় খেয়াল হলো, কাঁচ ঘষে ঘষে আতস-কাঁচ তৈরি করবে। সে শুনেছিল, চশমাওয়ালারা এই সাধারণ কাঁচ থেকে কি করে আতস-কাঁচ তৈরি করে, যার ভেতর দিয়ে দেখলে ছোট ছোট জিনিস পাঁচগুণ, দশগুণ বড় দেখায়! ছেলে-মানুষের মত তার খেয়াল হলো, সে নিজেই আতস-কাঁচ তৈরি করবে। একটা মজার খেলা। চশমাওয়ালাদের কাছে ধন্না দিল, কি করে আতস-কাঁচ তৈরি করে জানবার জন্যে। কিন্তু চশমাওয়ালারা জানাতে রাজী হলো না। তাদের ট্রেড-সিক্রেট। তখনো বিজ্ঞানের বিস্ময় মানুষের চেতনায় ধরা পড়েনি। তাই সেই আতস-কাঁচই ছিল তখন পরম বিস্ময়ের জিনিস।

লেউবেন হুক ছিল একরোখা লোক। ঠিক করলো, নিজের চেষ্টাতেই সে আতস-কাঁচ তৈরি করার প্রণালী বার করবে। লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানতো না। পাঠশালায় মাতৃভাষা ডাচে চলনসই রকম লিখতে-পড়তে শিখেছিল। কিন্তু মাতৃভাষা হলে কি হবে? ডাচ ভাষা তখন

ছিল গাড়োয়ান আর চাষী আর অশিক্ষিত মেয়েদের ভাষা, বাজারের ভাষা। পুঁথির ভাষা হলো ল্যাটিন। তখন সারা য়ুরোপে ল্যাটিনের একাধিপত্য। যারা লেখাপড়া শিখতে চাইতো, তাদেব ল্যাটিন পড়তে হতো। ল্যাটিনেই শিক্ষিত লোকেরা বই লিখতেন, কথা বলতেন। ল্যাটিন যে জানে না, সে অশিক্ষিত, ইতরজন। এমনি একদিন ছিল আমাদের দেশে সংস্কৃতের আধিপত্য।

অশিক্ষিত লেউবেন হুক আপনার মনে নানান বকমের কাঁচ নানাভাবে ঘষতে ঘষতে আতস-কাঁচ তৈরি করে ফেললে। বুড়োর আনন্দ আর ধরে না, বাজারের কাঁচের চেয়ে তার কাঁচে ঢের বড় দেখায়। সেই আতস-কাঁচের খেলা বুড়োকে পেয়ে বসলো। বাড়ি ফিরে রাত্রিতে যখন সবাই ঘুমোয়, বুড়ো তখনও সেই কাঁচ নিয়ে কত রকম কি করে। এক-একবার এক-একটা নতুন ধরনের আতস-কাঁচ তৈরি করে আর তার তলায় ফেলে নানান রকমের ছোট ছোট জিনিস দেখে, প্রজাপতির পাখা, মাছির ঠ্যাং, গাছের পাতা, দেখে আর অবাক্ হয়ে যায়।

দুই

দেখবার সুবিধা হবে বলে, লেউবেন হুক শেষ-তৈরী আতস-কাঁচটাকে একটা পেতলের পাতে আটকে, কাঠের ফ্রেমে দাঁড় করালো। মাংস-ওয়ালার দোকানের পাশ দিয়ে আসবার সময় তার নজরে পড়লো ছাগলের একটা চোখ পড়ে আছে। সেই বিচ্ছিন্ন মৃত ছাগ-চক্ষুটি নিয়ে সে তার নতুন তৈরি যন্ত্রের ভেতর দিয়ে দেখতে গিয়ে দেখে, কি অবাক্ কাণ্ড, সেই ছোট্ট চোখটির ভেতর কি আশ্চর্য কারুকার্য...সাদা চোখে যার ভেতর কিছুই দেখতে পায়নি, সেই যন্ত্রের চোখের ভেতর দিয়ে দেখে, অতি স্পষ্ট, ছবির মত আঁকা বিচিত্র সব ব্যাপার। এত বিচিত্র এবং এত স্পষ্ট যে, লেউবেন হুক ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখে। তার অশিক্ষিত মনের ভেতর জেগে ওঠে এক অপার বিস্ময়ের আনন্দ। যেখানে যা ক্ষুদ্রতম জিনিস পায়, তাই যন্ত্রের চোখ দিয়ে দেখে, মাথার চুলের

ডগা থেকে আরম্ভ করে ফুলের কেশর পর্যন্ত, দেখে আর অবাক্ হয়ে যায়; সেই সব অতিক্ষুদ্র নগণ্য বস্তুর ভেতর এ কি বিরাট ইন্‌জিনীয়ারিং, কল্পনাতীত এ কি বিস্ময়কর গঠনের বৈচিত্র্য! লেউবেন হুককে নেশায় পেয়ে বসে। দুর্লভ রত্নের মত বৃদ্ধ সেই নব-আবিষ্কৃত রহস্যকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। এই প্রতিদিনের পরিচিত পৃথিবীর চেহারা অকস্মাৎ তার কাছে অজানা নব-নব বিচিত্র সৌন্দর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার হয়ে ওঠে।

কিশোরী কন্যা মারিয়া পিতার কথাবার্তা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়ে, নিশ্চয়ই পিতার ওপর কোন দুষ্ট প্রেতের ভর হয়েছে, যে তার পিতাকে ভেল্কী দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। পাড়ার লোকেরা বলাবলি করতে শুরু করে, লেউবেন হুকের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

পাড়ার লোকেরা যাই অনুমান করুক না কেন, আমরা আজ জানি, লেউবেন হুকের মাথা ঠিকই ছিল, তবে সেই প্রচণ্ড বিস্ময়ে সে সত্যিই পাগল হয়ে উঠেছিল…যেটুকু বাকি ছিল, একদিন অকস্মাৎ একটা মুহূর্তে তা পূর্ণ হয়ে গেল। এক ফোঁটা বৃষ্টির জল লেউবেন হুককে পুরোমাত্রায় পাগল করে দিল…

হঠাৎ এক মুহূর্তের খেয়ালে লেউবেন হুক তার সেই যন্ত্রের আতস-কাঁচে এক ফোঁটা বৃষ্টির জল রেখে দেখতে গেল—চোখ রাখতে না রাখতে লেউবেন হুক যন্ত্র ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো… যন্ত্রের ভেতর দিয়ে সে যে দৃশ্য দেখলো, তাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করতে তার মন কেঁপে উঠলো…

আবার গিয়ে দেখে…ভাল করে দেখে…না, স্বপ্ন দেখছে না…চিৎকার করে মেয়েকে ডাকে,—মারিয়া…মারিয়া…শীগ্‌গির আয়…ছুটে আয়…

মারিয়া কাজ ফেলে ছুটে আসে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ রেখেই লেউবেন হুক চিৎকার করে বলতে থাকে, কি সর্বনাশ মারিয়া…এক ফোঁটা বৃষ্টির জলে…হাজার হাজার প্রাণী…কি জোরে ছুটছে…ঘুরপাক খাচ্ছে…সাঁতার কাটছে…স্পষ্ট… একেবারে স্পষ্ট…শুঁড় রয়েছে…ল্যাজ রয়েছে…হাজার হাজার প্রাণী…

মারিয়া চারিদিকে চায়…সেই ভূতুড়ে যন্ত্রের আশে-পাশে ঝুঁকে দেখে…কোথাও কিছু দেখতে পায় না।

লেউবেন হুক বিস্ময়ে কাঁপতে থাকে, মারিয়া, মারিয়া, আমার মনে হচ্ছে কোন বিস্ময়কর ব্যাপার আমি হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছি।

আজ আমরা জানি, সেই মুহূর্তে সেই অশিক্ষিত বৃদ্ধ ডাচ কত বড় বিস্ময়কর আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন···একটা সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ··· জীবাণুর জগৎ···যে জগৎ সৃষ্টির আদিম প্রভাত থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্যভাবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে···অদৃশ্যভাবে আমাদের জীবনে প্রতি মুহূর্তে প্রভাব বিস্তার করেছে···একান্ত বন্ধুভাবে অদৃশ্য থেকে শতভাবে শত কাজে মানুষের সাহায্য করে চলেছে, যে সাহায্য না পেলে মানুষ এগুতেই পারতো না···চরম শত্রুর মত অদৃশ্য থেকে মানুষের সংসারে এনেছে রোগ, শোক, মড়ক, দুর্ভিক্ষ হাহাকার···মানুষের প্রতিদিনের জীবনে প্রতি-নিঃশ্বাসের সঙ্গে রয়েছে তাদের চরম সংযোগ অথচ মানুষ তাদের অস্তিত্বের বিন্দুবিসর্গও জানতো না। প্রাচীন জগতে যখনই কোন রোগ অনুকূল অবস্থা পেয়েছে, অমনি তা মড়কে পরিণত হয়েছে··· প্রতিকারহীন অসহায় বিহ্বলতায় হাজারে হাজারে মানুষ মরেছে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে গ্রামকে গ্রাম, নগরকে নগর শূন্য হয়ে গিয়েছে···ভীত আর্ত অসহায় মানুষ দেবতার অভিশাপ মনে করে মন্দিরে, গির্জায় পূজা দিয়েছে, ক্রুদ্ধ দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে পশু থেকে আরম্ভ করে মানুষ পর্যন্ত বলি দিয়েছে······মড়ক এক জায়গায় আপনা থেকে থেমে আবার অন্য জায়গায় হয়েছে। অথচ মানুষের জীবনকে এমন প্রচণ্ডভাবে যারা দোলা দিতে পারে, তারা চিরকালই অদৃশ্যভাবে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে, মানুষ অজ্ঞাতে তার মরণকে নিজেই বহন করে বেড়িয়েছে।

এই অদৃশ্য জীবাণুর আবিষ্কার হলো মানুষের আধুনিক জগতের সর্বপ্রথম ভিত্তি। দুটি ভিত্তিস্তম্ভের ওপর আমাদের আধুনিক সভ্যতার ইমারত গড়ে উঠেছে, একটি হলো জীবাণুতত্ত্ব আর একটি হলো বিদ্যুৎ। হল্যাণ্ডের ডেলফট্ শহরের সেই প্রায়-অশিক্ষিত চৌকিদার তার খেয়ালের খেলায় যে মুহূর্তে প্রথম সেই এক ফোঁটা জলে জীবাণুর প্রত্যক্ষ দর্শন পায়, আমাদের আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে সেই মুহূর্তটি অবিস্মরণীয় গৌরবে বিরাজ করছে। সমগ্র আধুনিক জগৎ সেই মুহূর্তটির জন্যে

লেউবেন হুকের কাছে ঋণী। কিন্তু আধুনিক জগতের সরকারী ইতিহাসে বড় বড় টাইপে যাঁদের নাম ছাপা হয়, তাঁদের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না লেউবেন হুকের নাম।

তিন

আজকে আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের নরনারী যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার মধ্যে বাস করছি, সে-সভ্যতার বয়স হলো মাত্র দুশো বছর। এই দুশো বছরে আমাদের সভ্যতা যে কি প্রচণ্ড দ্রুতবেগে পুরাতন পৃথিবী থেকে সরে এসেছে, ভাবতে গেলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। লেউবেন হুকের জীবন আলোচনা করতে গেলে স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই প্রাচীন পৃথিবীর রূপ, একটা সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ।

বুড়ো লেউবেন হুক যেদিন এক ফোঁটা বৃষ্টির জলে সেই সব অদৃশ্য "জীব-জন্তুর" দেখা পেয়েছিলেন, সেদিন থেকে বুড়োর একমাত্র কাজ দাঁড়ায় সেই অদৃশ্য প্রাণীদের খুঁজে বার করা। তার জন্যে হেন জিনিস নেই, যা নিয়ে লেউবেন হুক মাইক্রোস্কোপে না দেখেছেন এবং সব জিনিসে সর্বত্র দেখেন, মানুষের অদৃশ্য ভাবে সেই "তারা" ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই অশিক্ষিত চৌকিদার সেই প্রথম তৈরী সামান্য মাইক্রোস্কোপ নিয়ে যেভাবে এইসব অদৃশ্য জীবাণুদের পর্যালোচনা করেন, তার বৈজ্ঞানিকত্বায় বিস্মিত হয়ে যেতে হয়।

কিন্তু প্রাচীন জগতের রীতি অনুযায়ী বৃদ্ধ তাঁর আবিষ্কৃত সেই যন্ত্রটির কথা সকলের কাছে থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন, কাউকে সে যন্ত্র ছুঁতে বা ব্যবহার করতে দেননি। প্রথম প্রথম সেই সব নূতন তথ্যের কথাও কাউকে বলতেন না। একদিন বুড়োর বিশেষ বন্ধু রেনিয়ের দ্য গ্রাফ বুড়োর গোপন কাণ্ডকারখানার ব্যাপার জানতে পারলেন, বুড়োর সঙ্গে দেখা করলেন।

রেনিয়ের ছিলেন সেই যুগের একজন বিশেষ শিক্ষিত লোক। তিনি

বুঝলেন, বুড়ো বিস্ময়কর এক আবিষ্কার করে ফেলেছেন, যে আবিষ্কারের কথা সভ্যজগতের জানা উচিত। কিন্তু কোথায় কাকে জানাবেন?

মাত্র আড়াই শো বছর আগে য়ুরোপে বিজ্ঞান-সাধনা ছিল সবচেয়ে মারাত্মক কাজ। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে যদি কেউ কোন বৈজ্ঞানিক সত্যকে জাহির করিতে চাইতেন, তা'হলে তাঁকে বা নির্বাসনের জন্য প্রস্তুত হয়েই তা করতে হতো। একথা ভাবতে বিস্ময় লাগে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, এই কথা বলার দরুন মানুষকে জ্যান্ত পুড়ে মড়তে হয়েছে, পেতে হয়েছে নির্বাসন, কঠোর কারাদণ্ড। মাত্র আড়াই শো বছর আগে ইংলণ্ডে ষড়যন্ত্রকারী বিপ্লবীদের মতন একান্ত সঙ্গোপনে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষিত লোকদের বিজ্ঞানচর্চার জন্যে গোপনে মিলিত হতে হতো এবং সেই গোপন আড্ডার নাম ছিল The invisible college অর্থাৎ "অদৃশ্য কলেজ"। ক্রমওয়েলের ভয়ে তখন এই অদৃশ্য কলেজের সংগোপন পত্তন হয় এবং সংগোপনে তার অধিবেশন বসতো।

রেনিয়েরের তাগাদায় বৃদ্ধ লেউবেন হুক তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্র এবং অদৃশ্য জীবাণুদের সমস্ত বিবরণ গোপনে এই অদৃশ্য কলেজের বৈজ্ঞানিক-দের কাছে চিঠির আকারে লিখে পাঠাতে লাগলেন। দীর্ঘ ত্রিশ-চল্লিশ পাতার এক-একখানি চিঠি। লেউবেন হুক ল্যাটিন জানতেন না, প্রাকৃত ডাচ ভাষাতেই এই সব চিঠি লিখতেন এবং চিঠিতে থাকতো তাঁর পেটের অসুখের খবর থেকে আরম্ভ করে আশে-পাশের গাঁয়ের খবরাখবর, তার ভেতরে থাকতো জীবাণুদের বর্ণনা, দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জীবাণুদের প্রত্যেকটি চলাফেরা, হাজার রকম দৃষ্টির অগোচর অতি সামান্য বস্তুর গঠন, আকৃতি ও প্রকৃতির বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক বর্ণনা।

সেই চিঠি পেয়ে প্রথম প্রথম অদৃশ্য কলেজের বৈজ্ঞানিকেরা পাগলের কাণ্ড বলে হেসে উড়িয়ে দেন, কিন্তু একটার পর একটা চিঠিতে লেউবেন হুক যে রকম নিখুঁতভাবে সেই সব অদৃশ্য জীবাণুদের বর্ণনা লিখতে লাগলেন, তাতে ক্রমশ তাঁরা বুঝলেন এ পাগলের কাণ্ড নয়, ভূতুড়ে ব্যাপারও নয়। তখন তাঁরা লেউবেন হুকের কাছে লোক পাঠালেন চাক্ষুষ দেখবার জন্যে এবং সেই নতুন যন্ত্রটির গঠন জেনে আসবার

জন্যে। বুড়ো কিন্তু যন্ত্রের কারসাজি কাউকেই জানাতে রাজী হলেন না। দেখতে ইচ্ছা যায়, দেখে যাও।

ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর সেই অদৃশ্য কলেজই নাম পরিবর্তন করে আত্মপ্রকাশ করলো রয়েল সোসাইটী অব্ ইংলণ্ড রূপে। রয়েল সোসাইটী থেকে সরকারীভাবে স্বীকার করা হলো সেই বৃদ্ধ চৌকিদারের বিস্ময়কর আবিষ্কার। জগতে শুরু হলো বিজ্ঞান সাধনার এক নব অধ্যায়।

বৃদ্ধ লেউবেন হুক কিন্তু তখনো তাঁর যন্ত্র আঁকড়ে বসে ছিলেন। কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে রাশিয়ার জার এবং ইংলণ্ডের রাণীকেও সেই বৃদ্ধ চৌকিদারের বাড়িতে আসতে হয়েছিল।

বৃদ্ধের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই সব পাঁচিল ভেঙ্গে এলো নব-বিজ্ঞানের বিপুল জোয়ার। সেই জোয়ারের পলি-মাটিতে গড়ে উঠলো আজকের আধুনিক পৃথিবী। মাত্র দুশো বছর যার বয়স।

বর্ণপরিচয়

এক

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে। এই বাংলাদেশে, বাংলাদেশই তখন ভারতবর্ষ। বাংলার রাজধানী কলকাতা শহর তখন সারা ভারতের রাজধানী।

সেই কলকাতা শহরে, সংস্কৃত কলেজে একদিন সেই কলেজের যুবক-অধ্যক্ষ, সংস্কৃতজ্ঞ একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, লিখিত আদেশ দিলেন :

অতঃপর সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষায় যেভাবে ভাস্করাচার্যের লীলাবতী আর সংস্কৃত বীজগণিত পড়ানো হয়ে আসছে তা আর হবে না, সংস্কৃত বীজগণিতের পরিবর্তে ছাত্রদের পড়তে হবে ইংরেজী বীজগণিত। "তর্কসংগ্রহ" আর "তত্ত্বসমাসের" পরিবর্তে পড়তে হবে মিল-এর লজিক, মিল-এর লজিকের সংক্ষিপ্তসার নয়, আসল মূল মিল-এর লজিক।

লীলাবতীকে নির্বাসিত করে যিনি নিয়ে এলেন ইংরেজী অ্যালজেবরা, তর্কসংগ্রহকে বাতিল করে নিয়ে এলেন মিল আর আর্চ বিশপ হোয়েটলির লজিক, তিনি হলেন টিকিধারী সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তখন তিনি ত্রিশ বছরের যুবক মাত্র।

দুই

এই সূত্রে দেশী শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে তিনি একটা নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা গড়ে তুললেন। সেই নতুন পরিকল্পনার কথা শিক্ষা-বিভাগের কর্তাদের জানিয়ে তিনি একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। নিঃশব্দে আমাদের দেশে যে বিরাট শিক্ষা-বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল, যে-বিপ্লবের সন্তান হলো আজকের আধুনিক ভারতীয়েরা যাঁরা দেশে

আনলেন স্বাধীনতা, ঈশ্বরচন্দ্রের সেই চিঠি হলো আমাদের বর্তমান ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিপ্লব, শিক্ষা-বিপ্লবের অন্যতম প্রধান চার্টার।

সেই চিঠির এক অংশে সেই টিকিধারী সংস্কৃত পণ্ডিত চোস্ত ইংরেজী ভাষায় লিখলেন, দেশী পণ্ডিতদের মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকবার আজ কোন প্রয়োজন নেই। তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন কি অসন্তুষ্ট হবেন, সেকথা ভাববার পর্যন্ত দরকার নেই। আজ আমাদের দেশ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে দেশী পণ্ডিতদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেই আমাদের এগিয়ে চলতে হবে, তাঁদের কাছ থেকে কোন রকম সহায়তা বা সহানুভূতির কিছু প্রয়োজন নেই। তাঁরা হয়ত বাধা দিতে পারেন, কিন্তু সে বাধায় বিন্দুমাত্র ভয় পাবার কিছু নেই। তাঁদের শক্তি ও প্রভাব প্রতিদিনই কমে আসছে এবং সামনে যে যুগ আসছে তাতে এই দেশী পণ্ডিতদের সমাজ আর কোনদিনই তাঁদের পুরোনো দাপট ফিরে পাবে না।

একশো বছর আগে আমাদের দেশে যে প্রচণ্ড শিক্ষা-সমস্যা এসেছিল, এক কথায় সেই সমস্যাকে রূপ দিতে হলে বলতে হয় দেশী সংস্কৃত বনাম ইংরেজী। সেই ঐতিহাসিক লগ্নে ঈশ্বরচন্দ্র মিথ্যা স্বাদেশিকতার ঊর্ধ্বে উঠে যে বলিষ্ঠতার সঙ্গে ইংরেজী ভাষা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতিকে আমাদের জাতীয় জীবনে ও চেতনায় প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন, আজ আমরা সেই প্রচণ্ড বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ভুলতে বসেছি। আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে যেদিন সংস্কৃত কলেজের নবীন অধ্যক্ষরূপে তিনি ভাস্করাচার্যের লীলাবতী আর ন্যায়ের সংগ্রহকে কেটে উড়িয়ে দিয়ে ইংরেজী অ্যালজেবরা আর ইংরেজী লজিককে নিয়ে এলেন, সেদিন এক বিরাট শিক্ষা-বিপ্লবের প্রথম জয়-পতাকা উত্থিত হয়েছিল। এক সাহিত্যিক আজ একাই পালন করলো সেই ঘটনার শতবার্ষিকী উৎসব।

আজকে এই কথা উল্লেখ করবার একটা বিশেষ কারণ আছে। একশো বছর আগে আমাদের দেশে যে ঐতিহাসিক শিক্ষা-সমস্যা এসেছিল, আজ তার ঠিক একশো বছর পরে এসেছে অনুরূপ একটা

বিরাট শিক্ষা-সমস্যা। সেদিন পরাজিত দেশের সামনে ছিল বিরাট প্রশ্ন দেশী সংস্কৃত, না বিদেশী ইংরেজী। আজ স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্নে সেই এক সমস্যাই এসেছে একটু চেহারা বদলিয়ে—দেশী হিন্দী, না বিদেশী ইংরেজী।

সেদিন টিকিওয়ালা খালি-গা চটি-পরা এক সংস্কৃত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মিথ্যা স্বাদেশিকতার ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ করেছিলেন ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজের আনা বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতিকে। আজ আমরা বুঝতে পারব না, সেদিন কতখানি সাহস আর বীরত্বের প্রয়োজন ছিল এই শিক্ষা-বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার। ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে ছিল সেই বৈপ্লবিক বীরত্ব! আর আজ একশো বছর পরে খাস বিলিতী স্কুল-কলেজে-পড়া ইংরেজী-নবীশ আর এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অধীনে আমাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র থেকে স্বাদেশিকতার মিথ্যা মোহের দুর্বলতায় আমরা নির্বাসন দিতে চলেছি ইংরেজীকে, অগঠিত দেশী হিন্দীর অনিশ্চিত ভরসায়! একশো বছর আগে ইংরেজী ছিল আমাদের কাছে বিদেশী শাসকের ভাষা, আজ একশো বছর পরে ইংরেজী হলো সভ্যজগতের ভাষা, বিজ্ঞানেব ভাষা, উচ্চশিক্ষার ভাষা। এরোপ্লেন, বেতার আর রেলগাড়ির মত ইংরেজী ভাষাও আজ বিশ্বজনীন। আজ তাই আমাদের দরকার ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে আর একজন ঈশ্বরচন্দ্রের! সেই অনাগত বিপ্লবীর আসন খালি পড়েই আছে।

তিন

আজ প্রায় একশো বছর ধরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর টিকি আর চটি-জুতো দেখিয়ে আমাদের ঠকিয়ে আসছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে মুখ করে কলেজ-স্কোয়ারের রেলিঙের মধ্যে প্রস্তরমূর্তিতে যে নিরীহ ব্রাহ্মণটি বসে আছেন খালি-গায়ে পৈতে ঝুলিয়ে আর নেড়া মাথায় টিকি দুলিয়ে, আমার বিশ্বাস দেশী লোকদের মধ্যে তিনি হলেন অদ্বিতীয় য়ুরোপীয়ান, বাঙালীর মধ্যে একজন জ্যান্ত ইংরেজ। আমাদের দেশের

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরা তাঁকে চিনতে পারেননি। মাইকেল ইংরেজ হবার প্রাণপণ চেষ্টায় খৃষ্টান হয়েছিলেন, ইংরেজ হতে পারেননি, তাঁর অন্তিম দীর্ঘশ্বাসে সেকথা তিনি নিজেই প্রচার করে গিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র টিকি-চটিজুতো আর ধুতি-চাদরকে আঁকড়ে ধরে হয়েছিলেন খাঁটি ইংরেজ। তাঁর টিকি-চটিজুতো হলো তাঁর ইংরেজিয়ানারই নিশানা। ইংরেজের কাছ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র কোট-পাৎলুন নেননি, নিয়েছিলেন তার প্রচণ্ড স্বাতন্ত্র্যবোধ। যে স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রেরণায় ইংরেজ নিজের জাতীয় অভ্যাসের পরিবর্তন করে না, ঈশ্বরচন্দ্রও সেই স্বাতন্ত্র্যবোধের মর্যাদায় টিকি-চটিজুতো আর ধুতি-চাদরকে আঁকড়ে ধরেছিলেন! সেইজন্যে সেদিনকার ইংরেজ-শাসকেরা তাঁকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে গিয়েছেন, তাঁরা ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে দেখেছিলেন তাঁদের সমকক্ষকে।

বিবেকানন্দ তাঁর পাশ্চাত্ত্য শিষ্য ও শিষ্যাদের সঙ্গে যখন এদেশের কথা নিয়ে আলোচনা করতেন, তখন প্রায়ই বিদ্যাসাগরের কথা বলতেন। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বিবেকানন্দের একটা অপূর্ব উক্তি নিবেদিতা বাঁচিয়ে রেখে গিয়েছেন, "There is not a man of my age in Northern India on whom his shadow has not fallen!"

বিবেকানন্দ প্রায়ই একটা গল্প বলতেন, যে ঘটনা থেকে বিদ্যাসাগর স্থির করলেন, এই টিকি-চটিজুতো আর ধুতি-চাদর কিছুতেই পরিবর্তিত করা হবে না।

বিদ্যাসাগর একদিন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের এক সভা থেকে ফিরছেন। সেই সভায় তিনিই একমাত্র ছিলেন ইংরেজী মতে পোশাকহীন। পথে ফেরবার সময়, তাঁর মনে একটা প্রশ্ন জেগে উঠলো, এই রকম সভা-সমিতিতে, যেখানে ইংরেজ অফিসাররা থাকেন, ধুতি-চাদর পরে যাওয়া ঠিক, না সাহেবী ধরনে পোশাক পরা উচিত? এমন সময় তাঁর নজরে পড়লো, তাঁর সামনে একজন অতি মোটা সম্ভ্রান্তবেশী মুসলমান নবাবী কায়দায় বেশভূষা করে নবাবী মেজাজে হেলতে দুলতে আস্তে আস্তে চলেছেন। বিদ্যাসাগর যখন সেই মুসলমান ভদ্রলোকের কাছাকাছি এসেছেন, তখন দেখেন একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে

ভদ্রলোককে দেখে বলে উঠলো, হুজুর, সর্বনাশ হয়েছে, আপনার বাড়িতে আগুন লেগে গিয়েছে। কিন্তু সেই ভয়াবহ সংবাদ শুনে মুসলমান ভদ্রলোকটির নবাবী চালের গতির এতটুকু পরিবর্তন হলো না, ঠিক আগেকার মতন হেলতে দুলতে আস্তে আস্তে চলতে লাগলেন। মনিবের সেই নির্বিকার মন্থরতা দেখে সংবাদদাতা চাকরটি বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, হুজুর, একটু পা চালিয়ে আসুন। সেই কথা শুনেই মুসলমান ভদ্রলোকটি রাগে গর্জন করে উঠলেন, বেকুব! দুটো দরজা আর জানলা পুড়ছে বলে, আমি আমার বাপ-দাদার চাল-চলন ভুলে ছুটবো মনে করেছিস্?

বিদ্যাসাগর পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুসলমান ভদ্রলোকটির সেই মেজাজী উক্তি শুনে, সেই মুহূর্তে তিনি স্থির করলেন, পোশাক নিয়ে মনে আর কোন দ্বিধাই তিনি রাখবেন না, তাঁর বাপ-দাদার স্বাতন্ত্র্য তিনিও কোনমতে বিসর্জন দেবেন না।

আজ এই সূত্রে বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে বলতে চাই, আজকের বাঙালীর পক্ষে সবচেয়ে বেশী দরকার হলো, সেই টিকিওয়ালা বাঙালী-ইংরেজকে আমাদের প্রতিদিনের জীবনের ক্ষেত্রে জ্যান্ত করে তোলা। ঈশ্বরচন্দ্রকে নতুন করে চিনতে হবে, দেশের তরুণ-তরুণীদের কাছে, কিশোর-কিশোরীদের কাছে নতুন করে চেনাতে হবে। বিদ্যাসাগর মানে মাতৃভক্তি নয়, বিদ্যাসাগর মানে বিধবা বিবাহ নয়, বিদ্যাসাগর মানে দয়া-দাক্ষিণ্য নয়, বিদ্যাসাগর মানে হলো ইস্পাত, যে ইস্পাত দিয়ে তৈরী হয় জাতীয় চরিত্রের কাঠামো। বিদ্যাসাগর মানে হলো উচ্ছ্বাসহীন বাষ্পহীন বলিষ্ঠ বিপ্লব···বিদ্যাসাগর মানে হলো আত্মপ্রতিষ্ঠ পরুষ পুরুষত্ব, যা দুঃখের, ব্যথার, বিরূপ অবস্থার ঝড়ে ভেঙ্গে দুমড়ে যায় না···বিদ্যাসাগর মানে হলো দেশপ্রেম, যে দেশপ্রেম মাতৃস্নেহের মতন সহজসত্য, মাতৃস্নেহের মত নীরব, লাভালাভ-উদাসীন, মাতৃস্নেহের মত যা আঁকড়ে ধরে থাকতে জানে সন্তানের কল্যাণআয়ুকে। আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে একটা নেতিয়ে-পড়া কাঁদ-কাঁদ ভিজে সপ্‌সপে ভাব আছে, বিদ্যাসাগর হলেন তার কঠোর প্রতিবাদ। বিদ্যাসাগর হলেন আগুনের

শুকনো বীর্য। আজ আমাদের দরকার বিদ্যাসাগরকে। দরকার এই আগুনের শুকনো বীর্য। মহানীরব বলিষ্ঠতা।

আমরা আজ স্বাধীন হয়েছি। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছবিতে, অ্যালবামে, বইতে, চারদিকে দেখি, দেশে যারা স্বাধীনতা আনলো, তাদের কথা। তার মধ্যে কোথাও দেখি না বিদ্যাসাগরকে। বঙ্কিমচন্দ্রকে মাঝে মাঝে দেখতে পাই, তার কারণ তিনি আনন্দমঠ লিখেছিলেন এবং বন্দে মাতরম্-এর স্রষ্টা। আমার বিশ্বাস, আমাদের জাতীয় জীবনের মহা-বিপ্লবে আনন্দমঠের রচনা যতখানি বড় ঘটনা, ঠিক ততখানি বড়, অথবা তার চেয়েও বড় ঘটনা হলো তদানীন্তন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, রসিক, সর্ব-সাহিত্যবিদ্, অপরূপ ভাষাশিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ লিখতে বসলেন। এই একখানি বইকে ছুঁয়ে এসেছে আজ একশো বছরের প্রত্যেক বাঙালী। এই মহা-নিঃশব্দ দেশ-প্রেমিক যেদিন সাহিত্যিক প্রেরণার সমস্ত আবেগকে সংযত করে দেশে নিরক্ষরতা দূর করবার সাধনায় অ, আ, ক, খ-র বই লিখতে বসেছিলেন, সেদিন আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় পুণ্যদিন। এই নিরক্ষর দুঃখ-দুর্ভিক্ষপীড়িত জাতির বেদনা একশো বছর আগে ঈশ্বরচন্দ্রের মর্মমূলে এমন মর্মান্তিকভাবে দোলা দেয় যে, তার ফলে সর্বশাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ ভগবানের অস্তিত্বে পর্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের এই অদ্বিতীয় জাতিপ্রেমের পুরস্কারস্বরূপ আমরা তাঁকে কলেজ-স্কোয়ারে প্রস্তরমূর্তিতে চিরস্থাণু করে রেখেছি···বৎসরে একদিন সেই প্রস্তরমূর্তির গলায় একটাকা দামের গোটাকতক ফুলের মালা ঝুলিয়ে আসি। ঈশ্বরচন্দ্র দেশী লোকদের এই ভালবাসাকেই ভয় করতেন। আজ তিনি নিরুপায়, ছুটে পালাবার উপায় নেই। সকলের চেয়ে তিনি বেশী জানতেন, বাঙালী ঋণ নিতে যতটা আকুল, ঋণ শোধ দিতে তেমনি বিমুখ। মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে নয়, প্রথম ভাগের রচয়িতা ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে আমাদের একটা বিরাট ঋণ আছে। আজকের যাঁরা তরুণ-তরুণী, তাঁদের আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম, এই বিরাট ঋণের কথা। কিভাবে তাঁরা তা শোধ করবেন, তা তাঁদের বিচার্য।

একটি বই-এর জীবন-কাহিনী

এক

কোন মানুষের কাহিনী নয়, একটি বই-এর কাহিনী।

চিহ্নিত মহাপুরুষদের মত, এক-একটি চিহ্নিত বই আসে··· দাবানলের মত, পুড়িয়ে দিয়ে যায় পচা, গলা, মৃত আবর্জনার স্তূপ··· বন্যার মত স্তিমিত মানুষের মনের দুই তট ভেঙ্গে, ভাসিয়ে নিয়ে আসে নতুন প্রাণের জোয়ার···প্রদীপের শিখার মত শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অন্ধকারে জ্বালিয়ে তোলে আশার আলো···শৃঙ্খলিত মৌনতার ভয়ার্ত স্তব্ধতাকে ভেঙ্গে বজ্রের মত জাগিয়ে তোলে নির্ভীক বাণী···ভীরুকে দেয় শক্তি, সন্দিগ্ধকে দেয় প্রেরণা, নিরস্ত্রকে দেয় অস্ত্র···জনতাকে করে তোলে জাতি। এবং অত্যাচারী আর অনাচারী প্রতিষ্ঠিত শক্তির নিশ্চিন্ততার বুকে জাগিয়ে তোলে উন্মাদ আতঙ্ক।

অপাদ-পাণি সামান্য একটা নিরীহ বই···নখদন্তহীন নির্বাক একটা জড়বস্তু···শিশুও যাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিতে পারে··· অথচ তাকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য সশস্ত্র হয়ে ওঠে একটা সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি।

এবং আজও পর্যন্ত কোন শক্তিশালী সাম্রাজ্য পারেনি সেই জাতীয় বই-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হতে। প্রত্যেক যুগে বিপ্লবের ধাত্রীরূপে বিরাজ করছে এই রকম এক একখানি বই।

আমাদের দেশে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এই জাতীয় একখানি বই-এর বিরুদ্ধে তখনকার অতি-প্রবল বিশ্ব-ত্রাস বৃটিশ-রাজ মারাত্মক সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বৃটিশরাজের সশস্ত্র শাসনের সমস্ত বিভীষিকাকে তুচ্ছ করে সেদিন সেই একখানি বই পরাধীন ভারতের নিস্তব্ধ নির্বীর্যতার বুকে হোম-হুতাশন জাগিয়ে তোলে······ভারতে বৃটিশ শাসনের ভিত্তিমূলকে চিরকালের মতন শিথিল করে দেয়। যদি

কোনদিন ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সত্যিকারের ইতিহাস লেখা হয়, তখন এই বইটির দান জাতি অবনত মস্তকে স্বীকার করবে। আমরা ভুলে যাই, মানুষের মতন বই-এরও ব্যক্তিত্ব আছে এবং সে ব্যক্তিত্ব এমন মায়াধর্মী যে, মেঘনাদের মত মেঘের আড়ালে অদৃশ্য থেকেও প্রভাব বিস্তার করে।

দুই

১৯০৭ নাগাদ ইংলণ্ডের জগৎ-খ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ঝুনো ডিটেকটিভরা সজাগ হয়ে উঠলো, ভারতবর্ষ থেকে চরম অবাঞ্ছিত এক ভয়ঙ্কর বস্তু ইংলণ্ডে এসেছে, যেমন করে হোক তার সন্ধান বার করতে হবে। সেই ভয়ঙ্কর বস্তুটি কোন লোক নয়, কোন মারাত্মক অস্ত্র নয়, মাত্র একখানি বই, ছাপানোও নয়, পাণ্ডুলিপি। মারাঠী ভাষায় লেখা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্তরঙ্গ ইতিহাস, যে-ইতিহাসকে শাসক ইংরেজেরা বিকৃত করে সিপাহী বিদ্রোহ বলে জগতে প্রচার করেছে। ডিটেকটিভরা খবর পেয়েছে, সেই বইটি নাকি অতি ভয়ঙ্কর, তার ভাষাতে আগুন আছে, যে আগুনে বিপ্লবের দাবানল জ্বলে উঠতে পারে। তার কাহিনীতে আছে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রামাণিক দলিল, কি করে হিন্দু আর মুসলমান এক হয়ে পলাশীর পরাজয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতে ইংরেজ-শাসনের ভিত্তিকে শেকড়সুদ্ধ উপরে ফেলতে গিয়েছিল এবং সেদিনকার সেই বিপ্লব-পন্থাকে অনুসরণ করেই গ্রন্থকার উত্তেজিত করেছে আজকের যুগের ভারত-বাসীদের, সেই প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের অপূর্ণ সম্ভাবনাকে এবার সার্থক করে তুলতে। ডিটেকটিভরা খবর পেয়েছে বইটি এখনো ছাপানো হয়নি, পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই আছে, তার গ্রন্থকার নাকি লণ্ডনে বসে বৃটিশ মিউজিয়ামের পুরোনো বই আর দলিলপত্র ঘেঁটে পাণ্ডুলিপিকে সম্পূর্ণ করেছে। সত্যাসত্য নির্ণয় করবার জন্যে পাণ্ডুলিপিটা দখল করা দরকার। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভরা তাই চারদিক খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তারা ভারত-সরকারের কাছ থেকে খবর পেয়েছে, এই পাণ্ডুলিপির রচয়িতা হলো একজন মারাঠী যুবক, উচ্চশিক্ষার জন্যে ইংলণ্ডে এসেছে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হলো বিদেশী শক্তির সাহায্যে বিপ্লবের আয়োজন করা। সেই যুবকটির নাম—বিনায়ক দামোদর সাভারকর, অতি দুরন্ত বিপ্লবী, 'অভিনব ভারত' নামে এক সংগোপন বিপ্লবী দলের নায়ক। এই দলের শাখা য়ুরোপের বিভিন্ন শহরে এবং আমেরিকায় পর্যন্ত গড়ে উঠেছে।

তিন

ডিটেকটিভরা যখন এই পাণ্ডুলিপির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেই সময় ইংলণ্ডে অভিনব ভারতের গোপন বৈঠকে এই পাণ্ডুলিপি থেকে মাঝে মাঝে অংশ পড়া হয়, তার ফলে দলের মধ্যে নতুন করে উৎসাহ জেগে ওঠে, সভ্যসংখ্যা বাড়তে থাকে। হঠাৎ একদিন সাভারকর দেখলেন, তাঁর ঘরের আলমারী থেকে বই-এর দুটি পরিচ্ছেদ চুরি গিয়েছে। তখনি আবার তাকে নতুন করে লিখলেন এবং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও বই-এর পাণ্ডুলিপি ভারতে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রের কোন ছাপাখানার মালিক সেই বই ছাপাতে রাজী হলেন না। অবশেষে একটা ছোট প্রেসের মালিক সেই বই ছাপাতে রাজী হলেন, কারণ সে ভদ্রলোক নিজে অভিনব ভারতের সভ্য ছিলেন। কিন্তু বই যখন ছাপা হচ্ছে, তখন একদিন পুলিশ এসে প্রেস ঘেরাও করে ফেল্লো। তার আগের দিন একজন পুলিশ অফিসারই গোপনে এসে প্রেসের মালিককে সাবধান করে দিয়ে গিয়েছিলেন; সে সময় দেশী পুলিশের লোকেরা যেমন স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে, এমন কি নির্মম ব্যবহার করেছে, তেমনি কোন কোন পুলিশের লোক গোপনে এই আন্দোলনকে সাহায্যও করেছে, যদিও তাদের সংখ্যা খুবই কম। প্রেসের মালিক রাতারাতি মূল মারাঠী পাণ্ডুলিপিটা সরিয়ে ফেলে এবং একজন বিপ্লবীর মারফত তা আবার লণ্ডনে সাভারকরের হাতে গিয়ে

পৌঁছয়। তখন থেকে একদিকে পাণ্ডুলিপিকে ছাপাবার জন্যে, অন্যদিকে এই পাণ্ডুলিপিকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে য়ুরোপ জুড়ে এক বিরাট লুকোচুরি খেলা চল্লো।

ভারতবর্ষে কোন ছাপাখানাই এই বই ছাপাতে যখন রাজী হলো না, তখন সাভারকর পণ করলেন যেমন করে হোক, য়ুরোপ থেকে এই বই তিনি ছাপাবেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভরাও কোমর বেঁধে লেগে গেল, কিছুতেই এই বই যাতে ছাপা না হয়। সাভারকর ইংলণ্ডে বহু চেষ্টা করলেন কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের হাত গিয়ে মেসিন আটকে ধরে। তখন সাভারকর ঠিক করলেন, জার্মানিতে গিয়ে এই বই ছাপাবেন। জার্মানিতে তিনি জানতেন, কোন কোন প্রেসে নাগরী টাইপে কিছু কিছু সংস্কৃত ছাপা হয়েছে। সেই ভরসায় সাভারকর ঠিক করেছিলেন, তিনি নাগরী অক্ষরেই ছাপাবেন। একটা প্রেসও ঠিক হলো এবং ছাপার কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বোঝা গেল, এ শুধু সময় আর টাকার অপব্যয়। নাগরী টাইপগুলো অধিকাংশ ভাঙ্গা, তাছাড়া জার্মান কম্পোজিটরদের মধ্যে কেউই মারাঠী জানতো না। নিরুপায় দেখে সাভারকর সে-চেষ্টা পরিত্যাগ করলেন।

তখন লণ্ডনে অভিনব ভারতের এক গোপন অধিবেশনে স্থির হলো যে, বইটাকে ইংরেজীতে অনূদিত করে, সেই ইংরেজী বইকে ছাপানো হোক। সেই বিরাট বই, পাণ্ডুলিপিতে যা প্রায় হাজার পাতার মতন, একজনের পক্ষে তাড়াতাড়ি অনুবাদ করা সম্ভব নয়। তখন লণ্ডনে আর তার আশেপাশে ভারতবর্ষ থেকে বহু কৃতী ছাত্র আই-সি-এস আর অন্যান্য উচ্চশিক্ষার জন্যে এসেছে। সাভারকর তাঁদের কাছে কৌশলে এই প্রস্তাব উত্থাপন করলেন এবং কয়েকজন আনন্দে স্বীকৃত হলেন অনুবাদ করতে। শ্রীযুক্ত ভি ভি এস আয়ারের তত্ত্বাবধানে এই অনুবাদ-কার্য সংগোপনেই শেষ হলো। স্কটল্যাণ্ড্ ইয়ার্ডের ডিটেকটিভরা ভাবতেই পারেননি যে, আই-সি-এস পরীক্ষার্থীরা এই কার্য করছে। ইংরেজী পাণ্ডুলিপি তৈরী হওয়ার পর সাভারকর আবার ছাপাখানা খুঁজতে

লাগলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রত্যেক ছাপাখানার মালিককে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড সতর্ক করে দিল! রক্ত-গন্ধী ব্লাড-হাউণ্ডের মত ডিটেকটিভরা এই পাণ্ডুলিপির জন্য চারদিকে খুঁজে বেড়ালে লাগলো।

এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এমন আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন যে, তাঁরা একটা অঘটন ব্যাপার করে ফেল্লেন, যে বই প্রকাশিত হয়নি, এমন কি মুদ্রিত হয়নি, সে বইকে আইনত নিষিদ্ধ বলে তাঁরা ঘোষণা করলেন! খুন করার আগেই ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেল। সাভারকর লণ্ডন টাইমস পত্রিকায় বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে চ্যালেঞ্জ করে একটা চিঠি লিখলেন। লণ্ডন টাইমস সে চিঠি প্রকাশিত করে এবং সেই চিঠির সঙ্গে তাদের একটা মন্তব্যও মুদ্রিত হয়, এই রকম বিসদৃশ ব্যাপার কোন সুস্থ রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়!

সাভারকার যখন বুঝলেন, ইংলণ্ডে এই বই কিছুতেই ছাপানো যাবে না, তখন তিনি ইংলণ্ডের বাইরে চেষ্টা করতে লাগলেন। ফ্রান্সে পাণ্ডুলিপি নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং কোন ফরাসী ছাপাখানার মালিককে রাজী করা যায় কিনা, তার চেষ্টাচরিত্র করতে লাগলেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভরা ছায়ার মতন সাভারকরকে ফ্রান্সে অনুসরণ করে চল্লো। সাভারকরকে বহুমূল্য হীরকখণ্ডের মতন বই-এর পাণ্ডুলিপিকে নানা কৌশলে লুকিয়ে রাখতে হয়। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মারফত ফরাসী ডিটেকটিভ বিভাগের সাহায্য চাইলো। ফরাসীরা তখন জার্মান আক্রমণের আতঙ্কে ইংরেজের তাঁবেদারী করে চলেছে। তাই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে ফরাসী ডিটেকটিভ বিভাগ তৎপর হয়ে উঠলো, যাতে ফ্রান্সের কোন প্রেসে সেই বই না ছাপা হয়।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড আর ফরাসী ডিটেকটিভদের চোখে ধুলো দিয়ে সাভারকার বই ছাপাবার একটা বন্দোবস্ত করে ফেল্লেন। তিনি কৌশলে প্রচার করলেন যে, দক্ষিণ ফ্রান্সের কোন প্রেসে এতদিন পরে সেই বই ছাপা হচ্ছে। কিন্তু আসলে তখন ফ্রান্সের বাইরে হল্যাণ্ডের এক প্রেসে সেই বই ছাপানোর বন্দোবস্ত করেছিলেন। ডিটেকটিভরা যখন দক্ষিণ

ফ্রান্সের প্রেসে হানা দিচ্ছিল, সেই সময় অভিনব ভারতের কয়েকজন বিপ্লবীর তত্ত্বাবধানে হল্যাণ্ডে সেই বই-এর ছাপানোর কাজ শেষ হয়ে গেল।

চার

তারপর সমস্যা হলো, সেই মুদ্রিত বইকে ভারতবর্ষে পাঠানো। সাভারকর নানা রকম কৌশলে দফায় দফায় বই ভারতবর্ষে পাঠাতে লাগলেন। নামজাদা সব ইংরেজী বড় উপন্যাস বা গ্রন্থাবলীর মুদ্রিত কভারের আড়ালে সাভারকরের বই পোষ্ট অফিস আর কাষ্টমস অফিসের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ভারতবর্ষে আসতে লাগলো। যে সব ছাত্র পড়া শেষ করে ভারতবর্ষে ফিরছিল, তাদের কারুর কারুর সঙ্গেও কিছু কিছু বই এলো। এইভাবে সেই মারাত্মক বইকে যাঁরা সেদিন সঙ্গে করে ভারতবর্ষে এনেছিলেন আজ আমরা জানি তাঁদের মধ্যে একজন হলেন স্যার সিকন্দার হায়াৎ খান, ভারতে বৃটিশ-শাসনের শেষ পৃষ্ঠপোষকদের একজন।

এই বই-এর গোপন-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক আন্দোলন হঠাৎ দাবানলের মত জ্বলে উঠলো। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট অভিনব ভারতের সমস্ত সভ্যকে বন্দী করলেন, অনেকের ফাঁসী হলো, বাকী সকলের হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

এই আন্দোলনের নেতারূপে সাভারকরকে বন্দী করবার জন্যে সারা য়ুরোপে বৃটিশ ডিটেকটিভরা জাল ফেল্লো এবং একদিন সাভারকর বন্দী হলেন। বন্দী-দশায় যেভাবে তাঁকে ভারতবর্ষে আনা হয়, সশস্ত্র প্রহরীদের সামনে সমুদ্রবক্ষ থেকে সাভারকরের পলায়ন এবং পরে ফ্রান্সে তাঁর গ্রেপ্তার ও বিচার, এক বিচিত্র রোমাণ্টিক কাহিনী। কিন্তু সে সাভারকরের কাহিনী, সাভারকরের বই-এর নয়।

সাভারকর ফাঁসীর মঞ্চকে এড়িয়ে পঞ্চাশ বছরের মত দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হলেন। কিন্তু তাঁর লেখা বই ইংরেজের সমস্ত আইন আর

শৃঙ্খলাকে অবজ্ঞা করে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যকে সফল করে তুল্লো। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে যদি কোনো একখানি বই তিন যুগ ধরে সমানে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তবে সে বই হলো, সাভারকরের এই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস। বন্দেমাতরম্ গানের জন্যে ভারতবর্ষ যেমন বাংলা ভাষার কাছে চিরঋণী, তেমনি সাভারকরের এই অপরূপ গ্রন্থের জন্যে ভারতবর্ষ মারাঠা ভাষার কাছে ঋণী।

সাভারকর যখন ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়ে গেলেন, তখন য়ুরোপ-প্রবাসী তাঁর বিপ্লবী বন্ধুরা এই বইকে গোপনে ছাপিয়ে বিক্রী করার ব্যবস্থা করলেন। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে এক বীর পার্শী রমণী তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, যদিও আজ তাঁর নাম আমরা প্রায় ভুলে এসেছি। কিন্তু একদিন জননীর মত, প্রিয়-বান্ধবীর মত, তিনি য়ুরোপে ভারতীয় বিপ্লব-সাধনার আন্দোলনকে নিজের শক্তি, অর্থ ও সহযোগিতা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। ম্যাদাম কামা তাঁর নাম। ম্যাদাম কামা আর লালা হবদয়াল ফ্রান্স থেকে এই বই-এর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপালেন এবং বিক্রীর জন্যে গোপনে ভারতবর্ষে পাঠালেন। এই বই-এর প্রত্যেক অক্ষরে প্রাণের যে অগ্নিকণা ছিল, সেই অগ্নিকণা থেকে দিকে দিকে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠলো। আমেরিকার প্রবাসী ভারতীয়েরা “গদর” কাগজকে কেন্দ্র করে যে বিরাট বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তোলেন, যার পরিণতি জার্মান-প্লট ও কোমাগাটামারু অভিযানে পর্যবসিত হয়, সেই আন্দোলনের মূলে প্রেরণা যোগায় সাভারকরের এই বই। গদর পত্রিকার মারফত এই বই-এর উর্দু, হিন্দী আর গুরুমুখী অনুবাদ ধারাবাহিক প্রকাশিত করা হয় এবং ভারতীয় সিপাহীমহলে প্রচার করা হয়। এই বই-এর প্রেরণায় আমেরিকা-প্রবাসী অধিকাংশ শিখ এই বিপ্লবে যোগদান করেন। এই বিপ্লব গড়ে তোলার ব্যাপারেও সাভারকারের বই থেকে বহু নির্দেশ গ্রহণ করা হয়। নানাসাহেব আর আজিমুল্লাহ খাঁ ভারতব্যাপী যে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করেছিলেন, তারই ছিন্নসূত্র নিয়ে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই

আন্দোলনও সার্থকতার মুখে এসে ব্যর্থ হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র আবার সেই ছিন্নসূত্র তুলে নিয়ে ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের জয়ধ্বজা তুলে ধরেন। সৈন্য-সংগ্রহ ও সৈন্য-প্রস্তুতির সময় নেতাজীর আদেশে এই বই রীতিমত ক্লাস করে ভারতের নব-যোদ্ধাদের পড়ানো হতো এবং তাঁর প্রত্যেক সামরিক অফিসারকে এই বই পড়তে হয়। ভারতের বিপ্লব-আন্দোলনের তিন যুগ ধরে এই বই বিপ্লবীদের প্রেরণা জুগিয়েছে এবং যখনি বিপ্লবীদের টাকার দরকার হয়েছে, তখনই গোপনে এই বই ছেপে বিক্রী করে তাঁরা টাকা তুলেছেন। এমনি একদিন গিয়েছে, যখন এই বই এর একখানা কপি তিনশো টাকায় বিক্রী হয়েছে। ভগৎ সিং এইভাবে টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। ভগৎ সিং-এর মামলায় দেখা গেল, প্রত্যেক ধৃত বিপ্লবীর কাছে সাভারকরের এই বই। স্বনামখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু যখন জাপান থেকে নতুন করে ভারত-অভিযানের আয়োজন গড়ে তোলেন, তখন সাভারকরের এই বই তাঁর সবচেয়ে বড় সহায় হয়।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর যখন দেশের শাসনভার কংগ্রেস পার্টির ওপর এলো, পুরাতন নীতি অনুসরণ করে অহিংস-ধর্মী কংগ্রেস-রাজ এই বই-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে রাজী হননি। তার জন্যে বোম্বে ও মহারাষ্ট্রের এক শ্রেণীর লোক বহু চেষ্টা করেন। যখন তাঁরা বুঝলেন যে, কংগ্রেস সরকার তাঁদের আবেদন গ্রাহ্য করতে প্রস্তুত নন, তখন তাঁরা ঘোষণা করলেন, এই বই ছাপিয়ে তাঁরা গভর্নমেণ্টের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করবেন এবং তার জন্যে যে কোন শাস্তি নিতে তাঁরা প্রস্তুত। অবশেষে গভর্নমেণ্ট তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করে এই বই-এর ওপর থেকে সরকারী নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন। চল্লিশ বছর পর এ বই মুক্তিলাভ করলো। কিন্তু এই বই-এর মূল পাণ্ডুলিপি, যা রচনা করেছে—তিনটি যুগের বিপ্লবের ইতিহাস, আজ আর কোথাও নেই। তার বিচিত্র জীবন বহুদিন হলো এক নিদারুণ অপঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। প্যারিস বিনিদ্র রাত জাগছে জার্মান আক্রমণের ভয়ে। ম্যাদাম কামা তখন প্যারিসে ছিলেন। তিনি তাঁর

সমস্ত অলঙ্কার আর মণি-রত্ন, আর তার সঙ্গে সেই মণি-রত্নের চেয়েও অমূল্য সাভারকরের মূল বই-এর পাণ্ডুলিপি ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সের সংগোপন সিন্দুকে রেখে দেন। জার্মান আক্রমণে সেই ব্যাঙ্কের বাড়ী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ম্যাদাম কামাও দেহরক্ষা করেন। জার্মান আক্রমণের ফলে সেই পাণ্ডুলিপি ব্যাঙ্ক অফ ফ্র্যান্সের সঙ্গে অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়। প্যারিসের ধুলোর বুকে মিশে আছে সেই পাণ্ডুলিপির ছাই।

একটা পেনীর জন্য

এক

রাত্রি-নিশীথে ইতিহাসের অরণ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি বৃহৎ ঘটনার মহামহীরুহের আড়ালে কোথায় পড়ে আছে বিলুপ্ত-স্মৃতি মুহূর্তের মণি-কণা…

আরব্যোপন্যাসের পথভ্রান্ত সিন্ধুবাদের মত সহসা চোখে পড়ে, অরণ্যের এক বিচিত্র অংশ…যেদিকে যাই, দেখি অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকীর মত জ্বলছে মুহূর্তের মণি-মাণিক্য-কণা, আকাশের তারার মতন অগণন। অপরূপ তাদের জ্যোতি, অমলিন তাদের দীপ্তি, অরণ্যের অদৃশ্যতার আড়ালে পড়ে আছে, হয়ত এমনি পড়ে থাকবে অনন্তকাল। আলোক-আকৃষ্ট হয়ে তাদের কাছে যাই, তুলে দেখি, পরিচিত, অতি-পরিচিত রত্নহারের সব ছিন্ন রত্ন…আমারই স্বদেশের অতি নিকট ইতিহাসের বিস্মৃত সব মুহূর্তের মানিক…

কে তাদের নিয়ে আবার গাঁথবে মালা? মার গলায় কে আবার দোলাবে জীবন-সমুদ্র-মন্থনে-পাওয়া সেই অ-লোক আলোক মুহূর্তের মণি-মালা?

বর্তমানের বিষ-কণ্টক-জর্জরিত মনের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে সেই সব হারিয়ে-যাওয়া মুহূর্তগুলি, যে-সব মুহূর্তের নিঃশেষদানের ওপর গড়ে উঠেছে আজকে আমাদের স্বাধীনতার ইমারত…দেখি, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় মুসলমান ফকিরের ছদ্মবেশে মসজিদে বসে আলোচনা করছেন কোরান, পেছনে ছায়ার মতন অনুসরণ করে চলেছে বিদেশীর বেতনভুক ভারতীয়-চরেরা…শিখ-প্রবাসীর বেশে উত্তর ভারতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অমর চট্টোপাধ্যায় ছিন্ন-বিপ্লবের সূত্রকে জোড়া দেবার আশায় …থানার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রাসবিহারী বসু পড়ছেন সরকারের ঘোষণা-পত্র, তাঁরই মাথার উপর ঘোষিত হয়েছে পুরস্কার…জাভায়,

সিঙ্গাপুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভূপতি মজুমদার জার্মান সামরিক জাহাজের গোপন সংবাদের আশায়…

সুন্দরবনের সমুদ্ররেখা ধরে চলেছেন যতীন মুখুজ্জে অস্ত্রের ঘাঁটির সন্ধানে…বিষাক্ত পোকা সর্বাঙ্গে নিয়ে নলিনী গুপ্ত চলেছে বর্মার ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে·· ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বরের-বেশে বরযাত্রী নিয়ে শোভাযাত্রা করে চলেছেন আদালতে…মারাঠা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে যতীন বাঁড়ুজ্জে বরোদার সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করে শিখছেন অস্ত্রবিদ্যা…

শীতকালে শান্তিপুরের নির্জন গঙ্গার বুকে আবক্ষ নিজেকে নিমজ্জিত করে তরুণ সুভাষচন্দ্র করছেন কৃচ্ছ্রসাধন……কালসর্পবেষ্টিত জলমগ্ন কুঁড়ে-ঘরে আলোকহীন সন্ধ্যায় কালসর্প-বেষ্টিত হয়ে ধ্যানী শিবের মতন বসে আছেন বন্দী জ্যোতিষ ঘোষ……

পেছনে দেখি দাঁড়িয়ে বিরাট জনতা…নামহীনের দল…রাজনীতির যজ্ঞের ইন্ধনকাষ্ঠ। মহিষবাথানের লোনা-জলের ধারে সন্ধ্যার অন্ধকারে জ্বলছে এক তরুণ কিশোরের চোখ, তার হাতের মুঠোর হাড় পাথরের ওপর লোহার হামানদিস্তে দিয়ে থেত্‌লে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ওরা, মুঠোর ভেতরের নুনের সঙ্গে মিশে যায় আঙ্গুলের গুঁড়ো হাড়, তবু আর হাতের মুঠোয় তুলে নেয় নুন। এখনো কানে এসে সূচের মতন বেঁধে মেদিনীপুরের রাত্রি-নিশীথে নিস্তব্ধ কালো থমথমে অন্ধকারে চিলের চীৎকারের মতন তরুণীর কণ্ঠের আর্তনাদ, গাছের সঙ্গে বেঁধে হাতে পায়ে নখের গোড়ায় গোড়ায় সূচ দিয়ে তারা বিঁধছে, তরুণীর মুখ থেকে উত্তর বার করবার জন্যে, কোথায় তার ভাই…অব্যক্ত যন্ত্রণার শব্দ ছাড়া সে মুখ দিয়ে বেরোয়নি আর কোন শব্দ।

তারা আজ নেই…ইতিহাসে নেই, জীবনে নেই…শহরে নেই, গ্রামে নেই, কলেজ স্কোয়ারের আশে-পাশে নেই, মনুমেণ্টের তলায় নেই…ট্রামের ভিড়ে নেই, বাসের ভিড়ে নেই, ইনক্লাব জিন্দাবাদের শোভাযাত্রায় নেই, রাইটার্স বিল্ডিং-এ নেই, বিধানসভায় নেই…তারা যে এত কাছে একদিন ছিল সেইটেই আজ মনে হয় রূপকথা।

আমাদের পুরাণে বলে, গরুড় জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখলো, প্রভাত আকাশে রক্ত-রবি জ্বল্‌-জ্বল্‌ করছে, খেলনা মনে করে তাকে চঞ্চুপুটে ধারণ করবার জন্যে ছুটেছিল শিশু গরুড়। এই অনায়াস দুঃসাহসিকতা, সূর্য-প্রয়াসী এই নিঃশঙ্কতা, তারুণ্য হলো তারি নাম। তার পক্ষ-বিস্তারের জন্যে দরকার হয় সীমাহীন আকাশ। সে ছোটে প্রভাতের রক্ত-রবিকে ধরবার জন্যে, ট্রাম বা বাস পোড়াবার জন্যে নয়।

সেই বিলুপ্ত-চিহ্ন তারুণ্যের বিস্মৃত-প্রায় এক মুহূর্তের কাহিনী বলবো আজ।

দুই

যেদিন সাভারকর লণ্ডনের ট্রেনে ধরা পড়লেন, বিলিতী কাগজে হৈ-চৈ পড়ে গেল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বাছাই-করা ডিটেকটিভদের পাহারায় তাঁকে সংগোপনে কারাকক্ষে বন্দী করে রাখা হলো। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড সাত-দিনের মধ্যে জানতে পেরে গেল যে, সেই দুরন্ত বিপ্লবী গোপন কারাকক্ষের ভেতর থেকেই বাইরের জগতের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে চলেছে এবং কারাগার থেকে পালাবার বন্দোবস্ত প্রায় করে ফেলেছে। বিশেষ প্রহরীর ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু কি উপায়ে সাভারকর বাইরে খবরাখবর গ্রহণ ও প্রেরণ করেন, প্রহরীরা ধরতে পারে না। ঠিক হলো, তাঁর বিচার ভারতবর্ষেই হবে। বিশেষ জাহাজে বিশেষ সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত করে তাঁকে ভারতে আনার ব্যবস্থা হলো। তার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে একদল আলাদা বিশ্বস্ত ভারতীয় সিপাই আনানো হলো। ভারত যাত্রার কয়েকদিন আগে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড জানতে পারলো, জাহাজ যখন ফ্রান্সের মার্সেই বন্দরে থামবে, তখন জাহাজ থেকে বন্দীকে উদ্ধার করবার ষড়যন্ত্র ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ জাহাজের নাম বিশেষভাবে গোপন রাখলেন এবং জাহাজের ক্যাপটেনের ওপর আদেশ হলো, যথাসম্ভব বিদেশী-বন্দরে জাহাজ যেন থামানো না হয়।

সেই বিপজ্জনক বন্দীকে নিয়ে গোপনে জাহাজ ইংলিশচ্যানেল পার হলো। জাহাজের ভেতর অষ্টপ্রহর সশস্ত্র সৈনিকেরা সাভারকরকে ঘিরে থাকে। শুধু একবার স্নান আর শৌচের জন্যে তাঁকে একলা স্নানের ঘরে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই স্নানের ঘরের ভেতর এমনভাবে একটা বড় আয়না রাখা হয়েছিল, যাতে করে বাইরে থেকে একটা ফুটো দিয়ে সেই আয়নায় সাভারকরের প্রতিমূর্তি প্রহরীরা দেখতে পায়।

ক্রমশ জাহাজ ফ্রান্সের তীরভূমির দিকে এগিয়ে চলে। ভারতে পদার্পণ করা মানেই হলো ফাঁসী। একমাত্র বাঁচবার উপায় হলো, বিদেশী ফ্রান্সের মাটিতে যদি কোন-রকমে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন। লণ্ডনে কারাগারে বন্দী থাকার সময়ই সাভারকর ফ্রান্সের বিপ্লবী-বন্ধুদের সেকথা পত্রযোগে জানিয়েছিলেন, কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভরা সে প্ল্যানের কথা জানতে পেরে যায় এবং ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত দানা বাঁধতে পারেনি। জাহাজ যতই মার্সেই-এর তীরভূমির দিকে এগিয়ে যায়, সাভাবকরের মন ততই চঞ্চল হয়ে ওঠে। জাহাজে অষ্টপ্রহর যেভাবে তিনি সশস্ত্র সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন, তাতে সেখান থেকে পালাবার কোন উপায়ই খুঁজে পান না।

জাহাজ যখন মার্সেই-বন্দরে ঢুকছে, তখন রাত শেষ হয়ে আসছে। এই আলো-আঁধারীর সময়টুকু হলো বিপ্লবী মাহেন্দ্রলগ্ন। সাভারকর দেখলেন, অধিকাংশ প্রহরীই ঘুমে ঢুলছে শুধু দুজন জেগে বসে আছে। তাদেরও চোখ ঘুমে ভারী।

সাভারকর তাদের কাছে গিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় বলেন, ওহে বন্ধু, চল, একবার স্নানের ঘরে, কাজটা সেরে নি।

সৈনিক গিয়ে সর্দারকে ডেকে আনলো। সর্দার নিজে সাভারকরকে স্নানের ঘরে নিয়ে চল্লো।

স্নানের ঘরের ভেতরে ঢুকে সাভারকর যথারীতি খিল দিয়ে দিলেন, তারপর স্নানের জন্যে গায়ের লম্বা কোটটা খুলে ফেল্লেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো, স্নানের ঘরের মাথার ওপরে একটা মানুষ গলবার মতন একটা গর্ত…সেই গর্তের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে শেষরাত্রির শ্লেট-রঙা

আকাশ। কিন্তু গর্তটা এত উঁচুতে যে, নাগাল পাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। নিমেষের মধ্যে সাভারকর মনস্থির করে ফেল্লেন। দেয়ালের গায়ে একটা হুকের সঙ্গে কোট-টা জড়ালেন…তারপর সেই কোট ধরে লাফ দিলেন…কিন্তু গর্তের মুখ থেকে হাত-ফস্‌কে পড়ে গেলেন। ভয়ে তাঁর বুক কেঁপে উঠলো, এখুনি শব্দ শুনে সৈন্যেরা বেয়নেট নিয়ে ছুটে আসবে…দেখেন, গর্তের ভেতর দিয়ে টর্চের আলো ঘরে এসে পড়েছে…

এক-মুহূর্ত দেরি না করে সাভারকর কোটটি ধরে আবার লাফ দিলেন…

সশব্দে দরজা ভেঙ্গে গেল…সর্দার ঘরের ভিতর ঢুকে দেখে, ঘর খালি …হুকে তখনো কোটটি দুলছে…

সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম বেজে উঠলো…ডেকের ওপর থেকে সৈন্যরা সেই আলো-আঁধারীতে কালো সাগরের জলে চারিদিক থেকে টর্চ ফেলে - কিছুক্ষণ পরে টর্চের আলোয় তারা বিস্মিত হয়ে দেখে, একটা মানুষ ঢেউ-এর সঙ্গে সঙ্গে তীরের দিকে ভেসে চলেছে…তীরের কাছে তখন উদ্বেল-সাগরে উঠেছে ভীষণ তরঙ্গ, কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে বইছে…কোন সৈনিকই জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলো না, তাড়াতাড়ি নৌকো নিয়ে তারা তীরের দিকে ছুটলো।

সেই দুরন্ত শীতে অশান্ত সাগরের সঙ্গে সংগ্রাম করে সাভারকর যখন তীরের কাছাকাছি এসে পড়েছেন তখন দেখেন, সামনেই ভয়ঙ্কর পিছল একটা পাঁচিল খাড়া পর্বতের মতন উঠে গিয়েছে। সেই পাঁচিলের ওপরে ফ্রান্সের মাটি। সাভারকর উঠতে যান, পিছলে তখুনি আবার জলে পড়ে যান। ঘাড় তুলে দেখেন, নৌকো করে প্রহরী সৈন্যরা তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা ধরে ফেলবে। ভাববার আর অবকাশ নেই। সাভারকর আবার সেই পিছল খাড়া পাঁচিলের ওপর উঠতে চেষ্টা করেন, পিছলে পড়ে যান, আবার ওঠেন… ইচ্ছার ঐকান্তিকতায় হাতের আর পায়ের আঙুলগুলো লোহার হুকের মতন হয়ে ওঠে…সাভারকর সেই পাঁচিলের ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়লেন, ফ্রান্সের মাটিতে। শীতে, পরিশ্রমে, ক্লান্তিতে তখন দেহে আর

কোন শক্তি নেই···নিঃশ্বাস যেন সব ফুরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এই মৃত্যু-চিহ্নিত দেহের আড়ালে সংগোপনে লুকিয়ে থাকে. দেহকে ছাড়িয়ে যাবার যে অমৃত শক্তি, এইসব মুহূর্তে কোন্ রহস্য প্রক্রিয়ার ফলে খুলে যায় তার গোপন ভাণ্ডারের দ্বার······অবসাদকেই যষ্টি করে ছুটে চলে অবসন্ন মানুষ। সাভারকর ছুটতে আরম্ভ করলেন। লক্ষ্য, কোন রকমে কোন ফরাসী থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করা! তাহলে আর বৃটিশ প্রহরীরা তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করতে পারবে না।

তখন সবে ভোর হয়েছে, একটি দুটি করে রাস্তায় লোক চলতে আরম্ভ করেছে; সাভারকর পিছু ফিরে দেখেন বৃটিশ প্রহরীরা ছুটে আসছে।

সঙ্গে তাঁর জামা নেই। একটা কপর্দকও নেই। ছুটতে ছুটতে রাস্তায় যে লোককে দেখতে পান, তারই সামনে হাত পেতে বলেন, বন্ধু, একটা পেনী, যা হোক্ কিছু পয়সা দাও!

লোকে মনে করে পাগল।

পাগলের মতন সাভারকর চীৎকার করে ওঠেন, ট্রামে উঠবো·· পয়সা নেই···কে আছ বন্ধু, ট্রামের ভাড়াটা শুধু দাও!

তখন সবেমাত্র ট্রাম চলতে আরম্ভ করেছে। সাভারকর ট্রামের দিকে ছুটে চলেন আর চীৎকার করেন, একটা পেনী! মাত্র একটা পেনী দিয়ে একটা জীবনকে বাঁচাও!

কিন্তু সেই অমূল্য একটা পেনী তিনি সেদিন কারুর কাছ থেকে পেলেন না। পেছন ফিরে দেখেন, বৃটিশ প্রহরীরা প্রায় এসে পড়েছে। ক্ষিপ্ত শার্দুলের মত তারা ছুটে আসছে।

সাভারকর সামনে একজন ফরাসী পুলিশ কনস্টেবলকে দেখতে পেলেন। ছুটে তার কাছে গিয়ে বলেন, আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করছি, আমাকে থানায় নিয়ে চল!

ফরাসী কনস্টেবল সাভারকরের চেহারা আর কথা মিলিয়ে ধরে নিলে, লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে!

তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে সাভারকর বলেন, আমি পাগল

নই, ক্রিমিন্যালও নই···আমি একজন ভারতীয়···তোমার রাষ্ট্রের আশ্রয় চাই।

সাধারণ পুলিশ কনস্টেবল ভেবেই ঠিক করতে পারে না, বিনা অপরাধে একজন বিদেশীকে সে গ্রেপ্তার কি করে করবে ?

এমন সময় ষোলজন ক্ষিপ্ত সৈন্য সাভারকরের ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো। ইংরেজ ক্যাপটেন সজোরে সাভারকরকে পদাঘাত করলো, সঙ্গে সঙ্গে অন্য সৈন্যরা হাতের বেয়নেট, লাঠি, ঘুষি যার যা সুবিধে হলো, তাই দিয়ে সাভারকরকে প্রহার করতে শুরু করে দিলো, ইংরেজ সৈনিকের পদাঘাতে সাভারকর ছিটকে পড়ে গেলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তেই বাঘের মতন লাফিয়ে উঠে সেই ইংরেজ ক্যাপটেনের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং মাটিতে ফেলে তার গলা টিপে ধরলেন। সৈন্যরা তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁর হাত বেঁধে ফেল্লো এবং রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চল্লো। বিস্মিত ফরাসী কনস্টেবলকে শুধু জানালো, একজন পাজী কয়েদী, আমাদের জাহাজ থেকে পালিয়ে এসেছিল, তাই ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

ফরাসী কনস্টেবল প্রতিবাদ করারও প্রয়োজন বোধ করলো না। সাভারকরকে আবার বন্দী হয়ে জাহাজে আসতে হলো এবং এবার যাতে কোন রকমে পালাবার কোন অবকাশ না থাকে, তার জন্যে বন্যপশুর মত তাঁকে শৃঙ্খলিত করে রাখা হলো এবং সেই অবস্থায় প্রহরী সৈন্য-বেষ্টিত হয়েই তাঁকে মলমূত্র ত্যাগ করতে হতো। অষ্টপ্রহর তাঁকে ঘিরে সশস্ত্র প্রহরীরা অকথ্য গালাগাল দিয়ে চলে। নীরবে সাভারকর সহ্য করেন।

একদিন থাকতে না পেরে বাঘের মতন গর্জন করে উঠলেন, ফের যদি আমাকে গালাগাল দাও, তাহলে আমার ধর্মের নামে শপথ করে বলছি, যে গালাগাল দেবে, তাকে হত্যা করে তবে আমি মরবো এবং জেনে রেখো, মৃত্যুর ভয় আমার নেই।

সিপাইদের মনে সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না, তাই সেদিন থেকে সিপাইরা আর তাঁর সামনে কোন কটু কথা বলতো না।

এইভাবে বন্দী সাভারকর ভারতবর্ষে এলেন। তাঁর বিচার ও দণ্ড, সে আর এক কাহিনী। তারপর, বহু বিচিত্র পথে সাভারকরের জীবন বিচিত্র উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে ভারতের ইতিহাসের রাজপথ থেকে সরে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর জীবনের জাগরণ-লগ্নের সেই অগ্নিমুহূর্তটি তাঁকে ছাড়িয়ে স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক অস্তিত্ব অর্জন করেছে। সেই মুহূর্তে তিনি বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেনও।

অতি তুচ্ছ এক ঘটনা

এক

সামান্য একটি ঘটনা, এত সামান্য যে ইতিহাসে কোথাও তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

১৮৯০ সালে লণ্ডন শহরের এক মাঠে, আই-সি-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের ঘোড়ায় চড়ার সামান্য একটা আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা হচ্ছে···সেই সময়কার প্রথামত, আই-সি-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও, ভবিষ্যৎ ম্যাজিস্ট্রেটদের এই ঘোড়ার-চড়ায় পরীক্ষা দিতে হতো···সামান্য পরীক্ষা, একবার না পারলে, দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়া হতো···পাকাপাকিভাবে আই-সি-এস্ হতে হলে এই ঘোড়ায়-চড়ার পরীক্ষায় আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তীর্ণ হতেই হতো···এবং উত্তীর্ণও হতো সকলে।

পরীক্ষক একে একে কৃতী ছাত্রদের কৃতিত্বের ক্রম অনুসারে ডাকছেন। প্রথম তিনজনের পর ডাক পড়লো চতুর্থের। কিন্তু উপস্থিত সকলে অবাক্ হয়ে দেখলেন, চতুর্থজন অনুপস্থিত। পরবর্তী ডাক পড়লো।

উনবিংশ শতাব্দীর বিপুল বিচিত্র ইতিহাসের মধ্যে সেই একটি ভারতীয় ছাত্রের অনুপস্থিতি, সমুদ্রের বালু-বেলায় হারিয়ে-যাওয়া এক-কণা বালুর মত এমনভাবে হারিয়ে গিয়েছে যে, তাকে খুঁজে বার করবার কথা মনেই জাগে না। এত সামান্য সে-ঘটনা।

আজকের বিংশ-শতাব্দীর প্রচণ্ড ইতিহাসে, যেখানে ভিড় করে রয়েছে প্রকাণ্ড সব ঘটনা, শালের অরণ্যের মত, সেখানে আমি দেখছি সেদিনকার সেই হারিয়ে-যাওয়া অতি-তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই রয়েছে, আজকের শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের বীজ···যাঁর শোনবার কান আছে, তিনি শুনতে পাবেন সেই তুচ্ছতম ঘটনার মধ্যে মানবের আগামীযুগের সুনিশ্চিত পদধ্বনি···সভ্যতার সরকারী ইতিহাসের

রচয়িতাদের কান সেইজাতীয় সূক্ষ্মধ্বনি ধরবার মত এখনো তৈরী হয়নি।

সেদিনকার সেই অনুপস্থিত তরুণ ছাত্রের নাম শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

দুই

পরীক্ষা-ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছাত্রের অধ্যাপক স্বনামখ্যাত কটন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রকে তিনি ভালবাসতেন। বহু মেধাবী ছাত্র তিনি দেখেছেন। কিন্তু সেই আঠারো বছরের তরুণ ভারতীয় ছাত্রের অনন্য-সাধারণ সাহিত্য-প্রতিভা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আই-সি-এস্ পরীক্ষায় সমস্ত বিষয় মিলিয়ে অরবিন্দ চতুর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু গ্রীক আর ল্যাটিনে তিনি যে-নম্বর পেয়েছিলেন, ইতিপূর্বে কোন ছাত্র তা পায়নি। কটন জানতেন, কি কঠোর অধ্যবসায়ে, কি নিদারুণ দুরবস্থার মধ্যে অরবিন্দকে এই বিদ্যাসাধনা করতে হয়েছে। আজ সাধনা জয়যুক্ত, চরম পুরস্কার—অর্থ, যশ, পদ-গৌরব করায়ত্ত। সেই দুর্লভ পুরস্কারকে কেউ হেলায় হারায়? কটন উদ্বিগ্ন অন্তরে ছুটলেন ছাত্রের সন্ধানে।

গিয়ে দেখেন, ছাত্র শান্ত নিরুদ্বেগ চিত্তে বড়ভাই-এর সঙ্গে বসে তাস খেলছেন!

কটন বুঝলেন, অরবিন্দ ইচ্ছা করেই অনুপস্থিত হয়েছেন। রেগে বলে ওঠেন, এ উদ্ভট মনোবৃত্তি কে তোমার মনে এনে দিল?

অরবিন্দ নীরব। এ উদ্ভট মনোবৃত্তি সেই তরুণ ছাত্রের মনে যে এনে দিয়েছিল, তার কথা যদি সেদিন উচ্চারণ করে বলা যেতো, তাহলে কেউই বিশ্বাস করতো না। উপহাসে অট্টহাস্য করে উঠতো।

অরবিন্দের মেজ ভাই মনমোহন এসে কটন সাহেবের সঙ্গে যোগদান করেন। জ্যেষ্ঠত্বের অধিকারে অরবিন্দকে রূঢ় ভর্ৎসনা করেন। এ পাগলামী, এ মূর্খতা, এ খামখেয়ালীর মানে কী?

অরবিন্দ নীরব। এ পাগলামীতে যে প্রণোদিত করেছে, সে আর কিছু বলেনি, তার নিরুত্তর মুখের পাঠোদ্ধার করবার শক্তি তখন তরুণের

ছিল না, মহা-নীরবে অন্তরের সুগভীর স্তরে শুধু জেগে ছিল এক প্রচণ্ড ইচ্ছা, তাকে স্বীকার করে নেবার।

কটন নিরুত্তর ছাত্রের মৌন প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে পকেট থেকে একটা ছাপানো আবেদনপত্র বার করেন, পুনঃ পরীক্ষার আবেদন। আদেশ করেন, সই করে দাও।

যন্ত্রচালিতের মতন অরবিন্দ সই করে দেন। আশ্বস্ত হয়ে কটন চলে যান পুনঃ পরীক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্যে। অলক্ষ্যে হাসেন বিধাতা।

তিন

অরবিন্দ যখন সাত বছরের শিশু, তখন তাঁর বাবা তাঁকে ইংলণ্ডে ইংরেজ-পরিবারের মধ্যে রেখে আসেন। যখন পাঁচ বছর মাত্র বয়স, তখন শিশু পুত্রকে কৃষ্ণধন বাংলার সমাজের দূষিত আবহাওয়া থেকে সরিয়ে দার্জিলিঙ পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন বিজনতার মধ্যে খাঁটি ইংরেজ স্কুলে রেখে দেন। সেখানে ইংরেজ-শিশুদের সঙ্গে অরবিন্দের হয় প্রথম বর্ণ পরিচয়, ইংরেজী-ভাষায়। শৈশবের প্রথম চেতনার সঙ্গে মিশে যায় "গড্ সেভ্ দি কিং" আর বাইবেলের প্রার্থনা। কিন্তু কৃষ্ণধন তাতেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না, পাছে নৈকট্যের দরুন পচা হিন্দু সমাজের দূষিত আবহাওয়া বাতাসে বাতাসে শিশুর মনে কোনরকম বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করে, সেইজন্যে সাত বছর পড়তে না পড়তেই তিনি শিশু অরবিন্দকে বাংলার মাটি থেকে উপড়ে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার রাজধানী লণ্ডনে এক বিখ্যাত খৃষ্টান পরিবারে রেখে এলেন। জীবনের প্রথম অস্ফুট চেতনার দিন থেকে যৌবনের জাগরণ-লগ্ন পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে অরবিন্দের মন, মস্তিষ্ক ও চরিত্র সজাগভাবে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হয়ে ওঠে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তন্ত্রে, ইংরেজী ভাষা হয়ে উঠলো তাঁর মাতৃভাষা···গ্রীক, ল্যাটিন, ইতালীয়ান, ফরাসী, স্পেনীয় ও জার্মান ভাষায় মূল-উৎস থেকে তিনি পান করলেন পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার সুধা-ধারা···যে-ইংরেজ পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন,

তাঁদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিলেন যে, নিজের নামের আগে ব্যবহার করতেন সেই ইংরাজপরিবারের আন্ত খৃষ্টান নাম···তখন তাঁর নাম ছিল এক্‌রয়েড্‌ অরবিন্দ ঘোষ···

অথচ সেই মানুষই হলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে স্বদেশের প্রধানতম নেতা, সেই এক্‌রয়েড্‌ অরবিন্দ ঘোষই হলেন শ্রীঅরবিন্দ···নব-শঙ্করাচার্যের মতন যিনি হিন্দুধর্ম ও ভারত-সভ্যতাকেই পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকতার রীতি, পদ্ধতি ও পরিভাষায় বিশ্ব-চেতনায় করে গেলেন প্রতিষ্ঠিত। পিতা কৃষ্ণধনের সমস্ত সযত্ন প্রচেষ্টা, পারিপার্শ্বিকের সমস্ত প্রভাব, শৈশবের প্রথম চেতনা থেকে পরিণত যৌবন পর্যন্ত আয়ত্ত পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার সমস্ত আকর্ষণ, স্বভাবতঃই তরুণ অরবিন্দকে যেপথে টেনে নিয়ে যেতো, সেপথ থেকে অকস্মাৎ কে তাঁকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত পথে টেনে নিয়ে গেল ? বাইরে থেকে তাঁর সেই বিশ বছরের বিলাতী জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি, যা তাঁর পারিপার্শিকের বা অর্জিত বিদ্যার বিরোধী মনোবৃত্তি গঠনে সহায়তা করতে পারে। কোথায় এই পরিবর্তনের সূত্র ? কোন্‌ ঘটনার প্রভাবে এই পরিবর্তন সম্ভব হলো ? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে আছে, আজকের বিস্ময়কর শতাব্দীর সবচেয়ে বড় তথ্য, শতাব্দীর সরকারী ইতিহাস যাকে এখনো ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি।

চার

কটন সাহেব পুনঃ পরীক্ষার আবেদনপত্র ছাত্র অরবিন্দকে দিয়ে সই করিয়ে নিজে নিয়ে গেলেন। ছাত্র নিষ্ক্রিয় উদাসীন হয়ে অপেক্ষা করে রইলেন।

ছাত্র অরবিন্দের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হলো। তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে হলো না, বৃটিশ গভর্নমেণ্টই তাঁর আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করলো। তরুণ অরবিন্দের আত্মীয়স্বজন, হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধব অবাক্‌ হয়ে গেলেন, মর্মাহত হলেন, এমন তুচ্ছ কারণে কেউ আই-সি-এস্‌-এর মতন পরীক্ষায়

সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েও প্রত্যাখ্যাত হয়? কিন্তু যাঁর সবচেয়ে দুঃখিত হবার কথা, সেই অরবিন্দ দুঃখিত হওয়া দূরে থাক, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লেন। কোন উগ্র স্বাদেশিকতার প্রত্যক্ষ প্রেরণায় তরুণ অরবিন্দ আই-সি-এস্-এর অর্জিত ফলকে প্রত্যাখ্যান করেননি, যেমন পরে করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁর জাগরণউন্মুখ জীবনের গভীরে তখন থেকেই তিনি পেয়েছিলেন জীবনাতীত অদৃশ্য মহাশক্তির স্পর্শ, কিন্তু তখন সে-শক্তি ছিল তাঁর কাছে রহস্যময়, অস্পষ্ট ...চকিতে অকস্মাৎ চেতনার গভীরে বিদ্যুৎ ঝলকে দীপ্ত হয়ে আবার চলে যেতো অকস্মাৎ...সমস্ত যুক্তি-তর্ক, সন্দেহ ও বিচারের বাইরে তরুণ অরবিন্দ নিঃশব্দে স্বীকার করে নিয়েছিলেন সেই রহস্যশক্তিকে, কারণ চকিতে দেখা পেলেও, সে-দেখা তাঁর কাছে ছিল বাস্তব ও সত্য।

যেদিন তিনি ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা দিতে বেরুলেন, সেইদিন যাত্রার মুহূর্তে, অকস্মাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণীর মত তিনি পেলেন ধাক্কা...সে ধাক্কা তাঁর অন্তরে গিয়ে লাগলো...চেতনার গভীরে তিনি স্পষ্ট অনুভব করলেন, যে অদৃশ্য মহাশক্তি বিচিত্ররূপে মাঝে মাঝে তাঁকে স্পর্শ করে যায়, জীবনের প্রবেশ-মুখে এ তারই নির্দেশ...তরুণ অরবিন্দ নত অন্তরে স্বীকার করে নিলেন সেই অদৃশ্য মহাশক্তির নির্দেশকে ..গেলেন না আর পরীক্ষা দিতে। সেই একটি মুহূর্ত, যে মুহূর্তকে ইতিহাস স্বীকার করে না, আমার বিশ্বাস সেই অবজ্ঞাত অনুল্লেখিত মুহূর্তের মধ্যে আছে আমাদের শতাব্দীর সবচেয়ে বড় কথা, মানুষের সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়শক্তির বাইরে, বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রপাতি আর অঙ্কের হিসাবের বাইরে, একান্ত বাস্তবভাবে বিরাজ করছে এক দিব্য মহাশক্তি, মানুষের জীবনের সঙ্গে মানুষের সমস্ত উত্থানপতনের সঙ্গে যার আছে ঘনিষ্ঠ যোগ।

উনবিংশ শতাব্দীর ঘটনাবহুল বিচিত্র ইতিহাসে তরুণ অরবিন্দের জীবনের এই ছোট্ট মুহূর্তটির চিহ্ন কোথাও নেই, তাঁর দু' একখানা যে জীবনী লেখা হয়েছে, তাতেও এই বিশেষ মুহূর্তের কথা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। অথচ এই প্রবন্ধে আমি বলতে এসেছি, সেই সামান্য মুহূর্তটি হলো আমাদের শতাব্দীর বিরাট ইতিহাসে একটি

অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। এই পাঁচ হাজার বছরের লিখিত মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ঈশ্বর আর নিরীশ্বরতা নিয়ে, বস্তুতান্ত্রিকতা আর অতীন্দ্রিয়তা নিয়ে, বিজ্ঞান আর ধর্ম নিয়ে উচ্চশিক্ষিতদের স্তরে অনেক বাদানুবাদ হয়ে গিয়েছে···কিন্তু এত সমস্ত বাদানুবাদ সত্ত্বেও অধিকাংশ সাধারণ শিক্ষিত লোক, সব দেশে সব সময়েই, আত্মিক ব্যাপারকে জীবনের প্রত্যক্ষক্ষেত্র থেকে, দৈনন্দিন চিন্তাধারা থেকে সযত্নে এড়িয়ে চলে আসছেন···ভাবটা যেন কি জানি—ওসব আছে কি নেই, দেখা যায় কি না যায়, থাকলে ভাল, না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই, অতএব ও ব্যাপার নিয়ে বিশেষভাবে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। এবং যারা মাথা ঘামায়, তাদের একটু বিশেষ কৃপার চক্ষেই দেখা হয়। এইভাবে সাধারণ মানুষের অনিশ্চিত চিন্তাধারা আমাদের বৈজ্ঞানিক শতাব্দীতে এসে একটা বলিষ্ঠ দৃঢ় ভঙ্গী নিলো। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের যুক্তিবাদী শিক্ষিত নাগরিক বুক ঠুকে ঘোষণা করলো বৈজ্ঞানিক বস্তুতান্ত্রিকতা এবং সঙ্গে সঙ্গে জেহাদ ঘোষণা করলো ইন্দ্রিয়ের অতীত সত্যের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ধর্মের বিরুদ্ধে। বিজ্ঞান তার প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে হলো তার সহায়। ঠিক যে-সময় বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ পৃথিবী-জয়ের জন্যে মানুষের চিত্তভূমিতে অবতীর্ণ, ঠিক সেই সময় তার সমান্তরাল গতিতে মানুষের চিত্তভূমিতে নবশক্তি লাভ করল তার বিপরীত শক্তি, দৈবশক্তি যার সাধারণ নাম। দেবতা ও দৈত্যের সংগ্রামের রূপকের ভেতর দিয়ে পুরাণকার মানব-চিত্তের এই নিত্য সংগ্রামকে রূপ দিয়ে গিয়েছেন। আগে খণ্ড খণ্ডভাবে, বিক্ষিপ্তভাবে যে দ্বন্দ্ব একটা সীমাবদ্ধ ছোট্ট আয়তনের মধ্যে চলে এসেছে, আজকের শতাব্দীতে সেই দ্বন্দ্ব সমগ্রভাবে বিশ্বের মানুষের মনে শেষ মীমাংসার জন্যে বিঘোষিত হয়েছে। তাই আমাদের শতাব্দীর ইতিহাসে কার্ল মার্ক্স যতখানি বাস্তব, ঠিক ততখানি বাস্তব হলো রামকৃষ্ণ আর অরবিন্দ। তাই যে মুহূর্তে এটম বোমের সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল, সে-মুহূর্ত যতখানি প্রয়োজনীয়, ঠিক তেমনি প্রয়োজনীয় হলো সেই মুহূর্ত, যে-মুহূর্তে অরবিন্দের অন্তরে প্রত্যক্ষভাবে ধরা দিলো অদৃশ্য মহাশক্তি।

অরবিন্দের সমস্ত পরবর্তী জীবন হলো, সেই অদৃশ্য মহাশক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ও সম্পর্কের ইতিহাস, যার ফলে একদিন শত জীবন-পরীক্ষা অন্তে অকুণ্ঠভাষায় তিনি ঘোষণা করে গেলেন, প্রত্যক্ষদর্শনলব্ধ মহাসত্য,

"A Light there is that leads,
A Power that aids"

একথা আমরা অনেকবার শুনেছি কিন্তু আমাদের চেতনার আঁশের সঙ্গে তা আজও মিশে যায়নি, সামনে আসছে সেই যুগ যখন মানুষের চেতনার আঁশ হয়ে মিশে থাকবে সেই মহাসত্য।

দুটি অপরূপ মুহূর্ত

এক

আজ থেকে একশো দশ বছর আগে। ৯ই ফেব্রুয়ারী। প্রাচীন কলকাতার মিশন রো রাস্তার ওপরে ওল্ড মিশন চার্চ। চার্চের বাইরে চারিদিকে সজাগ পুলিশ-প্রহরী অপরিচিত কাউকে চার্চের দিকে আসতে দিচ্ছে না। চার্চের ভেতরে, নিভৃত অন্তরঙ্গ কক্ষে মাতা মেরীর পুণ্য পাষাণ-প্রতিমাকে ঘিরে জ্বলছে শান্ত স্নিগ্ধ শিখা। সেই শিখার আলো এসে পড়েছে দীর্ঘ-আয়তচক্ষু উনিশ বছরের এক বাঙালী তরুণের মুখে। ঝড়ের আগে অরণ্যের মত স্তম্ভিত হয়ে আছে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন তরুণের সর্বদেহে। বিশাল দুই চোখের অপলক দৃষ্টি ঘরের পাঁচিলকে পেরিয়ে চার্চের সীমানাকে ছাড়িয়ে, চলে গিয়েছে রহস্য-নীল কোন্ সুদূরে······

বেদীর ওপরে, তরুণের সামনে দাঁড়িয়ে আর্চডিকন ডিয়ালট্রি, প্রধান ধর্ম-যাজক······তরুণের পাশে দাঁড়িয়ে পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্বাচিত সাক্ষী···তরুণ আজ স্বজাতির ধর্ম পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে পর-ধর্ম, খৃস্ট-ধর্ম······যে-ধর্মকে তরুণ তার বিবেক আর বুদ্ধি অনুযায়ী মনে করে জগতের একমাত্র সত্য ধর্ম······সভ্য মানুষের ধর্ম······যে-ধর্মের কল্যাণে তরুণ আশা করে, সে মুক্তি পাবে তার স্বজাতির কুসংস্কারাচ্ছন্ন রাত্রির ঘন অন্ধকার থেকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মুক্ত স্বাধীন উদার প্রভাতআলোকে······এই বাংলা দেশে হিন্দু বাপ-মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করে যে ভুল করেছে সে, খৃস্টান হয়ে সেই জন্মগত ভুলকে সে সংশোধন করবে······হোক্ বাংলা তার জন্মভূমি, সে-আকস্মিকতাকে প্রতিরোধ করবার কোন সুযোগ থাকলে নিশ্চয়ই সে প্রতিরোধ করতো, তার দেহ জন্মেছে বাংলার ভিজে কালো নোংরা মাটিতে কিন্তু তার মন···শুভ্র আলোক প্রয়াসী তার মন, নির্বাচন করে

নিয়েছে তার দ্বিতীয় জন্মভূমি, শ্বেতদ্বীপ ইংলণ্ড। জন্মের অপরাধে সে পেয়েছে তার মুখে বাংলা ভাষাকে, জেলে-মালী-মালার ভাষা কিন্তু আজ ধর্মান্তরগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সে পাবে আত্মীয়তার অধিকার ধর্মসোদরদের ভাষায়, ইংরেজী ভাষায়, শেক্‌স্‌পীয়ার আর মিল্‌টনের ভাষায়।

দীক্ষা-অন্তে আর্চডিকন ডিয়ালটি বলেন, হে নব-জাত, মাইকেল নামে আজ তোমাকে আহ্বান করছি সত্যধর্মে……আমেন!

নতমস্তকে তরুণ গ্রহণ করে আর্চডিকনের আশীর্বাদের সঙ্গে তার নতুন নাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

দুই

আত্মীয়-স্বজন-স্বগৃহ থেকে দূরে, সেদিন রাত্রিতে নবদীক্ষিত তরুণ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে রাত্রিনির্জনতায় কম্পমান অন্তরের ব্যাকুল বাসনাকে কবিতায় রূপ দেয়, বাংলা ভাষায় নয়, ইংরেজী ভাষায়……যে-ভাষায়, তার চরম আকাঙ্ক্ষা একদিন সে অমৃতছন্দে নিজেকে অমর করে রেখে যাবে।

তরুণ লিখে চলে,

“কুসংস্কারের তমিস্রা-ঘন রাত্রিতে,
দীর্ঘকাল পথভ্রান্ত ঘুরেছি……
দেখিনি, দেখতে চাইনি কোথায় আলো—
যে-আলোয় অন্ধ পায় তার পথের দিশা!
অন্ধকারে বসে ছিলাম,
বুদ্ধির বিচারের দ্বার বন্ধ করে……
ভ্রান্তির ভয়ার্ত সাগর তরঙ্গে
ভেসে চলেছিলাম অন্তহীন কালে……

এতদিন পরে, আজ, হে প্রভু,
আমাকে ঘিরে জ্বলে উঠলো তোমার করুণার শিখা,

আকণ্ঠ ভরে পান করি আজ
তোমার অমূল্য বাণীর অমৃত,
তোমার আলোর মন্দিরে নতজানু
তোমায় করি বন্দনা।

ওগো ত্রাণকর্তা,
তোমার জন্যে আমি নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলেছি
সব স্নেহ, সব ভালবাসার মধুর মালা···

এই আকাশের তলায় যাকিছু আমার প্রিয়,
হে প্রভু, তোমারই জন্যে
আজ তা সবই করলাম ত্যাগ।"

তিন

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের রাত্রি-নির্জনতার সেই মুহূর্তটি, রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্যক্তিগত জীবনকে ছাড়িয়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ঐতিহাসিক নব-জাগরণের প্রতীক হয়ে আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর সেই ফেব্রুয়ারী মাসের প্রভাতে, প্রহরীবেষ্টিত গির্জার অভ্যন্তরে আর্চ ডিকন ডিয়ালট্রির সামনে পশ্চিমের ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে যে তরুণ দাঁড়িয়েছিল, সে শুধু রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে নয়, সে হলো পশ্চিমের প্রাণধর্মের সদাজাগ্রত নব্য বাংলার প্রতিনিধি।

স্তিমিত-প্রাণ আত্মবিস্মৃত পূর্বের বিশুষ্ক-গতি কর্দমপঞ্জর জীবন-নদীতে পশ্চিমের প্রচণ্ড প্রাণধারা যেদিন বন্যার বেগে নিস্তব্ধ দুই তটকে জাগিয়ে নব-জীবনের জোয়ারকে নিয়ে আসে, সেদিন এই প্রাচীনা বঙ্গভূমি নতুন করে নতুন পৃথিবীতে নবজন্ম লাভ করে। সমগ্র পূর্বজগতের, পূর্ব জগতের প্রতিনিধিরূপে ভারতবর্ষের প্রয়োজন ছিল এই প্রচণ্ড ঐতিহাসিক সংযোগের।

বাংলা দেশ সমগ্র ভারতবর্ষের হয়ে সেদিন সেই প্রচণ্ড বন্যার বেগকে নিজের দুই তটের মধ্যে ধারণ করে। তার ঐতিহাসিক প্রাণধর্মের রীতি অনুযায়ী অন্তরের সমস্ত আবেগ আর অনুরাগ দিয়েই সে সমগ্রভাবে সেই নতুন প্রাণকে বরণ করে নেয় এবং প্রত্যেক প্রাণধর্মীর মত সে যখন গ্রহণ করে, তখন হিসাবে করে গ্রহণ করতে পারে না, গ্রহণের প্রচণ্ড উল্লাসে সে প্রচণ্ড ভুলও করে এবং প্রাণের রঙে সেই ভুলকেও মোহনীয় করে তোলে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার স্তিমিত প্রান্তরে পশ্চিমের সংস্পর্শে যে নব-জীবনের বন্যা জেগে ওঠে, যে-বন্যার পলিমাটি থেকে জন্মেছি আজকের আমরা বাঙালী, মাইকেলের জীবন হলো একাধারে সেই বন্যার আশীর্বাদ ও অভিশাপ। ভাল ও মন্দের বাইরে বন্যা যেমন প্রকৃতির অনিবার্য প্রকাশ......ভাল ও মন্দের, সুবিধা ও অসুবিধার সমস্ত অঙ্ককে ভাসিয়ে দিয়েই সে আসে... ...মাইকেলের জীবনও তেমনি ভাল ও মন্দের বিচারের ঐতিহাসিক প্রাণধারার মহা-অনিবার্যতার প্রকাশ।

বন্যার এক প্রান্তে থাকে তট-ভাঙ্গা দুরন্ত গতিবেগ, সব-ভাসিয়ে-নিয়ে-যাওয়া ফেনিল উন্মাদনা, ভাঙ্গনের প্লাবনের আর্তনাদ, ভগ্ননীড় আর ভগ্নশাখার অভিশাপ, অনিকেতনের আর্তজ্বালা...আর এক প্রান্তে থাকে বিদূরিত-আবর্জনা নবমৃত্তিকা, নতুন পলিমাটি, সৃজনের নব-প্রয়াস, নব-শস্যের সবুজ সমারোহ...অভিশাপ রূপান্তরিত হয় আশীর্বাদে। মাইকেলের জীবনের এক প্রান্তে ভাঙ্গন-ভরা বন্যার তাণ্ডব নর্তন, আর্তনাদ আর আত্মঘাতী জ্বালার বিষবাষ্প, অপর প্রান্তে সবুজ শস্যের শ্যাম সমারোহ, শ্যামা জননীর ক্রোড়ে ক্লান্ত শিশুর প্রশান্ত আত্ম-সমর্পণ।

চার

মাইকেলের জীবন দুটি অপরূপ মুহূর্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সেই দু'টি মুহূর্তকে তিনি দুটি কবিতায় চিহ্নিত করে রেখে গিয়েছেন।

একটি মুহূর্তের পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি, তাঁর জীবনের আরম্ভমুখে যেদিন তিনি স্বজাতি, স্বধর্ম ও মাতৃভাষাকে অবজ্ঞাভরে ত্যাগ করে খৃস্টধর্ম, ইংরেজীয়ানা ও ইংরেজী ভাষাকে অন্তর থেকে বরণ করে নিয়েছিলেন, সেদিন তাঁর জাতির, ধর্মের, সাহিত্যের ও সমাজ-জীবনের যে চেহারা ছিল, তাতে মুগ্ধ হবার কোন লক্ষণই তিনি দেখতে পাননি। তার পরিবর্তে সেই সময় তাঁর চোখের সামনে অনিন্দ্যসুন্দর প্রাণময় মূর্তিতে ফুটে উঠেছিল ইংরেজের আনা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা, ইংরেজের আনা অপরূপ সাহিত্য, ইংরেজের আনা নব জীবন-দৃষ্টি।

সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তিনি সেই নব প্রাণশক্তিকে বরণ করে নিয়েছিলেন। যে প্রচণ্ড উন্মাদনায় সেদিন মাইকেল পাশ্চাত্ত্য ধর্ম ও সাহিত্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন, প্রাণের সেই প্রচণ্ড উন্মাদনা হলো বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। প্রাণের ক্ষেত্রে এই উন্মাদনা যেদিন মস্তিষ্ক আর বিচারের সাবধানী হিসাবে স্তিমিত হয়ে আসবে, সেদিন বুঝতে হবে, বাঙালী মৃত্যু-ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

প্রাণের ক্ষেত্রে এই দুবাহু-তুলে-নাচার উন্মাদনার মধ্যে যেমন আছে প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয়, তেমনি আছে তার মধ্যে প্রচণ্ড ভুল করবার অবকাশ এবং প্রাণের ক্ষেত্রে এই ভুল করবারও একটা স্বতন্ত্র দাম আছে।

চরম দুঃসাহসিকের মতন বাংলার বিপ্লবী মন ভুল করতে ভয় পায় নি বলেই, ভুলকে পেছনে ফেলে বারে বারে সে এগিয়ে যেতে পেরেছে। এই প্রাণের আগুনে পুড়ে বাঙালী বারে বারে বহন করে এনেছে নতুন প্রাণ, নতুন শক্তি, নতুন চেতনা। প্রাণের ক্ষেত্রে যে উন্মাদনার বশে মানুষ ভুল করে, প্রাণের পাবকধর্মে একদিন সে-ভুল আপনা থেকে তার কাছে ধরা পড়ে। তখন সে-ভুলকে স্বীকার করা হলো প্রাণের বীর-ধর্মেরই আর এক প্রকাশ।

মাইকেলের জীবনের দ্বিতীয় দিব্য মুহূর্তে আমরা তাই দেখি তাঁর জীবনের সেই প্রচণ্ড ভুলের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। মধুমাখা বাংলা ভাষায় মাইকেল তাঁর এই ভুলের স্বীকৃতিকে অমর করে রেখে গিয়েছেন। যে মাটির কোলে আমরা জন্মাই, যে-মার কোলে শুয়ে জীবনের প্রথম স্বাদ

গ্রহণ করি, যে-ভাষায় জেগে ওঠে প্রথম বাণীর চেতনা, মানুষ যতই আন্তর্জাতিক হোক, তার বিকাশের, তার আনন্দের, তার সৃজনের মূল শিকড় জড়িয়ে থাকে এই তিনটি আদিম প্রাণ-মৃত্তিকাব গভীর স্তরে। এই প্রাণ-মৃত্তিকা থেকে সরে গিয়ে মাইকেল চেয়েছিলেন তাঁর অন্তরের সুবিপুল সৃজন-প্রয়াসকে সার্থক করতে। প্রাণের দেবতা তাঁকে অশ্রুজলে ধৌত করে ফিরিয়ে আনলেন তাঁর সৃজন-মৃত্তিকায়। সেই অশ্রুজলে-ধোয়া অপরূপ প্রাণের স্বীকৃতি ফুটে উঠলো মাতৃস্তন্যপিপাসিত শিশুর আর্তনাদে,

"রেখো মা দাসেরে মনে
এ মিনতি করি পদে
মধুহীন করো না গো
তব মনঃ কোকনদে।"

পাঁচ

মাইকেল তাঁর জীবনের শেষের দিকে একবার ঢাকা গিয়েছিলেন। সেই সময় ঢাকার তরুণেরা তাঁকে এক সভায় সম্বর্ধনা করে। সেই সভায় একদল ছেলে অকপটচিত্তে তাঁর কাছে এসে বলে, স্যার, আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা আমাদের গৌরবের বিষয়, কিন্তু একটা ব্যাপারে আমরা বড় দুঃখ পাই, আপনি কেন ইংরেজ হতে গেলেন ?

মধুসূদন হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, আপনারা আমার সম্বন্ধে আর যা খুশি ভাবুন, আমি প্রতিবাদ করবো না······কিন্তু আমি ইংরেজ হয়ে গিয়েছি, আমার সম্বন্ধে এত বড় ভুল আপনারা করবেন না। ইংরেজ হতে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু আমার বিধাতাপুরুষ নিজে এসে সে-বাসনার পথ রোধ করে দিয়েছেন। আমি আমার বসবার ঘরে, আর শোবার ঘরে একটা করে আয়না রেখে দিয়েছি, যখনি আমার মনে সাহেব হবার বিন্দুমাত্র বাসনা জাগে, তখনি আমি আয়নায় গিয়ে আমার মুখ দেখি। আপনারা জানবেন, আমি শুধু বাঙালী নই, আমি বাঙাল, আমার বাড়ি যশোরে।"

মরবার অন্তিম মুহূর্তে পাদরি কৃষ্ণমোহন তাঁর নিঃসঙ্গ মৃত্যুশয্যার পাশে এসে বিদায়-পথযাত্রী কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, মাইকেল, তুমি জীবনে কোন গির্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলে না. তাই তোমার সৎকার নিয়ে গণ্ডগোল হতে পারে……

মুমূর্ষু কবি হাত তুলে কৃষ্ণমোহনকে বাধা দিয়ে বললেন, মানুষের তৈরী কোন গির্জার সঙ্গে কোন সংস্রবকে আমি গ্রাহ্য করি না……আমার সৎকারের জন্যে কারুর কোন সাহায্য দরকার নেই……আমি যাচ্ছি, আমার ঈশ্বরের কাছে·· ··· বিশ্রামের জন্যে……তিনি তাঁর অসীম করুণায় আমাকে দেবেন স্থান।

আলিপুর পশুশালায় একদিন

এক

প্রায় আশী বছর আগে এই কলকাতা শহরে একদিন এক দুপুরবেলায়। একুশ-বাইশ বছরের এক তরুণ বাঙালী, পায়ে তালি দেওয়া চটিজুতো, গায়ে আধ-ময়লা একটা সার্ট, রাস্তায় রাস্তায় আপনার মনে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে দেখে কোন নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে, সেইখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে কি করে সেই বাড়ি তৈরী হচ্ছে।

এগিয়ে চলে, চারদিকে ফাঁকা জায়গা, নয়তো নোংরা বস্তী, পথ চলে আর মনে মনে দিবাস্বপ্ন দেখে, সেই সব শূন্য জায়গা ভরাট হয়ে উঠেছে, রাস্তার দুধারে মাথা তুলে উঠেছে বড় বড় সব বাড়ি, বিচিত্র তাদের গঠন ......তরুণের মনে জেগে ওঠে প্রাসাদময়ী এক নব-নগরী......ভেঙে চুরমার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সেই সব নোংরা বস্তী, তরুণের মনে...... তার পরিবর্তে জেগে ওঠে সূর্যালোকে-উদ্ভাসিত রম্য সব অট্টালিকা, জেগে ওঠে আধুনিক সভ্য মানুষের এগিয়ে চলার পথ-চিহ্ন তরুণের মনে ··

পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলে তরুণ, পকেটে একটিও পয়সা নেই...... মনে পরে একটা খাম কেনবার পয়সার অভাবে গ্রামে-পরিত্যক্ত বালিকা-বধূকে চিঠি লেখা সম্ভব হয়নি......কাঁটার মতন সেই কপর্দকহীনতার দৈন্য ফুটতে থাকে পায়ে পায়ে...হেঁটে তাকে পায়ে পায়ে খইয়ে ফেলবার জন্যে নগরীর উদাস মধ্যাহ্নে পথ থেকে পথে তরুণ এগিয়ে চলে... লক্ষ্যহীন...সহায়হীন...একাকী...

হঠাৎ মনে পড়ে, আলিপুরের পশুশালায় তাঁর একজন পরিচিত লোক সৌভাগ্যবশত এখন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়েছেন...একদিন একই মেসে একই ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে কড়িকাঠ গুণেছেন...তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে মন্দ কি! তবু একটা লক্ষ্য স্থির হয়।

পশুশালার কর্মকর্তার পরিচয়ে তরুণ বাগানের ভেতর প্রবেশাধিকার পেলো। উদ্দেশ্যহীনভাবে বাগানের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তরুণের নজরে পড়লো, সামনেই সাঁকোজাতীয় কি একটা জিনিস তৈরী হচ্ছে। একজন ধোপ-দুরস্ত বিলিতী সাহেব ইংরেজী-হিন্দুস্থানীতে অশিক্ষিত দেশী মজুরদের কি একটা জিনিস বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টায় ক্রমশ রেগে উঠছেন এবং যত রেগে উঠছেন তত বেশী মজুরদের কাছে দুর্বোধ্য হচ্ছেন। কাছে গিয়ে তরুণ ব্যাপারটা অনায়াসেই বুঝতে পারলো। সাহেবের কাছে গিয়ে অযাচিতভাবেই বললো, কিছু যদি মনে না করেন, কাজটা আমি মজুরদের বুঝিয়ে দেবো ?

সাহেব আপত্তি করলেন না। মজুরদের কাছে গিয়ে তরুণ ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল এবং দাঁড়িয়ে থেকে কাজটা তদারক করলো।

সেদিন বিলেত থেকে রাজার জাতের যে সব প্রতিনিধি এদেশে আসতেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এই দেশের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যেতেন 'সাহেব', কিন্তু সেই সাহেবদের মধ্যে এক-একজন 'ইংরেজ'ও থাকতেন। তরুণের সৌভাগ্য সেই অতিথিমুহূর্তে একজন সত্যিকারের ইংরেজেরই সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। তরুণের ভাবভঙ্গী দেখে সেই ইংরেজ ইন্‌জিনীয়ারের ভাল লাগে। আলাপ করেন।

তরুণ বলে, সাধারণ বাঙালীর মতন সে কেরানীগিরি করতে চায় না …প্রতিজ্ঞা করেছে, না খেয়ে যদি মরতেও হয় তা'হলেও সে কেরানীগিরি করবে না…

সেই একান্ত সাধারণ তরুণ বাঙালীর চোখেমুখে ফুটে ওঠে অনন্য-সাধারণ এক দীপ্তি!

ইংরেজ ইন্‌জিনীয়ার পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে যুবকের হাতে দেন! বলেন, কালই সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে পার ?

যুবক বলে, নিশ্চয়ই!

আলীপুরের পশুশালায় হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া একটা মুহূর্ত।

সেই মুহূর্তের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলো কর্ম-প্রচেষ্টাহীন এই অলস জাতির নব কর্ম-প্রেরণা, জন্মগ্রহণ করলো নষ্ট-চরিত্র বাঙালী জাতির আত্মপ্রত্যয়!

কলকাতার পথে ভ্রাম্যমাণ রিক্ত-সম্বল অসহায় সেই তরুণ বাঙালীর নাম রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সেই ইংরেজ ইন্‌জিনীয়ার হলেন স্যার ব্রার্ডফোর্ড লেসলী। তখন ছিলেন শুধু মিঃ ব্রার্ডফোর্ড লেসলী, কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান ইন্‌জিনীয়ার।

এই অকস্মাৎ মুহূর্তটিকে অনুসরণ করার আগে এখানে রাজেন্দ্রনাথ, স্যার রাজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই। স্যার রাজেন্দ্রনাথ কোন দিন গত একশো বছরের কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে আসেননি, দেশী লোকেরাও তাঁকে বক্তৃতামঞ্চে কিম্বা বিদ্রোহ সভায় কোন দিন পায়নি, বিদেশী শাসকেরাও তাঁকে বার বার অনুরোধ করে, আমন্ত্রণ করেও পরাজিত দেশের শাসকের আসনে বসাতে পারেননি। আমার বিশ্বাস, গত পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙালী রাজনীতিকেরা সকলে মিলে সরবে আন্দোলন করে জাতির প্রাণ-ভাণ্ডারে যে শস্য সঞ্চয় করতে পারেননি, এই একটি বাঙালী সকল আন্দোলন থেকে দূরে নীরবে তাঁর একক জীবনের স্বতন্ত্র কর্ম-সাধনায় সেই প্রাণ-শস্যকে সঞ্চয় করে রেখে গিয়েছেন, চারিত্রিক দুর্ভিক্ষের সুনিশ্চিত অপমৃত্যু থেকে বাঙালী জাতিকে রক্ষা করে গিয়েছেন। রাজনৈতিক আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, কিন্তু আনতে পারেনি স্বাধীন জাতির চেতনা ও চরিত্র। যতই আমাদের দেশাত্মবোধে আঘাত লাগুক, একথা আজ নির্মম সত্য যে, আমরা চরিত্রহীন জাতিতে পরিণত হয়েছি এবং যতদিন না আমাদের এই জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠছে, ততদিন স্বাধীনতার মুক্তা-মালা আমাদের গলায় বৃহৎ বিদ্রূপের মতই ঝুলতে থাকবে। আমরা যখন রাজনৈতিক আন্দোলনের উৎসাহে স্বাধীন হবার শর্টকাট পথের সন্ধানে চরকার সুদর্শন-চক্র হাতে ঈশ্বর-আল্লার সংযুক্ত মন্ত্রের উপাসনা করছিলাম এবং মাঝে মাঝে ইনক্লাব জিন্দাবাদের বোমাবাজী ফাটাচ্ছিলাম, সেই সময় এই একটি কালো বাঙালী, অসহায় মধ্যবিত্ত ঘরের নিঃসম্বল ছেলে, তাঁর জাতির সমস্ত লজ্জা, সমস্ত দৈন্য আর অপমান তাঁর নিজের ঘাড়ে নিঃশব্দে বহন করেছিলেন। মহাবেদনায় মর্মের মর্মস্থলে তিনি অনুভব করেন সেই নিষ্ঠুরতম ঐতিহাসিক লাঞ্ছনা, আধুনিক বৈজ্ঞানিক

কর্মশালায় অপাংক্তেয় দেশী লোকেরা, পাশ্চাত্ত্য জাতিরা গড়বে যে সভ্যতার বিচিত্র ইমারত, দেশী লোকেরা হবে শুধু তার ভারবাহী কুলী আর মজুর। পঞ্চাশ বছর আগে রাজেন্দ্রনাথ চরম দুঃসাহসে, সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় একা এই ঐতিহাসিক লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নিজের জীবনের মধ্যে এই বিদ্রোহকে পরিপূর্ণভাবে জয়যুক্ত করে তোলেন। সুকঠিন কর্মের দুঃসাহসিক পথে, চারিত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই অভিনব সংগ্রামে রাজেন্দ্র-নাথের বীরত্ব সেদিন আমাদের চোখে পড়েনি, আজও যে পড়েছে তা মনে হয় না। কারণ আজও আমরা দেশপ্রেম মাপি কারাবাসের গজ-কাঠি দিয়ে, মানুষকে ওজন করি ভোটসংগ্রহ করবার বাটখারা দিয়ে, আজও আমরা মনে করি চরিত্র জিনিসটা ঝুলছে শুধু যৌন-মানদণ্ডের ওপর। বিস্মিত হয়ে দেখি, আজও আমাদের স্কুলপাঠ্য বইতে আমরা আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের সামনে আদর্শ কর্মবীররূপে তুলে ধরি হেনরী ফোর্ড আর এডিসনের জীবনী, সেখানে আজও প্রবেশ-অধিকার লাভ করতে পারেননি কালা-আদমী রাজেন্দ্রনাথ। ইংরেজদের প্রবল চক্রান্ত ভেদ করে রাজেন্দ্রনাথ বিজয়ীর মতন প্রবেশ করেছিলেন আজকের শতাব্দীর ইতিহাসে কিন্তু তাঁর নিজের দেশের লোকের মনের চক্রব্যূহে আজও পাননি প্রবেশ-পথ। আমরা সবাই জানি, তিনি মস্ত বড় একজন কৃতী ব্যবসায়ী, মস্ত বড় একজন ইন্‌জিনীয়ার, আমরা সবাই জানি, মার্টিন কোম্পানী তাঁরই কীর্তি। আমরা শুধু জানি না, যেটা তাঁর সব চেয়ে বড় কীর্তি, সেটা মার্টিন কোম্পানী নয়, সেটা হলো তাঁর চরিত্র, ইস্পাত দিয়ে তৈরী দুর্জয় চরিত্র। আজ আমাদের সব চেয়ে বেশী দরকার এই ইস্পাতের···স্বচ্ছ, কঠিন, ধারালো, ভারসহ, ঘাতসহ, নীলাভ ইস্পাত, সহজে যাতে মরচে ধরে না। এই ইস্পাতের অভাবেই আজ আমাদের স্বাধীনতার ইমারত আমাদের স্বকৃত পাপের লজ্জায় ভেঙ্গে ফেটে পড়ছে। নতুন তৈরী বাড়ির ইট দুদিনেই লোনা ধরে গুঁড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে।

দুই

সেদিনকার পথে-পথে ভ্রাম্যমাণ, অসহায় নিঃসম্বল যুবক যে কি করে হলেন স্যার রাজেন্দ্রনাথ, তার কাহিনী জগতের যে কোন রোমান্সকে হার মানায়।

আলীপুর পশুশালায় হঠাৎ স্যার লেসলীর দেখা পাবার আগে পর্যন্ত, তাঁর জীবন যে কি কঠোর সংগ্রামের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে, তা ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়।...

কোথায় বাংলার এক কোণে পড়ে ছিল নগণ্য এক গ্রাম, ভাব্‌লা। সেই গ্রামে সেকালের একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত এক পরিবার। রাজেন্দ্রনাথের যখন দু'বছর বয়স সেই সময় তাঁর বাবা মারা গেলেন। সংসার ভাগ হয়ে গেল। তাঁর বাবার চারবার বিবাহ হয়েছিল। তাঁর বিধবা মায়ের ভাগে পড়লো গুটিকতক টাকা আর খানকতক বাসন। আর সেই শিশু-পুত্র। দরিদ্র-জননীর সমস্ত স্নেহ দিয়ে বিধবা শিশু-পুত্রকে আঁকড়ে ধরলেন।

সৌভাগ্যবশত বিদ্যাসাগর-জননীর কথা আমরা বিদ্যাসাগরের দরুন কিছুটা জানি। কিন্তু রাজেন্দ্রনাথের জননীকে আমরা চিনি না। বাংলার লিখিত ইতিহাসে এই সব অশিক্ষিতা নারীদের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু এই সব অশিক্ষিতা নারীদের মধ্যে এমন বহু নারী জন্ম-গ্রহণ করেছেন, যাঁদের একবস্ত্র পুঁথিহীন জীবনে জাতির সমস্ত সংস্কার, সমস্ত শৌর্য, জীবনকে গ্রহণ করবার প্রচণ্ড বীরত্ব ও বাস্তবতা, রাজ-রাজেশ্বরীর মত মানসিক ঐশ্বর্য একান্ত সহজভাবে দীপ্যমান ছিল। সেই অশিক্ষিতা নারীদের ধৈর্য, সেবা, ক্ষমা, সংগ্রামশীলতা এবং ভালবাসা যুগ যুগ ধরে এই ক্ষীণসম্বল জাতির পরমায়ুকে রক্ষা করে এসেছে, নীরবে, বিনা আড়ম্বরে, বিনা প্রশংসায়, বিনা দক্ষিণায়। কেউ লক্ষ্য করেছেন কি না, তা জানি না, কিন্তু আজকের বাংলার সমাজ-জীবন থেকে সেই জাতীয় নারীত্ব প্রায় অদৃশ্য হতে চলেছে। পালিসের জৌলুস বাড়াতে গিয়ে আসল সোনাই ক্ষয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমি সেকেলে লোক,

তাই এই প্রসঙ্গ, বাংলার প্রতীক-স্বরূপ সেই বৃদ্ধা মাতা বলপ্রদার ভগ্ন জীর্ণ মন্দিরের শূন্য-প্রাঙ্গনে আমার দীর্ঘশ্বাসের প্রণাম রেখে গেলাম।

রাজেন্দ্রনাথের জননী ছিলেন, সেই বৃদ্ধা মাতা বলপ্রদাদেরই একজন। বাইরের সমস্ত বিরূপতার বিরুদ্ধে, নিজের অন্তরের উদ্বেল স্নেহের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম তাঁকে করতে হয়েছিল, তাঁর সেই অসহায় শিশু-পুত্রকে মানুষ করে তুলবার জন্যে, সে বীরত্বের উল্লেখ খবরের কাগজের হেড-লাইনে ধরা না পড়লেও, এই চরিত্রহীন জাতির জীবনে আজও তার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সেই অশিক্ষিত গ্রাম্য নারী সেদিন বুঝেছিলেন, সামনে যে যুগ আসছে, তাতে ইংরেজী লেখাপড়া না শিখলে, কেউই দাঁড়াতে পারবে না। তাই সেই দরিদ্র বিধবা ঠিক করলেন, যেমন করে হোক্ ছেলেকে ইংরেজী লেখাপড়া শেখাবেন। তাঁর স্বামীর পরিচিত এক ভদ্রলোক, একদিন তাঁর স্বামীর কাছে নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন, তাঁকে ধরে-করে বারাসতে তাঁর বাড়িতে ছেলেকে রেখে দিয়ে এলেন। সেই ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলেদের জন্য একজন মাস্টার নিযুক্ত ছিলেন, বালক রাজেন্দ্রনাথ ফাউ হিসাবে সে দলে জুটে গেলেন। কিন্তু বিধাতা তাতে বাদ সাধলেন। কয়েক বছর যেতে না যেতেই বালকের হলো কঠিন বসন্ত। কোন রকমে প্রাণে বাঁচলেন কিন্তু শরীর একেবারে গেল ভেঙ্গে। দরিদ্র-জননী যথাসাধ্য চেষ্টা করেন কিন্তু কিছুই হয় না। দিন দিন শরীর আরো শুকিয়ে যায়। তখন গাঁয়ের কবিরাজমশাই পরামর্শ দিলেন, কোনরকমে যদি পশ্চিমে বায়ু পরিবর্তনে পাঠাতে পার, তাহলে ছেলে হয়ত বাঁচতে পারে। কিন্তু পয়সা কোথায়? মনে পড়লো আগ্রায় তাঁর এক ভাই থাকেন, যদি কোন রকমে তাঁর কাছে ছেলেকে পাঠাতে পারেন! বুকে পাষাণ বেঁধে মা স্থির করলেন, তিনি ছেলেকে পাঠাবেনই। একদিন গাঁয়ের একটি লোকের সঙ্গে তিনি তেরো বছরের সেই অসুস্থ শীর্ণ পুত্রকে পাঠালেন ব্যারাকপুরে, সেখানে তাঁদের এক আত্মীয় থাকেন, সেখান থেকে আগ্রা যাবার গাড়িতে তাঁরা তুলে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

ভাব্‌লা থেকে ব্যারাকপুর চৌত্রিশ মাইল পথ……সেই চৌত্রিশ

মাইল পথ পায়ে হেঁটে অসুস্থ বালক রাজেন্দ্রনাথ এলেন ব্যারাকপুরে, তাঁর এক মামা যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলীর বাড়ি। যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলী বালকের কিছু জামা-কাপড় কিনে দিলেন এবং একদিন গঙ্গা পেরিয়ে বৈদ্যবাটী স্টেশনে এসে বালককে আগ্রাগামী রেলগাড়ির কামরায় তুলে দিলেন। বালকের সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলীর দেওয়া একখানি থার্ডক্লাশের টিকিট এবং তিনটি টাকা······সেই সম্বল নিয়ে বালক রাজেন্দ্রনাথ যাত্রা করলেন তাঁর জাতির ইতিহাসের দুর্গম পথে··· ···

তিন

বহু বিপর্যয়ের পর এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজেন্দ্রনাথ এলেন কলকাতায়। সেদিনকার প্রেসিডেন্সী কলেজে একটা নামমাত্র ইন্‌জিনীয়ারিং বিভাগ ছিল, তাতে শেখানো হতো ওভারসিয়ারী পর্যন্ত কাজ-চলাগোছের বিদ্যা। রাজেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজের সেই ইন্‌জিনীয়ারিং বিভাগে ভর্তি হলেন। ভবানীপুরে বেলতলায় তাঁদের এক আত্মীয় থাকতেন, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁরই বাড়ীতে থাকবার ও খাবার বন্দোবস্ত হলো, কলেজের মাইনেও তিনি দিতেন। বেলতলা থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ, দুবেলা হেঁটে যাতায়াত করতে হয়। বছর দুই কোনরকমে চলে যাওয়ার পর কলেজে পড়া আর সম্ভব হলো না। বাড়ীতে কিছু টাকা না পাঠালে আর চলে না। মায়ের অনুরোধে, সেকালের প্রথামত তিনি বালক-কালেই বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নিদারুণ অর্থ-যন্ত্রণায় পড়ার বইতে আর মন দিতে পারেন না। এই সময়কার কথা তিনি নিজেই লিখেছেন, "সামান্য যা কিছু জলখাবারের পয়সা পেতাম, জলখাবার খেতাম না, বাঁচাতাম। কারণ স্ত্রীকে কথা দিয়ে এসেছিলাম, দু'তিন দিন অন্তর একখানা করে চিঠি দেবো······আমার স্ত্রী উত্তরে যে চিঠি লিখবেন, তারও ব্যবস্থা আমার চিঠির সঙ্গে করে পাঠাতে হতো। সারা মাসে সব শুদ্ধ আমি ৫৲ টাকা পেতাম। তা থেকে আর কোনমতেই কিছু করা সম্ভব হয়ে উঠতো

না……স্ত্রীকে নিয়মিত চিঠি লিখতেও পারতাম না……আজ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করছি, এই ব্যাপার আমার মনে এমন যন্ত্রণা এনে দিতো যে, পড়াশোনায় রীতিমত ব্যাঘাত হতে লাগলো!"

তখন যোগেন্দ্রনাথ খুঁজে পেতে একটা সামান্য চাকরির যোগাড় করে দিলেন কিন্তু তরুণ রাজেন্দ্রনাথ বেঁকে বসলেন, যত কষ্টই হোক্, তিনি চাকরি করবেন না। যোগেন্দ্রনাথের সমস্ত অনুরোধ যখন ব্যর্থ হলো, তিনি রেগে রাজেন্দ্রনাথকে বাড়ি থেকে বার করে দিলেন। নিরাশ্রয় রাজেন্দ্রনাথ ঘুরতে ঘুরতে এক মেসে গিয়ে একটা মাদুর পাতবার মতন জায়গা পেলেন। সেই মেস থেকেই তিনি বেরুতেন, কলকাতার পথে পথে, ঘুরে ঘুরে দিবাস্বপ্ন দেখতে এবং এইরকম এক উদ্‌ভ্রান্ত দ্বিপ্রহরে তিনি আলিপুর পশুশালায় অকস্মাৎ স্যার লেসলীর দেখা পান।

চার

স্যার লেসলীর বাসনা অনুযায়ী পরের দিন সকালেই রাজেন্দ্রনাথ পলতায় স্যার লেসলীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। একটা প্যাণ্ট আর শার্ট কোনরকমে যোগাড় করে নিয়েছিলেন।

লেসলী সেই তরুণ যুবকের সঙ্গে কথাবার্তায় এতদূর সন্তুষ্ট হলেন যে, তিনি তখুনি প্রস্তাব করলেন, তোমাকে পল্‌তা জলের কলের কিছু কাজ দিতে পারি কিন্তু এক শর্তে……দেখছো তো, কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, সুতরাং সব চেয়ে কম যে রেট আমি পেয়েছি, সে রেট কি তা আমি তোমাকে বলবো না, তুমি সেই রেটে কাজ করতে রাজী আছ?

শূন্য পকেটে হাত দিয়ে রাজেন্দ্রনাথ স্থিরকণ্ঠে বলেন, নিশ্চয়ই। কিন্তু আমারও একটা শর্ত আছে, আমিও যেমন রেট না জেনে কাজ নিতে রাজী হচ্ছি, আপনাকেও তেমনি কথা দিতে হবে, আমি যেন সমগ্র কাজেরই কনট্রাকট্ পাই।

ইংরেজ তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল।

আরম্ভ হলো নিঃসম্বল এক বাঙালী তরুণের জীবনে কাজের এক বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চার। সে বিরাট কাহিনী, এখানে বলবার জায়গা নেই। সামনে আসছে যে নতুন বাঙালী, তারা পাবে সেই কাহিনীর মধ্যে বাঙালীর জীবনের নতুন এপিক।

সেদিনকার সেই ঘটনার পঞ্চাশ বছর পরে। পলতা নয়। লণ্ডন। লণ্ডনে এক বিরাট কমিটির ঐতিহাসিক অধিবেশন হচ্ছে, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্‌জিনীয়াররা এসেছেন সেই কমিটির সদস্য হয়ে। আজ সেই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন স্যার রাজেন্দ্রনাথ। আর সেই কমিটির সামনে আজ সাক্ষ্য দিতে আসছেন, স্যার ব্রাডফোর্ড লেসলী, তখন নব্বুই বছর তাঁর বয়স। কমিটির বিচার্য বিষয় হলো, স্যার লেসলীর তৈরী পুরোনো হাওড়া ব্রিজ ভেঙ্গে নতুন পরিকল্পনায় নতুন ব্রিজ তৈরী করা হবে, না স্যার লেসলীর সেই পুরোনো কীর্তিই বজায় থাকবে। নব্বুই বছরের বৃদ্ধ স্যার লেসলীর অন্তরের চরম সাধ, তাঁর জীবনের সেই চরম কৃতিত্বের স্মৃতি যেন কলকাতার বুকে বেঁচে থাকে। সমস্ত নির্ভর করছে চেয়ারম্যান স্যার রাজেন্দ্রনাথের ওপর! বৃদ্ধ সাক্ষ্য দিতে আসেন, চেয়ারে উপবিষ্ট চেয়ারম্যানের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন, মনে পড়ে পঞ্চাশ বছর আগে একদিন এক নিঃসম্বল তরুণ অকস্মাৎ পথ থেকে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল···

স্যার রাজেন্দ্রও ভোলেননি সে মুহূর্ত! কৃতজ্ঞতায় ভরা তাঁর দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু!

কিন্তু কৃতজ্ঞতার চেয়েও আজ এসেছে বড় দাবী, বিজ্ঞানের দাবী।

চেয়ারম্যান হিসাবে স্যার রাজেন্দ্রনাথ আদেশ দিলেন ভেঙ্গে ফেলতে পুরোনো হাওড়া ব্রিজ।

সভার শেষে উঠে এসে অশ্রুসজল চোখে জড়িয়ে ধরেন স্যার লেসলীকে।

মুছে যায় পুরোনো হাওড়া ব্রিজ······মুছে যায় পলতা······ যেতেই হয়।

শুধু একটি চিঠির উত্তর

এক

১৮৮৭ সালের পারি শহর···

সেই শহরের এক প্রান্তে একটা পুরোনো ভাড়াটে বাড়ি···১৩ নং রু মিশলে···একতলার এক অন্ধকার ঘরে একুশ-বাইশ বছরের এক ফরাসী তরুণ, বেশ-ভূষায় স্পষ্ট চোখে পড়ে আর্ত মধ্যবিত্ত ঘরের অসহায় ভব্যতার সযত্ন-লুক্কায়িত দৈন্যের ছাপ, প্রতিদিন আকুল আগ্রহে চেয়ে থাকে পথের দিকে, কখন পিওন আসবে···

পিওন আসে···চলে যায়···যে-চিঠির আশায় কম্পিতবুকে তরুণ পথ চেয়ে বসে থাকে, সে চিঠি আসে না। নীল চোখের আলো ব্যর্থ প্রতীক্ষার বেদনায় স্থির হয়ে আসে···অবশেষে তরুণ আশা ছেড়ে দেয়, যা অসম্ভব তার জন্যে প্রতীক্ষার কোন মানে হয় না। যাঁর একটা কথার দিকে সমস্ত য়ুরোপ চেয়ে থাকে, বিশ্বের প্রতিষ্ঠার সুমেরু-শিখরে যিনি বসে আছেন বজ্রপাণি দেবরাজের মতন দুর্লভ-মহিমার দূরত্বে, নামহীন, পরিচয়হীন এক রিক্ত ফরাসী তরুণের আবেদন তাঁর কাছে পৌঁছিতেই পারে না···তরুণ শুনেছে, সারা বিশ্ব থেকে শত শত বিশিষ্ট লোকের চিঠি প্রতিদিনের ডাকে তাঁর কাছে আসে, তার মধ্যে এক নামহীন সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশী ছাত্রের চিঠি, কি তার মূল্য থাকতে পারে? সেই চিঠি তাঁর হাতে পড়বে, তিনি পড়বেন, তারপর, উত্তর দেবেন, এ অসম্ভব দুরাশা কি করে মনে স্থান পেলো?

তরুণ মন থেকে সেই চিঠির উত্তর পাওয়ার আশা ত্যাগ করে।

দুই

তার মাসখানেক পরে একদিন। সন্ধ্যাবেলায় ক্লান্ত হয়ে তরুণ বাসায় ফিরছে। দরজা খুলতেই চোখে পড়লো, জানলার তলায় কি একটা প্যাকেট যেন পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি আলো জ্বালে…আলোতে পড়ে, ঠিকানার জায়গায় তারই নাম আর ঠিকানা লেখা। এতবড় প্যাকেট কে তাকে পাঠালো? নজরে পড়ে, পোস্ট-অফিসের ছাপ…রাশিয়ার পোস্ট-অফিসের ছাপ…তবে কি…? তরুণ কম্পিত হাতে প্যাকেটের আবরণ খুলে ফেলে, দীর্ঘ আটত্রিশ পাতা একটা চিঠি…ফরাসী ভাষায় লেখা…চিঠির তলায় স্বাক্ষর লেওন টলস্টয়…চিঠির শুরুতেই সুমেরু-শিখরবাসী সেই বজ্রপাণি দেবতা তরুণকে সম্বোধন করে লিখেছেন, "Cher Frere"…প্রিয় ভাই…

তরুণ অভিভূত হয়ে পড়ে…এই চিঠির জন্যেই প্রতীক্ষায় দিন গুনতে গুনতে ক্লান্ত হতাশায় চিঠির কথা ভুলেই গিয়েছিল। তরুণের নীল চোখে আনন্দের শতশিখা জ্বলে ওঠে, তরুণ পড়তে আরম্ভ করে…

তিন

পারির ১৩নং রু মিশলে রাস্তার সেই অন্ধকার ঘরে ১৮৮৭ সালের একুশে অক্টোবরের সেই বিস্মৃত-সন্ধ্যার মুহূর্তটি উনবিংশ শতাব্দীর সরকারী ইতিহাসে কোথাও উল্লিখিত নেই…কিন্তু সেই অপরূপ মুহূর্তটি সেদিন যে বিচিত্র প্রাণের পদ্মকোরককে ফুটিয়ে তোলে, তার সৌরভ আজ সাহিত্যের ভেতর দিয়ে বিশ্ব-চেতনাকে এক দিব্য মহিমায় পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে, সেই একটি মুহূর্তের জন্যে আজকের অতি সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের চিন্তার আঁশে মিশে গিয়েছে বিশ্ব-মানবের কল্যাণ চিন্তা, প্রতিদিনের মানুষের চিন্তার বাস্তবতার মধ্যে ধরা পড়েছে বিশ্ব-মানবের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক। ১৮৮৭ সালের একুশে অক্টোবরের ১৩নং রু মিশলের অন্ধকার একতলা ঘরের সেই সন্ধ্যার মুহূর্তটি আধুনিক

জগতে নিয়ে এলো অসংখ্য মানুষের মধ্যে একটি নতুন আত্মাকে, এযুগের এক নতুন প্রমিথিয়ুসকে, জাঁ ক্রিস্তফের জনক রমাঁ রোলাঁকে। সেই বাইশ বছরের নামহীন ফরাসী তরুণই হলেন মানুষের আত্মিক মর্যাদার মহাকবি রমাঁ রোলাঁ, বিংশ শতাব্দীর এই দানবের সংগ্রামের রক্ত-নদীর তীরে দাঁড়িয়ে যিনি ডাক দিয়ে গিয়েছেন, জাগিয়ে গিয়েছেন দানবজয়ী মানবের অমর মনকে।

তরুণ রোলাঁর জীবনের সেই একটি মুহূর্তের মধ্যে আছে মানবমনের জাগরণের এক নিগূঢ়-তত্ত্ব। জীবনের পাঁজিতে কোথায় লুকিয়ে থাকে একটা দিব্য-লগ্ন, অঙ্ক কষে তার সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু অকস্মাৎ একদিন যখন আসে সেই দিব্য-লগ্ন, চারদিকের অন্ধকারের মধ্যে নিমেষে জ্বলে ওঠে শত-প্রদীপের বরণশিখা, বাতাসে বাতাসে বেজে ওঠে মিলন-শঙ্খ, সেই একটি মুহূর্তের চন্দ্রাতপতলায় নিমেষে হয়ে যায় জীবন-দেবতার সঙ্গে শুভদৃষ্টি। সেই একটি মুহূর্তের আলোর সামনে স্বচ্ছ হয়ে ফুটে ওঠে জীবনের রাজপথ। যা থাকে অসম্ভবের আকাশে অদৃশ্য, নিমেষে জীবনের অন্তঃপুরে সহজ হয়ে দেয় ধরা। সেই দিব্য মুহূর্তের মানুষ হয় দ্বিজ, হয় তার জন্মান্তর, দস্যু রত্নাকর হয় কবি বাল্মীকি, সেই একটি দিব্য মুহূর্তের শ্রীরাম-স্পর্শে পাষাণী হয় মানবী অহল্যা।

চার

তরুণ রোলাঁ যখন কলেজের পড়া সাঙ্গ করে জীবনের রাজপথে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর আকুল তরুণ মনের সামনে শুধু একটি প্রশ্ন বারে বারে ঘুরে আসে, তারপর······কি? প্রত্যেক সজাগ তরুণের মনের সামনে একদিন রাহুর মতন আকাশ-জোড়া মুখব্যাদান করে দাঁড়ায় এই সর্বনাশা প্রশ্ন, কোন্ পথ? কোথায় সে-পথ, যে-পথে আছে আমার জীবনের পূর্ণতা? অধিকাংশ তরুণের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর আসে স্লট মেশীনের উত্তরের মত, গতানুগতিকতার শ্লিপে আগে থাকতেই ছাপা নির্দিষ্ট বাঁধাবুলির ভাষায়। কিন্তু এই অধিকাংশের মধ্যে এমন দু'একজন

থাকে, যাদের জন্মসূত্রে-পাওয়া বেয়াড়া মন কিছুতেই গতানুগতিকের পথে পা বাড়াতে চায় না। আমের পোকার মতন তাদের মনের মুকুলের ভেতর লুকিয়ে বাড়তে থাকে সৃজনের দুরন্ত কীট।

কৈশোরের জাগ্রত-চেতনার প্রথম দিন থেকে রোলাঁ সঙ্গীত ও সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে সপ্রেমে আত্মনিবেদন করেছিলেন, একনিষ্ঠ অন্তরে এই দুই শিল্পের সাধনা করে চলেছিলেন। জগতে যেখানে সঙ্গীতে প্রাণের সুর জেগে উঠেছে, যেখানে সাহিত্যে মানব-মনের অম্লান পুষ্পের সুরভি ছড়িয়ে পড়েছে, তরুণ রোলাঁর মন সেখানেই মধুমত্ত ভ্রমরের মতন গুঞ্জন করে ফেরে। তাঁর তরুণ অন্তরের সবখানি জুড়ে ছিলেন পরম-দেবতার মতন দু'জন অমর শিল্পী, সঙ্গীতের অধিনায়ক বিটোফেন আর সাহিত্যের অমর-দেবতা শেক্‌স্‌পীয়ার, কিন্তু দেবতার মতনই তাঁরা ছিলেন দূরে। বিটোফেন আর শেক্‌স্‌পীয়ার তাঁর শিল্প-চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন বটে, কিন্তু সেই জাগ্রত চেতনা খুঁজছিল এমন একজনকে যার জীবন্ত স্পর্শে জেগে উঠবে সমস্ত অস্তিত্ব। সেই সময় রাশিয়ার তুহিন প্রান্তর থেকে একটি মানুষের ছায়া, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে হতে, সমস্ত য়ুরোপকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলে। সে-ছায়া হলো টলস্টয়ের। উনবিংশ-শতাব্দীর শেষ-প্রান্তে এসে, য়ুরোপের অন্তর জীবন একটা আত্ম-তৃপ্ত মেদ-সর্বস্ব স্থূলতায় গতিশক্তিহীন হয়ে পড়ছিল। সেই সুবাসিত সুসজ্জিত বর্ধিত-মেদ দেহের আড়ালে হারিয়ে যেতে বসেছিল মানুষের মন···একদিকে সমাজের উঁচুস্তরে কাম-ক্লান্ত বিলাসিতার আত্ম-রতির প্রাণান্ত আয়োজন, মিথ্যা, ভণ্ডামী, ন্যাকামী আর শৌখীন শিল্প-প্রীতির প্রাণহীন আড়ম্বর, অপর দিকে সমাজের নিম্নস্তরে জীবন-ভীত পরাজিত রিক্ত মানুষের ক্রমবর্ধমান ব্যর্থতার প্রতিবাদহীন আক্রোশের কুৎসিত জ্বালা···এর মাঝখানে প্রাচীন ভাইকিংদের বজ্রধর পরম-দেবতার মত এসে দাঁড়ালেন টলস্টয়···তাঁর সাহিত্যের জ্বলন্ত শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল যা কিছু পুরোনো, পচা, বাসি, স্থূল ও ক্ষুদ্র···তাঁর রুদ্র নিঃশঙ্ক প্রাণবাণীর পাবক আগুনে পুড়ে গলে গেল সেই সময়কার য়ুরোপীয় সভ্যতার মেদ-বহুলতা, ফুটে উঠলো আবার তপস্যা-

শীর্ণ সৌন্দর্যে য়ুরোপের চির-জিজ্ঞাসু মন। টলস্টয়ের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি লেখা তখন য়ুরোপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত শিক্ষিত মানুষের চেতনায় জাগিয়ে তোলে নব বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। জাগিয়ে তোলে অমীমাংসিত প্রশ্নের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। জাগিয়ে তোলে ঘুমিয়ে-পড়া জীবনের সাত-মহলা-বাড়ীর ভিতর বাহির।

মৃত্যুর পর কৃতী পুরুষেরা পৌরাণিক মহিমার মর্যাদা পান কিন্তু টলস্টয় তাঁর জীবদ্দশাতেই সেই পৌরাণিক অলৌকিকতার বিস্ময় অর্জন করেছিলেন। তাঁর দর্শন লাভের জন্যে, তাঁর সঙ্গে একটা কথা বলবার জন্যে, প্রতিদিন য়ুরোপের দূর-দূরান্তর দেশ থেকে, য়ুরোপের বাইরে থেকে, দলে দলে তীর্থযাত্রীর মতন ইয়াস্‌নায়ার কুটীর প্রাঙ্গণে আসতো... গর্কী তাঁর অপরূপ ভাষা আর অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি দিয়ে ইয়াস্‌নায়ার এই বৃদ্ধ Odin-কে এঁকে গিয়েছেন।

রোলাঁ যখন কলেজে পড়ে, তখন থেকেই তিনি টলস্টয়ের এই বিরাট সাহিত্যিক প্রতিভার দিকে আকৃষ্ট হন। প্রথম যৌবনে রোলাঁ যেদিন টলস্টয়ের War and Peace পড়লেন, সেইদিন সম্পূর্ণ হয়ে গেল তাঁর মনে টলস্টয়ের পূজার মন্দির। War and Peace নভেলের মধ্যে তরুণ রোলাঁ যেন তাঁর নিজের মনকেই খুঁজে পেলেন। টলস্টয়ের সৃষ্টির সেই বিশালতা, সেই গভীরতা, সেই ব্যাপকতা এবং সেই সঙ্গে অপূর্ব সূক্ষ্মতা তরুণ রোলাঁর চোখের সামনে তাঁর জীবনের সমস্ত ছড়িয়ে-পড়া কল্পনাকে একত্র করে নিয়ে এলো, আর কোন দ্বিধা নেই, আর কোন সন্দেহ নেই, জীবনের বাঞ্ছিততম প্রেয়সীরূপে সাহিত্যের অধি-লক্ষ্মীর গলায় তিনি দেবেন বরমাল্য, এমন এক অপরূপ সৃষ্টি তিনি করবেন যার বিশালতা, ব্যাপকতা, গভীরতা আর সূক্ষ্মতা অদৃশ্য পথগুরু টলস্টয়ের War and Peace-এর অনুরূপ হবে...আমরা আজ জানি, তরুণ রোলাঁর সেই স্বপ্ন সত্য হয়েছে...তাঁর জাঁ ক্রিস্‌তফ্‌ আজ সমগ্র মানবচেতনাকে পরিব্যাপ্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্ব-সাহিত্যের এক অপরূপ সৃষ্টি, বিংশ-শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে আধুনিক মানব-মনের মহাভারত।

কিন্তু ঠিক, এই সঙ্কল্পের লগ্নে এলো তরুণ পথযাত্রীর সামনে, মানবিক জীবনের সবচেয়ে বড় কঠিন সমস্যা। সযত্নে কুড়িয়ে-আনা তাঁর সমস্ত চিন্তা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। যে পরম দেবতার মুখের দিকে চেয়ে তিনি সাহিত্যিক জীবন গ্রহণ করবার সংকল্প করেছিলেন, অকস্মাৎ সেই পরম দেবতার কাছ থেকেই এলো সকল স্বপ্ন-ভাঙা নিদারুণ ঝড়, এলো বিপর্যয়ের ঝড়। য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শিল্পী রুদ্ররোষে অকস্মাৎ জীবনের শেষ লগ্নে এসে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন সমস্ত সুকুমার শিল্পের ওপর। টলস্টয়ের What is Art ? নির্মম, নিষ্ঠুর বলিষ্ঠতায় আঘাত করলো য়ুরোপ সাহিত্যে শিল্পে তরুণ রোলাঁ যাঁদের চিরসুন্দর বলে আঁকড়েছিল, তাঁদের প্রত্যেককে। What is Art ? পড়ে তরুণ রোলাঁর মন ঝড়ে ছিন্নশাখা বৃক্ষের মত আর্তনাদ করে উঠলো। যে বিটোফেন আর যে শেক্স্পীয়ারকে তিনি তাঁর জীবনের উৎস মনে করতেন, ইয়াস্নায়ার ঋষির সবচেয়ে নির্মম, সবচেয়ে কঠোর আঘাত গিয়ে পড়লো সেই বিটোফোন আর সেই শেক্স্পীয়ারের ওপর। পুরাণে আমরা দেখি, সৃজনকর্তা বিষ্ণু যেমন ধরণীর বেদনায় সংক্ষুব্ধ হয়ে মাঝে মাঝে নিজের হাতে নিজের রচিত এই সুন্দর সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হন, তেমনি সেদিন আমরা দেখলাম মানুষের বেদনায় সংক্ষুব্ধ হয়ে ঋষি টলস্টয় ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন শিল্পী টলস্টয়কে। তরুণ রোলাঁর মন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। তখন সবেমাত্র তিনি জীবন আরম্ভ করছেন। টলস্টয়ের ওপর তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। তিনি শত চেষ্টাতেও বুঝে উঠতে পারলেন না টলস্টয় কি বলতে চাইছেন। সমস্ত সুকুমার শিল্প যদি মানুষকে নষ্ট করবারই সহায়তা করে চলেছে, তবে কিসের প্রয়োজন সেই সুকুমার শিল্পের ? এক্ষেত্রে কি করা কর্তব্য ? শেক্স্পীয়ার অন্যায় করেছেন ? বিটোফেনের সঙ্গীত মানুষকে ভ্রান্ত করেছে ? শেক্স্পীয়ার, বিটোফেন ধরতে পারেন নি শিল্পের আদর্শ ? টলস্টয়ই কি ঠিক ধরতে পেরেছেন ? বাতুল বলে টলস্টয়কে উড়িয়ে দিতে হবে ? তাও কি সম্ভব ? কে বলে দেবে কোন্‌টে পথ ? দিনের পর দিন, এই আদর্শের সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে সেদিন নামহীন তরুণ রোলাঁ স্থির করেন, সমস্ত

কথা জানিয়ে টলস্টয়কে তিনি চিঠি লিখবেন, যদি তিনি উত্তর দেন। যদি তিনি বুঝিয়ে দেন, তিনি কি বলতে চাইছেন! তাই ভয়ে, ভাবনায়, সঙ্কোচে, দ্বিধায় পারির সেই দরিদ্র, নামহীন ছাত্রটি তার অন্তরের নিদারুণ শিল্প-বিরোধের কথা জানিয়ে টলস্টয়কে চিঠি লেখে।

পাঁচ

সে চিঠির উত্তর যেদিন এলো, সেদিন রোলাঁ উত্তর পাবার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। চিঠি পড়তে গিয়েই দেখেন, সেই বিশ্ববন্দিত মহাপুরুষ তাঁকে সম্বোধন করেছেন, প্রিয় ভাই বলে···তারপর উত্তর দিতে দেরী হয়ে যাওয়ার জন্যে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন···এবং কেন এই দেরী হলো, তার কৈফিয়ৎস্বরূপ লিখছেন, তোমার চিঠির সামান্য অক্ষরগুলির ভেতর দিয়ে আমি তোমার জিজ্ঞাসু মনকে দেখতে পেয়েছি···তাই তোমার কথার উত্তর দেবার জন্যে দিনের পর দিন ভেবেছি, আমার অন্তরের যা সত্যতম বাণী, তা পরিপূর্ণভাবে তোমাকে জানানো আমার কর্তব্য। আমি মনে করি, আমার জীবনের সব চেয়ে বড় কাজ হলো, যদি এই অন্ধকার আর সন্দেহের পৃথিবীতে আমি একটাও প্রাণের দ্বীপ জ্বেলে যেতে পারি।

তারপর প্রায় চল্লিশ পাতা দীর্ঘ এক অপরূপ আলোচনা। নতুন সাহিত্যিক চেতনার জীবন্ত দলিল। প্রত্যেক সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিকের গভীর অনুশীলনের বিষয়।

টলস্টয়ের সেই অপূর্ব পত্র, সেদিন তরুণ রোলাঁর মনের সব সন্দেহ, সব অন্ধকার দূর করে দিল···তরুণ রোলাঁর সামনে সেই একটি দিব্য মুহূর্তের বাতায়নের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠলো সূর্যালোক-উদ্ভাসিত জীবনের রাজপথ···।

এক প্রদীপ থেকে জ্বলে উঠলো আর এক প্রদীপ···।

সেই প্রদীপের শিখা, আজও এই মুহূর্তে, নিঃশব্দে চলেছে তার কাজ করে···এক প্রদীপ থেকে আর এক প্রদীপে, এক মন থেকে আর এক মনে, এমনি করেই নিঃশব্দে চলে আলোর নিত্য অভিসার।

মূল উৎসের সন্ধানে

এক

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ .....বেলুড়ে গঙ্গার ধারে একটি ঘরে, কুশাসনে বসে আছেন তুষারশুভ্র এক ইংরেজ তরুণী...কুমারী মারগারেট নোবল্।

সামনে মৃগচর্মের আসনে বসে আছেন স্তম্ভিত সমুদ্রের মত শান্তমূর্তি ভারত-সন্ন্যাসী...স্বামী বিবেকানন্দ।

অর্গলবদ্ধ দ্বার...

পাশ্চত্য জগতের মেয়ে আজ ভারত-সন্ন্যাসীর কাছে নেবে ভারতের তন্ত্র-অনুযায়ী মন্ত্র দীক্ষা।

লোকচক্ষুর অন্তরালে, সেই নিভৃত মুহূর্তে, দীক্ষা-অন্তে জন্মগ্রহণ করলো একটি নতুন নাম, নিবেদিতা।

সমসাময়িক ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই জানেন, এটা শুধু নামান্তর নয়, এক দেহে জন্মান্তর।

এই বিস্ময়কর জন্মান্তর-গ্রহণের কাহিনীর মধ্যে আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের সব চেয়ে বড় সন্দেহ ও সমস্যার সমাধান আছে।

দুই

যেদিন প্রত্যক্ষজ্ঞানের দাবিতে বিজ্ঞানের জন্ম হলো য়ুরোপে, সেইদিন থেকে বিজ্ঞান আর ধর্মের চলে আসছে বিরোধ।

বিজ্ঞান যতই তার সত্য-অনুসন্ধিৎসার স্বচ্ছ আলোয় ভাস্বর হয়ে উঠেছে, ধর্ম ততই লোকাচার আর সংস্কারের ধোঁয়ায় মলিন হয়ে এসেছে। ক্রমশ এমন দিন এলো যখন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ তার সজ্ঞান চেতনা থেকে ধর্মকে নির্বাসিত করে দিলো, ভগবান বা ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ থাকে ভাল, না থাকে কিছু যায় আসে না। ধর্ম পড়ে রইলো

পুরোহিত আর পাদ্রীদের জীবিকারূপে আর অশিক্ষিত নর-নারীর অসহায় মনের অন্তিম আশ্রয়রূপে।

অবশেষে, উনবিংশ শতাব্দীতে এসে, বিজ্ঞানের প্রখর আলোকে শিক্ষিত সভ্য মানুষ বীরদর্পে ধর্মকে অস্বীকার করলো, ধর্ম অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক, অপ্রয়োজনীয়...ব্যর্থ মানুষের কল্পনার আশ্রয়, বড় জোর খানিকটা ম্যাজিক, খানিকটা হিপ্‌নটিজম্, আর বাকি সবটা আত্ম-প্রতারণা।

তাই আজকের জগতের শিক্ষিত নাগরিক প্রকাশ্যে ধর্মকে স্বীকার করতে যতখানি লজ্জিত কুণ্ঠিত হয়, ঠিক ততখানি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্ গর্ব বোধ করে ধর্মকে অস্বীকার করে চলতে।

আজকে ধার্মিক হওয়া মানে, রি-এ্যাকশনারী হওয়া, প্রগতির উল্‌টো পথে চলা...আর ধর্মকে অস্বীকার করা মানে হলো প্রোগ্রেসিভ হওয়া। এবং সেইজন্যেই যাঁরা মনে মনে ধর্মবিশ্বাসী তাঁরাও রি-এ্যাকশনারী হবার অপবাদের ভয়ে প্রকাশ্যে মৌন থেকে আত্মরক্ষা করেন।

সকল দিক থেকে ধর্মের এই চরম গ্লানির লগ্নে, বাংলার এক অখ্যাত গণ্ডগ্রামে নিঃশব্দে এক মহাবিপ্লবের সূচনা হয়। ধর্ম-সংক্রান্ত বিপ্লব বলে, এ যুগের বিপ্লবের ইতিহাসে তার স্থান হয় নি। এই ঐতিহাসিক মহাবিপ্লবের প্রবর্তক হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে ছোট্ট দক্ষিণেশ্বর গ্রামের জনবিরল মন্দির-প্রাঙ্গণে এক তথাকথিত নিরক্ষর গেঁয়ে ব্রাহ্মণ গুটিকতক তরুণ শিষ্যদের দিয়ে আড়ম্বরহীন সংবাদ-পত্রের-প্রচারহীন যে-ধর্ম-বিপ্লবের সূচনা করেন, সেদিন তা দক্ষিণেশ্বর আর তার আশেপাশের বাংলার মাটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেদিন কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সেই আলো, বাংলার প্রয়োজনে নয়, ভারতের প্রয়োজনে নয়, বিশ্বের প্রয়োজনেই জ্বালা হয়েছিল। ধীরে ধীরে আজ আমরা উপলব্ধি করছি, বিশ্বের চেতনার বিবর্তনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে গাঁথা দক্ষিণেশ্বরের ধর্ম-বিপ্লব।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বাংলার ইতিহাসে জন্মগ্রহণ করেন নি, তিনি

জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিশ্বের ইতিহাসে। তাঁর ছায়া গিয়ে পড়েছে আগামী কালে।

ধর্মের বিকৃতির ফলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক মানুষের মনে যে-সন্দেহ, যে-সংশয়, যে-প্রশ্ন জেগেছে ধর্ম-সম্বন্ধে, তারাই প্রামাণিক উত্তর এবং বৈজ্ঞানিক মীমাংসা আছে এই ধর্ম-বিপ্লবে। এবং এই ধর্ম-বিপ্লবের আগুনই অগ্রদূতের মত সেদিন ঘোষণা করে গিয়েছে,

এখনো নিভেনি ভারতের সাধনার যজ্ঞাগ্নি-শিখা…

বিশ্বের প্রয়োজনে এই ভারতেই আবার আসছেন নতুন করে বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, পতঞ্জল আর শঙ্কর, যাঁরা নিজেদের জীবনের প্রত্যক্ষ সাধনায় উত্তর দিয়ে যাবেন বৈজ্ঞানিক মানুষের নিরুত্তর প্রশ্নকে…

সম্প্রদায়গত আর জাতিগত ধার্মিকতার বেড়া ভেঙে, সর্বমানবের জন্যে যাঁরা ফিরিয়ে আনবেন জীবনের শাশ্বত মূল্যমানকে…সর্বমানবের ধর্মকে…

উপলব্ধির নব-বিজ্ঞানে যোগাবেন জীবন ও জীবনাতীতের দ্বন্দ্ব… মন্দিরে নয়, গির্জায় নয়, মসজিদে নয়, মানুষের চেতনায়, মানুষের জীবনের বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠা করে যাবেন বিভেদহীন সম্প্রদায়হীন এক-মানব-ধর্মকে!

বিশ্বের ইতিহাসে এই হবে নতুন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

ইংরেজ তরুণী মারগারেট নোবল্ আর ভারত-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মিলন-সম্পর্কের মধ্যে আছে সেই মহা-ভবিতব্য-তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

গত একশো বছরের পাশ্চাত্য জগৎ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সব আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে অদৃষ্টপূর্ব শক্তি-রহস্যের সন্ধান পেয়েছে, যার ফলে ডক্টর এলেক্সী ক্যারেলের মতন বৈজ্ঞানিক আজ বিজ্ঞানের ভাষায় ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন, মানুষের রক্তকণিকা আমরা গুনে দেখতে শিখেছি বটে, কিন্তু আজও পর্যন্ত মানুষ আমাদের কাছে অজানাই রয়ে গিয়েছে।

গত একশো বছরের ভারতবর্ষও আত্মিক বিজ্ঞানের গভীর অনু-

শীলনের ফলে পেয়েছে সেই শক্তি-রহস্যেরই সন্ধান······যার ফলে সে বিশ্ব-মানবীয় চেতনায় ধর্মকে নতুন সংজ্ঞায় দিয়েছে রূপ······

যার দরুন পাশ্চাত্যজগতের হৃদ্‌কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন,

"জগতের অন্য সব বস্তুর মতন ধর্মও একটা একান্ত প্রত্যক্ষ বস্তু···

"অন্য সব জিনিস যেমন দেওয়া-নেওয়া যায়, তার চেয়ে অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম দেওয়া-নেওয়া যায়···

"একবার স্পর্শে, একবার দৃষ্টিতে, একটা সমগ্র জীবনের ধারা পরিবর্তিত করে দেওয়া যায়।

"আমি এই ব্যাপার বহুবার জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি।"

নিবেদিতার জীবন হলো ধর্মের সেই প্রত্যক্ষ বাস্তবতার ল্যাবরেটরী-পরীক্ষা।

তিন

যেদিন লণ্ডনে ওয়েস্ট এণ্ডে স্টার্ডির বৈঠকখানায় মারগারেট নোবল্ প্রথম বিবেকানন্দকে দেখতে যান, সেদিন তাঁর সঙ্গে আরো চৌদ্দজন কৌতূহলী সুশিক্ষিতা ইংরেজ তরুণী ছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গিনীদের মতনই শুধু একজন কৌতূহলী দর্শক ছিলেন মাত্র। তবে এ কৌতূহল হলো প্রতিভা-দীপ্ত জাগ্রত মনের কৌতূহল।

মারগারেটের বয়স তখন আটাশ বছর। প্রথম তারুণ্যের সমস্ত উন্মাদনা কেটে গিয়েছে, জীবন আর সংসারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে মন ও মস্তিষ্ক তখন বলিষ্ঠভাবে সজাগ। ধর্মনিষ্ঠ ক্যাথলিক খৃষ্টান পরিবারের মেয়ে···শৈশবের প্রথম চেতনা থেকে অনুষ্ঠানিকভাবে খৃষ্টান ধর্মের ও রীতিনীতির সঙ্গে ঘটেছে মর্ম-পরিচয়। জন্ম-সূত্রে পেয়েছেন, তিনটি অপরূপ জাতির ঐতিহ্য-গত দান। মারগারেটের রক্তে ছিল পিতার দরুন স্কটের পার্বত্য-স্বাতন্ত্র্য, মাতার দরুন আইরিশ ভাবানুরাগ, শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজের কাছ থেকে পাওয়া প্রচণ্ড বিচারশীল বুদ্ধি ও অনুদ্বেল

চরিত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই বৈজ্ঞানিক জাগরণের লগ্নে মারগারেট একনিষ্ঠ পড়ুয়ার মতন গ্রহণ করেছেন পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান ও দর্শনের পাঠ। জীবনের বৃহত্তর সংজ্ঞায় জেগে উঠেছে শিক্ষিত মন।

যৌবনের জাগরণ-লগ্নে, তাঁরই মত আর একটি জাগ্রত মন, গেলোয়া তাঁর নাম, তরুণ জ্ঞান-তপস্বী, মারগারেটের উন্মুখ মনের সামনে তুলে ধরে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার···প্রথম প্রেমের মধুর আলোয় দু'জনে মেতে ওঠে অধ্যয়নে···য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কবি আর দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে গেলোয়া পরিচয় করিয়ে দেয় মারগারেটকে···বেড়ে যায় জীবনের দিক-চক্ররেখা। অকস্মাৎ মৃত্যু এসে ভেঙে দিল এই মাধুর্যের সাধনা।

সাথীহীন শূন্য জীবনে মারগারেট গ্রহণ করলেন সেবাব্রত···দরিদ্র-পল্লীতে ছেলে-মেয়েদের পড়ান, কোথায় কে রুগ্ন তার পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং সেই সঙ্গে গ্রহণ করেন, স্বাধীনতার সৈনিকের দায়িত্ব।

আয়ারল্যাণ্ডে তখন এসেছে নব-জাগরণের জোয়ার ··মারগারেট হলেন লণ্ডনে আইরিশ হোমরুল-আন্দোলনের নায়িকা। এই প্রচণ্ড সজাগ জীবনের স্বাতন্ত্র্যের সামনে অকস্মাৎ একদিন এক নভেম্বর মাসের অপরাহ্নে এসে দাঁড়ালেন অপরূপ এক ভারত-সন্ন্যাসী। বিবেকানন্দের বয়স তখন সবে মাত্র ত্রিশ পেরিয়েছে।

সেদিন লণ্ডনে স্টার্ডির বৈঠকখানায় বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও আলোচনা শুনতে যাঁরা আসতেন, তাঁরা অধিকাংশই বিবেকানন্দের অপরূপ তেজোদীপ্ত মূর্তি দেখে, তাঁর অপরূপ বাচন ও ভাষণ শুনে নির্বাক হয়ে থাকতেন। সমস্ত প্রশ্নের বাইরে এই অপরূপ ভারত-সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্ব তাঁদের অভিভূত করে ফেলতো। মারগারেটও অভিভূত হয়েছিলেন। বিশ্বের ইতিহাসের, বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারের সমস্ত বিষয় নিয়ে এমন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে যে কেউ বলতে পারে, মারগারেট না শুনলে বিশ্বাস করতে পারতেন না। তাঁর প্রতিভাদীপ্ত সজাগ মনে পরম-বিস্ময়ের মত আবির্ভূত হলেন বিবেকানন্দ···এই মানুষটি যখন বিশ্বের ইতিহাসের কথা বলেন, মনে হয় যেন বিশ্বের ইতিহাসের

প্রত্যেকটি ঘটনাকে তিনি নিজে স্পর্শ করে এসেছেন। বিশেষ করে, যখন ভারতবর্ষের কথা বলেন। মারগারেট অবাক্ হয়ে ভাবেন, এ কোন্ ভারতবর্ষ। এ ভারতবর্ষের কোন কথাই তো তিনি জানেন না।

সমস্ত মন দিয়ে সন্ন্যাসীর বক্তৃতা অনুধাবন করেন, হঠাৎ এমন একটা কথা এসে পড়ে, এমন একটা উক্তি, এমন একটা শব্দ যার কোন মানেই মারগারেট খুঁজে পান না। লোকটিকে শত বুঝতে চেষ্টা করেও বুঝতে পারেন না। সঙ্গিনীরা নির্বাক হয়ে থাকে, কিন্তু মারগারেটের সজাগ মন নির্বাক হয়ে থাকতে পারে না। মারগারেট প্রশ্ন করেন, প্রতিবাদ করেন, তর্ক করেন। তাঁর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত মনে সন্ন্যাসীর কথা সুগভীর আলোড়ন জাগিয়ে তোলে। সন্ন্যাসীকে গ্রহণ করতে মারগারেটের মন উন্মুক্ত হয়ে উঠে কিন্তু সন্ন্যাসীর কথাকে নয়। না বুঝে কোন কিছুকে স্বীকার করা মারগারেটের পাশ্চাত্য স্বাতন্ত্র্যে আঘাত লাগে।

ভারত-সন্ন্যাসী নীরবে লক্ষ্য করেন সেই স্বাতন্ত্র্য-অভিমানী শিক্ষিতা পাশ্চাত্ত্য তরুণীর অন্তর্দ্বন্দ্বকে। মারগারেটের সমস্ত প্রতিবাদ আর প্রশ্নের বাইরে ভারত-সন্ন্যাসী দেখতে পান তাঁর মধ্যে আগামীকালের নব-নারীর মূর্তি। ভারতে ফিরে এসে, তিনি আমন্ত্রণ করে পাঠান মারগারেটকে ভারতে আসবার জন্যে। পূর্ব আর পশ্চিমের মিলনের ইতিহাসে সে-আমন্ত্রণ-লিপি অনির্বাণ জ্যোতি-শিখার মত জ্বলছে। মারগারেটের মনের ও চিন্তার পূর্ণ স্বাধীনতাকে স্বীকার করে বিবেকানন্দ তাঁকে ভারতে আমন্ত্রণ করেন। মারগারেট সে-আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ভারতে আসেন। ২৮শে জানুয়ারী মারগারেট ভারতে পদার্পণ করেন, ১৬ই মার্চ বিবেকানন্দ তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিনী রূপে দীক্ষা দেন।

চার

আমাদের অনেকের ধারণা যে মিস মারগারেট নোবল্ যেন অনায়াসেই নিবেদিতা হয়ে ওঠেন। এটা শুধু নামের পরিবর্তন নয়।

নামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে আছে চেতনার, সংস্কারের, এমন কি স্মৃতির পরিবর্তন। এই বিস্ময়কর পরিবর্তন যে হয়েছিল, তা ঐতিহাসিক সত্য সুতরাং যে-উপায়ে এই পরিবর্তন ঘটেছিল, তা-ও সমানভাবে ঐতিহাসিক সত্য।

যেদিন বিবেকানন্দ মারগারেটকে দীক্ষা দিয়ে নিবেদিতা নাম দিয়েছিলেন, সেদিনও নিবেদিতার মন ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য-বোধে ভরপুর। লণ্ডনে বিকানন্দের কথার ভেতর দিয়ে মারগারেট যে-ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন, ভারতবর্ষে পা দিয়ে দেখলেন সম্পূর্ণ আলাদা আর এক ভারতবর্ষ, পদে পদে দৈন্য, পদে পদে কুসংস্কার, পদে পদে মানবতার গ্লানি, যা দেখে শিক্ষিত পাশ্চাত্ত্যেরা ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত না হয়ে পারে না। সকলের ওপরে, লণ্ডনে যে-বিবেকানন্দকে তিনি দেখেছিলেন, বেলুড়ে এসে দেখলেন আর এক বিবেকানন্দকে। বিবেকানন্দকে বেলুড়ে প্রথম দেখে সদ্য-দীক্ষিতা নিবেদিতার মনে যে ছবি জেগে উঠেছিল, পরবর্তীকালে নিবেদিতা স্বয়ং তাঁর অপরূপ ভাষায় তাকে রূপ দিয়ে গিয়েছেন "ভারতবর্ষে এসে তাঁকে দেখলাম, in all the fruitless torture and struggle of a lion caught in a net." সেই বেদনার্ত বিক্ষুব্ধ মূর্তি দেখে সব-দীক্ষিতা নিবেদিতা নারীর স্বভাবধর্মে কাতর হয়ে, স্বামীজীর অন্য পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাদের সঙ্গে গভীরভাবে পরামর্শ করেছেন, যে কোন উপায়ে সম্ভব, মাস্টারকে চলো আমরা ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে যাই য়ুরোপে! এবং সরল মনে নিবেদিতা তখন নিজেও বিবেকানন্দকে অনুরোধ করেছেন, চলুন, আমরা ফিরে যাই য়ুরোপে। আপনার স্থান এখানে হতে পারে না, আপনার উপযুক্ত স্থান হলো য়ুরোপে।

এই ব্যাপারের উল্লেখ করলাম, এই জন্যে যে, সদ্য-দীক্ষিতা যে-নিবেদিতা বিবেকানন্দকে ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে যাবার কথা মনে স্থান দিতে পেরেছিলেন, সেই নিবেদিতাই এই ভারতের ধূলো-কাদা-মাটির সঙ্গে মিশে নিজে ভারতবর্ষ হয়ে গিয়েছিলেন···কি করে তা সম্ভব হলো?

পাঁচ

যেদিন স্বামী বিবেকানন্দ তরুণী মার্গারেট নোবেল্‌কে নিবেদিতা নামে দীক্ষিত করেন, সেদিন রাত্রিতে তিনি সদ্য-দীক্ষিতা শিষ্যাকে আশীর্বাদ করে একটি কবিতা লেখেন, ইংরেজী কবিতা। তার মর্ম হলো,—

"তোমার হৃদয় হোক জননীর মত,
বীরের মত হোক তোমার পণ।
যে-কোমলতা, যে-মধুরতা আছে
মধুরতর কুসুমের নিঃশব্দ বিকাশে,
যে-দীপ্তি যে-শক্তি আছে
মঙ্গল-আরতির চম্পক-শিখায়,...
যে-বীর্য জানে আদেশ করতে,
আর ভালবাসায় জানে আদেশ স্বীকার করতে...
যে-মন স্বপ্ন দেখে,
আর যে-মন অবিচল ধৈর্যে থাকে স্থির...
যে-আলো আছে বৃহৎ আকাশে
আর যে-আলো আছে ক্ষুদ্রতম অণুতে,
এই সব, এবং আরো কিছু
যা রইলো আজ আমার চাওয়ার বাইরে,
জননীর আশীর্বাদে তুমি হও তার চির-অধিকারিণী।"

এই কবিতার মধ্যে সেদিন বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যার জন্যে যা যা প্রার্থনা করেছিলেন, এবং প্রার্থনার আড়ালে যা-যা ছিল অনুচ্চারিত, আমরা আজ জানি, তা সমস্তই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে ওঠে ভবিষ্যৎ নিবেদিতার মধ্যে।

বিবেকানন্দ যেদিন সদ্য-দীক্ষিতা শিষ্যাকে আশীর্বাদ করে এই কবিতা লিখেছিলেন, সেদিনকার নিবেদিতাকে দেখে কোন সাধারণ

মানুষই কল্পনা করতে পারতেন না যে, এই মেয়েই মাত্র তিন কি চার বছর পরে হবে বিংশ শতাব্দীর এক অনন্যা নারী যে-নারীর অপরূপ মূর্তি বিবেকানন্দ সেই আশীর্বাদী কবিতার মধ্যে গড়েছিলেন।

নিবেদিতা যেদিন দীক্ষিতা হয়েছিলেন, সেদিন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আরো কয়েকজন বিদেশী পাশ্চাত্য নারী তাঁর শিষ্যারূপে ছিলেন। নিবেদিতা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠা। অন্য বিদেশী শিষ্যাদের সঙ্গে তখন বাইরের দিক থেকে নিবেদিতার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। বরঞ্চ, অন্য শিষ্যারা যেখানে বিনা প্রতিবাদে গুরুর সমস্ত কথা স্বীকার করে নিতেন, নিবেদিতা সেখানে প্রশ্ন করতেন, প্রতিবাদ করতেন, তর্ক করতেন।

নিবেদিতা যখন স্বামীজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল উনত্রিশ। তাঁর মন ও মস্তিষ্ক তখন পাশ্চাত্ত্য জীবনবাদ ও পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যে পূর্ণ-গঠিত। তা' ছাড়া, ইংরেজ-জাতের সর্বপ্রধান চারিত্রিক যে বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং স্বজাতির শ্রেষ্ঠতায় অভ্রান্ত ধারণা, কুমারী মার্গারেট নোবল্ যখন বেলুড়ে এসেছিলেন, তখন তাঁর মানসিক গঠনের মধ্যে সেই স্বাতন্ত্র্যবোধ ও পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতার অভিমান পূরা মাত্রায় ছিল। বিবেকানন্দের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁর জাগ্রত রোমান্টিক মনে ব্যক্তিগতভাবে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটা অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও ভক্তি জাগিয়ে তুলেছিল মাত্র, যার জন্য তিনি ভেবেছিলেন, পরম নির্ভয়ে এই লোকটির হাতে জীবনের ভার তুলে দেওয়া যেতে পারে। তাই তিনি ভারতবর্ষে বিবেকানন্দের শিষ্যারূপে এসেছিলেন, ভারতের সামাজিক উন্নয়নের কাজে বিবেকানন্দকে সাহায্য করবার জন্যে। একমাত্র স্বামীজীর মনে ছিল এই বিচিত্র পাশ্চাত্ত্য তরুণীকে কেন্দ্র করে এক দুরন্ত স্বপ্ন···ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নব-নাগরিক গড়ে তোলবার এক পরম দুঃসাহসিক মানবীয় পরীক্ষার পরিকল্পনা।

বিবেকানন্দের স্বপ্নে ছিল এক নূতন পৃথিবী···জাতি-প্রেমের পাঁচিল ভেঙে সাম্প্রদায়িক ধর্মের, পুরোহিত-তন্ত্রের বেড়াকে উচ্ছেদ করে, পূর্ব আর পশ্চিমের মানুষে-গড়া বিভেদের পার্থক্যকে মুছে দিয়ে, ইতিহাসগত

ঐতিহ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নস্যাৎ করে এক নতুন ধরনের মানুষকে তৈরী করতে, যারা এই পৃথিবীকে জানবে তাদের ঘর বলে, নিজেদের মনকে জানবে একমাত্র ভগবানের মন্দির বলে, যাদের জীবনের বাস্তবতায় পৃথিবীতে সত্য হয়ে উঠবে খৃষ্টান ধর্ম নয়, মুসলমান ধর্ম নয়, হিন্দু ধর্ম নয়, মানব-ধর্ম।

এই মানবীয় পরীক্ষায় ভারতবর্ষের একটা বিশেষ সার্থকতা আছে, তাই তিনি বলেছিলেন, এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের ইতিহাস তন্ন তন্ন করে পড়ে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক মাটির কণা নিজের পায়ের তলায় মাড়িয়ে, ভারতের সমগ্র অস্তিত্বের বিচিত্র-ধারা নিজের চেতনায় প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে তিনি ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন, দেখেছিলেন এই তেত্রিশ কোটি দেবতা আর ভূত-শাঁখচুন্নীর ভারতবর্ষের পাশাপাশি, এই নুড়ি-পূজা আর গাছ-পূজা আর পাঁজি-পূজার ভারতবর্ষের পাশাপাশি, এই সতীদাহ আর জাতিভেদ, আর নারী-পীড়ন আর হাঁচি-টিকটিকির ভারতবর্ষের পাশাপাশি বেঁচে আছে আর এক ভারতবর্ষ, শাশ্বত, ধ্রুব, অপরাজেয়, অপরাজিত, যে-ভারতবর্ষের প্রজ্ঞার অম্লান আলোকে যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে সর্বমানবের কল্যাণ ও আনন্দ-যজ্ঞের আয়োজন, জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে যেখানে সর্ব-বন্ধন-মুক্ত মানুষ খুঁজে চলেছে তার সর্বোত্তম প্রকাশকে। আমাদের আদিম ঋষিরা ভারতবর্ষের লোকদের ডেকে বলেন নি, শৃণ্বন্তু ভারতবাসিনেঃ তাঁরা বিশ্বের মানুষকে ডেকে বলেছিলেন, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা! যেদিন ভারতের মাটিতে প্রথম এই বিশ্বচেতনার প্রকাশ হয়, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত, শত আন্দোলনের উঠা-নামা সত্ত্বেও, সেই সর্বমানবীয় অমৃত-সাধনা বা আনন্দ-সাধনার ধারা অব্যাহতভাবে একমাত্র এই ভারতবর্ষের মাটিতেই সংসাধিত হয়ে এসেছে, তাই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে আছে সর্ব-মানবের কল্যাণ-সাধনার মহা-পরীক্ষার ফল এবং সেই জন্যেই বিশ্বমানবের ক্রমবিকাশে ভারতবর্ষের রক্তের সম্পর্ক পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে আছে। তাই যখন ভারত-কবির মুখে শুনি,—এই ভারতের মহা-মানবের সাগর-তীরে, একদিন আনত শিরে পূর্ব আর পশ্চিম, উত্তর আর দক্ষিণকে এসে মিলতে হবে, তখন সেটা

শুধু অন্ধ জাতি-প্রেম বা উদাত্ত কবি-কল্পনা বলে মনে হয় না, সেটা হলো জগৎ-ব্যাপারে মানব-সভ্যতার বিচিত্র ক্রমবিকাশের অনিবার্য পরিণতির বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি।

বিবেকানন্দ-নিবেদিতার অপরূপ মানবীয় সম্পর্কের ভেতর দিয়ে পূর্ব আর পশ্চিমের অনিবার্য মিলনের একটা পূর্বরূপ সত্য হয়ে উঠেছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাবিত্রী মহাকাব্যের নামকরণের সময় সাবিত্রী নামের তলায় লিখেছেন, A legend and a symbol. অর্থাৎ সাবিত্রী মহাকাব্যের মধ্যে যেটা উপাখ্যানের অংশ, সেটা হলো অতীতের বস্তু, legend, যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে কিন্তু সেই legend-এর মধ্যে, সেই উপাখ্যানের মধ্যে আছে, ভবিষ্যৎ জীবনের একটা প্রতীক, symbol...... যে-ঘটনা ঘটবে, তারি পূর্বাভাস। বিবেকানন্দ-নিবেদিতার সম্পর্ক ও সেই রকম A legend and a symbol. সেই অপরূপ মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে আছে আমাদের আগামী জীবনের পৃথিবীর আগামী ইতিহাসে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের একটা symbol.

বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, সেই আত্মিক বিজ্ঞানকে যুগ-যুগান্তরের জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষের সামনে তুলে ধরতে, জীবনে প্রয়োগের দ্বারা তার মূল্য ও বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করতে। সেই জন্যেই তিনি নির্বাচন করে নিয়েছিলেন নিবেদিতাকে। এই আত্মিক বিজ্ঞান যদি সত্য হয়, তাহলে পূর্বও পশ্চিমের কাছে সমান সত্য হবে। জাতি ও সম্প্রদায়গত ধর্ম যেখানে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে বিভেদের পাঁচিল গড়ে তুলেছে, সেখানে প্রমাণিত করে দেখানো, এই ভারতের সাধনায় আছে এক আত্মিক-বিজ্ঞান, এক মানব ধর্ম, যা বিশ্বের সব মানুষই সমানভাবে গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে। আদিম ভারত-ঋষির কল্পনায় ছিল যে-ধর্ম, বিশ্বকে যা এক নীড়ে পরিণত করবে, আজ এসেছে লগ্ন সেই ধর্মকে বিশ্বের সামনে উদ্ঘাটিত করে ধরবার। বিবেকানন্দ-নিবেদিতার অপরূপ সম্পর্কের মধ্যে রয়ে গিয়েছে সেই বিস্ময়কর মানবীয় পরীক্ষার সার্থক মূর্তি।

দুঃখের বিষয়, এই অপরূপ সম্পর্কের দৈনন্দিন ক্রমবিকাশের কাহিনী

আমাদের জানা নেই, আজ জানবার কোন উপায়ও নেই…কি করে নিদারুণ স্বাতন্ত্র্যগর্বী উচ্চশিক্ষিতা এক পাশ্চাত্ত্য তরুণী তাঁর রক্তের বাধা পেরিয়ে, তাঁর ঐতিহ্যের বাধা পেরিয়ে, ধর্মের বাধা পেরিয়ে, একই জন্মে, একই দেহে তার সম্পূর্ণ বিপরীত এক চেতনা, ঐতিহ্য আর সত্তাকে গ্রহণ করেছিলেন, তার বিস্ময়কর ইতিহাসের কাহিনী কেউ-ই লিখে রাখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি।

ছয়

যে-দিন বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য তরুণী মার্গারেট নোবেল্‌কে নিবেদিতা নামে দীক্ষিত করেন, তার কয়েকদিন পরে এক অপরাহ্নে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে নব-দীক্ষিতা শিষ্যাকে জিজ্ঞাসা করেন, এখন যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমার জাতি কি, কি উত্তর দেবে তুমি ?

পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা ও ইংরেজ-চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যে গর্বিতা নিবেদিতা সেদিন অকুণ্ঠ-ভাবেই জবাব দিয়েছিলেন, আমি বলবো, আমি ইংরেজ।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জে ওঠেন কঠিন গুরু, Patriotism like yours is a crime এবং সেদিন থেকে শুরু হয় গুরু ও শিষ্যার এক বিচিত্র সম্পর্ক।

যে নিবেদিতাকে আমরা জানি ভারতের আত্মাস্বরূপিণীরূপে, যাঁকে দেখেছি একান্ত ধর্মনিষ্ঠা হিন্দু তপস্বিনীর মত হিন্দুর পূজা-পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে, বর্ষার ঘন কালো মেঘে বিদ্যুৎ প্রকাশ দেখে যাঁর মনে আপনা থেকে জেগে উঠতো কাল-ভৈরবীর মূর্তি, আমাদের অনেকের ধারণা বিবেকানন্দের প্রভাবের সম্মোহনে যেন অনায়াসে সেই নিবেদিতা গড়ে উঠেছিলেন।

নিবেদিতা যখন বিবেকানন্দের কাছে বেলুড়ে আসেন, তখন নিবেদিতার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি……তাঁর মন ও মস্তিষ্ক পূর্ণগঠিত এবং সে-মন ও মস্তিষ্ক কোন সাধারণ মানুষের মন ও মস্তিষ্ক নয়, পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার rationalism আর ইংরেজ-চরিত্রের কঠিন স্বাতন্ত্র্যবোধে গড়া পূর্ণবিকশিত এক মন। বিবেকানন্দকে তিনি অন্তর

থেকে ভালবাসতেন। বিবেকানন্দের সেবায়, বিবেকানন্দের কাজে যদি নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন, তাহলে তিনি কৃতার্থ হবেন, এই ধারণা নিয়েই তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের স্বরূপ কি, কি তাঁর কাজ, এবং কিভাবেই সে কাজে তিনি তাঁর সহায় হতে পারেন, ভারতবর্ষে বিবেকানন্দের কাছে এসে নিবেদিতা দেখলেন, সে সম্বন্ধে তিনি যা কিছু ধারণা করেছিলেন, সবই ভুল। দূর থেকে এই অপরূপ মানুষটিকে যেভাবে দেখেছিলেন, কাছে এসে দেখেন, এ যেন সম্পূর্ণ আলাদা আর এক মানুষ, যে মানুষের মনের প্রবেশপথের কোনই সন্ধান তিনি জানেন না। দূরে থেকে যে মহাসাগরকে মনে হয়েছিল প্রশান্ত নীল, তার কাছে এসে দেখেন—নিশিদিন তার বুকে চলেছে ঝঞ্ঝা আর তরঙ্গের প্রলয়ঙ্কর দোলা। ভারতের প্রচণ্ড দৈন্যের বাস্তবতায়, যুগ যুগ সঞ্চিত জড়ত্বের জঞ্জালে ব্যাহতগতি দেশের পঙ্গুতা তখন জাগিয়ে তুলেছে বিবেকানন্দের অন্তরে মহাবেদনার তাণ্ডব। নবদীক্ষিতা নিবেদিতা স্তব্ধ বিস্ময়ে গুরুর দিকে চেয়ে দেখেন, মনে হয়, এই একটি লোক একা তেত্রিশ কোটি লোকের শৃঙ্খলের ভার বইছেন···আর চারিদিকে সেই তেত্রিশ কোটি লোক পরম উদাসীনভাবে জড়ত্বের ভারে পড়ে আছে। এ এক অসম্ভব উন্মাদ পরিস্থিতি। সেদিন নিবেদিতা গুরু বিবেকানন্দকেও বুঝতে পারেননি, ভারতবর্ষকেও চেনেননি, তাই নারীর স্বাভাবিক মমতায় তিনি গুরুকে কাতরভাবে অনুরোধ করেছিলেন, চলুন, ভারতবর্ষ ছেড়ে য়ুরোপে···এ দেশে আপনাকে মানায় না···আপনার স্থান হলো য়ুরোপে।

এবং বিবেকানন্দ যখন সেই কাতর অনুরোধে অট্টহাস্য করে ওঠেন, তখন নিবেদিতা আরো বিব্রত হয়ে পড়েন···পাশ্চাত্য বিদ্যা ও বুদ্ধির সমস্ত দর্প নিয়ে সেদিন নিবেদিতা বিবেকানন্দের সঙ্গে তর্ক করেন··· বিবেকানন্দের আদেশকে অগ্রাহ্য করতেন না বটে, কিন্তু সব সময় সব আদেশকে সহজ অন্তরে স্বীকারও করতে পারতেন না। তার ফলে নিবেদিতার অন্তরে জেগে উঠলো এক মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব। পাশ্চাত্য শিক্ষায় একান্ত সচেতন সেই ইংরেজ তরুণীকে বিবেকানন্দ শুধু হিন্দু নাম দেননি, তাঁর অন্তরে ছিল এক মহাস্বপ্ন, এক চরম দুঃসাহসিক মানবীয় পরীক্ষার

পরিকল্পনা। মানুষের মনের ত্রাণ-মন্ত্র যদি দুর্লভ সাধনায় ভারতবর্ষ আয়ত্ত করে থাকে, তবে তা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের কাছে সত্য হবে না কেন? একজন ভারতীয়ের পক্ষে সেই ধর্মের সত্যকে উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়, কারণ তার ঐতিহ্যে, তার রক্তে রয়েছে সেই উপলব্ধির বীজ কিন্তু একজন বিদেশী, যার ঐতিহ্যে, যার রক্তে, যার শিক্ষায়, যার মস্তিষ্কের রেণুতে রেণুতে রয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত আর এক শক্তি ও চেতনা, সে যদি এই জীবন-সত্যের উপলব্ধি না করতে পারে, তাহলে কখনই তাকে বিশ্ব-মানবীয় বলা যেতে পারে না। তাই জাতি-ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কার-ঐতিহ্য আর রক্তের দাবীকে অস্বীকার করে বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন সেই ইংরেজ-তরুণীর জীবনে এই মহৎ-পরীক্ষা করতে। তাঁর জীবন নিয়ে তাঁর কঠিন গুরু যে সুকঠোর পরীক্ষা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে নিবেদিতা অবহিত পর্যন্ত ছিলেন না। বেলুড়ে আসার পর থেকে যতই দিন এগিয়ে চলেছে, নিবেদিতার কাছে ততই—তাঁর গুরু দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছেন এবং বোঝবার চেষ্টায় ততই তাঁর জাগ্রত মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, অশান্ত হয়েছে, বেদনায় ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা জিনিস সব সময়ই স্থির ছিল, সে হলো ব্যক্তিগতভাবে বিবেকানন্দের ওপর নিবেদিতার অসীম শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা।

কি করে এই পাশ্চাত্য স্বাতন্ত্র্যবাদী জাগ্রত-মন ইংরেজ-তরুণীর মনকে বিবেকানন্দ সমস্ত ঐতিহ্য ও শিক্ষা-সংস্কারের বিরোধিতা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে ভারত-ধর্মের শাশ্বত-সত্যে অনুরঞ্জিত করে তোলেন, কি করে মার্গারেট নোবল্ সত্যিই রূপান্তরিত হলেন নিবেদিতায়, বিংশ শতাব্দীর এ্যাডভেঞ্চার-ভরা ইতিহাসে সেই বিস্ময়কর বাস্তবতা হলো সবচেয়ে বড় এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। দুঃখের বিষয়, এত নিকটের ঘটনা, কিন্তু তার অধিকাংশ পাতাই অলিখিত। নিবেদিতা তাঁর লেখার মধ্যে তাঁর এই বিস্ময়কর নবজন্মলাভের বিবরণ যেটুকু রেখে গিয়েছেন, সেইটুকুই হলো আমাদের পুঁজি এবং আমার বিশ্বাস, তাঁর লেখা—My master as I saw him, বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে একখানি সর্বশ্রেষ্ঠ বই যে-বই ভারতের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রত্যেক কলেজে অবশ্য-পাঠ্য হিসাবে

অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। এই বইতে আমরা দেখতে পাই, আজকের সভ্যতার দুটি প্রধান ধারার দ্বন্দ্ব ও মিলনের প্রত্যক্ষ জীবন-উদাহরণ। ভারতীয় আত্মিক সাধনার যে-সব ব্যাপার পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মনের কাছে হেঁয়ালি আর অবাস্তব বলে মনে হয়, নব-দীক্ষিতা নিবেদিতার কাছেও তা প্রথমে দুর্বোধ্য হেঁয়ালি মনে হয়েছিল। এই অপূর্ব বইতে, নিবেদিতার নিজের ভাষায় এই আত্মিক দ্বন্দ্বের অকপট সত্য প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। সেই আত্মিক সাধনার বিভিন্ন স্তর ও সমস্যার কথা আলোচনা করার স্থান এটা নয়। এখানে শুধু তার একটা বিশেষ সমস্যার কথা বলতে চাই।

আমাদের সাধনার প্রথম পুরুষ হলেন গুরু। ধর্মের বা তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্যে প্রবেশ করতে হলে, দেহ ও মনের একটা বিরাট প্রস্তুতি দরকার। এবং এই প্রস্তুতির মূলে যোগ্য গুরু তাঁর শক্তির একটা অংশ শিষ্য বা শিষ্যাকে দেন। এই শক্তি একান্ত বাস্তব এবং আলোকধর্মী। এই শক্তি অঘটন ঘটাতে পারে। এই শক্তির আলোয় যা দুর্জ্ঞেয় তা সহজ হয়ে যায়, বুদ্ধির ও চেতনার মুদিত কমল আপনা থেকে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এক আধার থেকে অপর আধারে যখন শক্তিকে অনুচালিত করতে হয়, তখন তার গ্রহণের দিকটাও শক্তি-ধারণের উপযোগী হওয়া চাই। গুরুর কাছে সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদনে এই উপযোগিতা আসে।

এই তত্ত্বকে বুদ্ধি দিয়ে স্বীকার করতে আধুনিক শিক্ষিত মনে আঘাত লাগে, সমস্ত স্বাতন্ত্র্যের অভিমান বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নিবেদিতারও লেগেছিল। গুরুর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার এতটুকু অভাব বাইরের দিক থেকে ছিল না। বিবেকানন্দ যখনি যে আদেশ করেছেন, তা পালন করতে চেষ্টা করেছেন। অথচ যতই দিন এগিয়ে চলে, ততই নিবেদিতা বুঝতে পারেন, নির্দয় কঠিন গুরু যেন তাঁর কাছ থেকে দূরেই সরে যাচ্ছেন। শাস্ত্রপাঠ, ধ্যান-ধারণা নিয়মমত করে চলেন, কিন্তু কিসের একটা অভাবে সব যেন অর্থহীন নিষ্প্রাণ হয়ে থাকে। অবশেষে এমন একদিন এলো, যখন বিবেকানন্দ নিবেদিতার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতেন না। তখনও নিবেদিতার মনে পাশ্চাত্য শিক্ষিতা নারীর আত্মাভিমানের

রেশ পড়ে ছিল, যার ফলে তিনি তখন ভাবতেন যে, গুরু তাঁকে অবজ্ঞা করছেন। তিনি তখনও জানতেন না, অদৃশ্য থেকেও গুরু সব সময় তাঁকে ঘিরে আছেন। অবশেষে নিবেদিতার মানসিক অবস্থা এ-রকম দাঁড়ালো যে, তিনি ভেঙ্গে পড়লেন, মর্মান্তিক যাতনায় অন্তর মুহ্যমান হয়ে এলো। নিরুদ্ধ মর্মান্তিক যাতনা অজস্র কান্নায় ফেটে পড়লো।

এমন সময় বিবেকানন্দ হিমালয়-পরিভ্রমণে বেরুলেন। নিবেদিতার বুক নীরবে নিভৃতে কাঁপতে থাকে। কঠোর গুরু নিশ্চয়ই তাঁকে ফেলে রেখে যাবেন। কিন্তু ধীরামাতার কাছে শুনলেন, গুরু বলেছেন, নিবেদিতাও সঙ্গে যাবে।

হিমালয়ের পথে কিন্তু গুরুর সেই বাহ্যিক গাম্ভীর্যের কোন পরিবর্তনই ঘটলো না। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া নিবেদিতার সঙ্গে কোন কথা বলেন না। নির্জন অরণ্যে শালবনের ছায়ায় শিষ্যাদের নিয়ে গুরু তত্ত্ব-আলোচনা করেন। নিবেদিতা প্রাণপণ চেষ্টা করেন সে-তত্ত্বকে গ্রহণ করতে, বুঝতে, কিন্তু কিসের অভাবে যেন তার মর্মে গিয়ে পৌঁছতে পারেন না। আগে তর্ক করতেন, কিন্তু এখন আর করেন না। কিন্তু না-বোঝার জ্বালা নিশিদিন আগুনের মতন জ্বলতে থাকে। ভেতরের নিরুদ্ধ বেদনা কান্নায় ফেটে পড়ে। সে-কান্না ধীরামাতার নজরে পড়ে। মর্মছেঁড়া কান্না। বিগলিত বেদনা, মান, অভিমান। সে কান্না সহ্য না করতে পেরে একদিন ধীরামাতা গুরু বিবেকানন্দকে বলেন, নিবেদিতার এ-কান্না দেখা যায় না। সে কি শান্তি পাবে না?

শান্তকণ্ঠে বিবেকানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, আজ বোধ হয় চতুর্দশী তিথি?

ধীরামাতা বলেন, ঠিক তাই। শুক্লা চতুর্দশী।

বিবেকানন্দ উঠে দাঁড়ান, দূর হিমালয়-চূড়ার দিকে চেয়ে বলেন, আজ সারাদিন আর সারারাত আমি একলা পাহাড়ের ভেতরে গিয়ে থাকবো···কাল পূর্ণিমায় তোমাদের কাছে ফিরে আসবো।

পরের দিন। হিমালয়ের অরণ্য-নির্জনতার ঊর্ধ্বে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ। নিবেদিতা আকুল অন্তরে অপেক্ষা করে আছেন গুরুর প্রত্যাগমনের

আশায়। অদৃশ্য কি এক বিদ্যুৎ-তরঙ্গে ঘন ঘন কেঁপে উঠছে তাঁর দেহ, কেঁপে উঠছে গভীরতম চেতনা।

সহসা দেখেন, চন্দ্র-কর-উদ্ভাসিত অরণ্যে দীর্ঘ ছায়া ফেলে, সামনে দাঁড়িয়ে এক দিব্য-পুরুষ, আকাশের সমস্ত আলো যেন তিনি তাঁর দেহে সংবরণ করে নিয়েছেন, দাঁড়িয়ে আছেন শুভ্রশির হিমালয়ের তুঙ্গ-শৃঙ্গের মতন। দেখেন, সামনে দাঁড়িয়ে গুরু বিবেকানন্দ।

শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকেন, নিবেদিতা! শিষ্যা, কন্যা আমার!

নিবেদিতা লুটিয়ে পড়েন গুরুর চরণে। গুরুর আদেশে উঠে দাঁড়ান।

সেই দিব্য-মুহূর্তে মাথায় হাত রেখে বিবেকানন্দ স্পর্শ করলেন নিবেদিতাকে···

মাত্র একটি স্পর্শ···

সেই একটি স্পর্শে জগতে জেগে উঠলো সম্পূর্ণ নতুন এক নারী··· সম্পূর্ণ নতুন এক সত্তা···

নিমেষে অন্তরে জ্বলে উঠলো, হিরন্ময়-পাত্রে ঢাকা জ্ঞানের স্বর্ণ-শিখা···

সেই মুহূর্তে, সকল তর্ক, সকল যুক্তি, বুদ্ধির ও বিচারের সমস্ত অঙ্ক-কষার ঊর্ধ্বে, মানুষের চেতনায় যে দিব্য সত্য একান্ত বাস্তব হয়ে ওঠে, তার কথা তিনিই বলতে পারেন, জীবনে সেই মহাসৌভাগ্য যিনি অর্জন করেছেন।

সেই দিব্য মুহূর্তের কথা নিবেদিতা নিজে লিখে রেখে গিয়েছেন,—

"Long, long ago, Sri Ramakrishna had told his disciples that the day would come when his beloved Naren would manifest his own great gift of bestowing knowledge with a touch. That evening at Almora I proved the truth of his prophecy."

"বহু, বহুদিন আগে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের কাছে বলে গিয়েছিলেন, এমন একদিন আসবে, যেদিন তাঁর প্রিয়তম শিষ্য নরেন

এমন শক্তির অধিকারী হবে যে, তার একটি স্পর্শে জেগে উঠবে মানুষের দিব্য-চেতনা। সেদিন আলমোড়ার সেই সন্ধ্যায় প্রত্যক্ষভাবে আমার জীবনে তাঁর সেই ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়ে ওঠে।”

সেদিন সেই মুহূর্তে নিবেদিতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যে অদৃশ্য মহাশক্তি সত্য হয়ে উঠেছিল, তার কয়েক বৎসর আগে বিবেকানন্দ ও তাঁর সঙ্গীদের জীবনেও সেই অদৃশ্য মহাশক্তি ঠিক এমনিভাবেই সত্য ও বাস্তব হয়ে উঠেছিল, যুগে যুগে দেশ-দেশান্তরে যাঁরাই অনুসন্ধান করেছেন, তাঁরাই এই শক্তির বাস্তব ও প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছেন, অথচ আজও শিক্ষিত লোকেরা আদুরে নাবালক ছেলের মতন বলে, প্রমাণ কৈ?

একলা চলো রে

এক

মৃত্যু-বিধ্বস্ত নোয়াখালি। পশু-মানুষের ভয়ে পালিয়ে এসেছে ভয়ার্ত মানুষের দল। যারা পালাতে পারেনি, পড়ে আছে তাদের শব, ঝোপে-ঝাড়ে, জঙ্গলে, মাটির গর্তে। বাতাসে বাসী রক্তের গন্ধ। বিভীষিকার মাত্রা কতখানি, তা জানবার পর্যন্ত উপায় নেই। নির্যাতিত পক্ষের কোন লোকই সাহস করে প্রবেশ করতে পারে না সেই হিংস্রতার জঙ্গলে। সেই সংবাদহীনতার সুযোগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে বীভৎসতার বেহিসেবী ফর্দ···জ্বলে ওঠে প্রতিহিংসার আগুনের শিখা···সে আগুনে ক্ষিপ্ত পশুর মতন নখদন্ত বিস্তার করে ছুটে আসে বিবরশায়ী রক্ত-লালসা·সে রক্ত-লালসায় ডুবে যায় শীর্ণকায় একটি মানুষের আজীবনের সাধনা···স্তম্ভিত মহাবেদনায় মহাত্মা গান্ধী চেয়ে দেখেন নোয়াখালির দিকে। তিনি চল্লেন পশুর বিবরে, শেষ বোঝাপড়া করতে নিজের সঙ্গে সমস্ত জগতের উপহাসকে মাথায় নিয়ে, মানুষের চেতনায় সুপ্ত যে-শুভবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে তিনি প্রচার করেছেন অহিংসার চরম বাস্তবতা, সে কি অলীক? শুধু পুঁথির কথা? আকাশ-কুসুমের মত অসম্ভব? তারি চরম পরীক্ষা হোক নোয়াখালিতে···নোয়াখালিতে যারা করেছে এই বর্বরতা, যাদের নখদন্তে এখনও লেগে আছে মানুষের রক্ত, তাদের দিয়েই তিনি করাবেন এই রক্ত-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত··· যে হাত আঘাত করেছে, সেই হাত দিয়েই তিনি আহতের সেবা করাবেন···

এই চরম জীবন-পরীক্ষার পথে তিনি বেছে নিলেন একজন মাত্র সঙ্গী, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। নোয়াখালির বুনোপথ দিয়ে চলে এই দুটি মানুষ···রাত্রির অন্ধকারে হত্যা-মৌন শূন্য কুটীরের দাওয়ায় নীরবে ভাবেন মহাত্মা গান্ধী, কোথায় কি ভাবে প্রবেশ করা যায়

তমসাচ্ছন্ন মানুষের মনে ? মহাত্মা গান্ধীকে তারা আঘাত করে না, অপমান করবার চেষ্টা করে না, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট বুঝতে পারেন, তাদের মনের কাছে তিনি পৌঁছতে পর্যন্ত পারছেন না। এক একটা দিন ব্যর্থ হয়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবিচল শান্ত মনে ক্ষুব্ধ আবর্তে জেগে ওঠে আশঙ্কার তরঙ্গ···আজ ভারতে আছে একটা নোয়াখালি, কাল প্রভাতে হয়ত সেখানে দেখা দেবে একশো'টা নোয়াখালি···একটা দণ্ড, একটা প্রহরেরও আজ আছে চরম ঐতিহাসিক মূল্য।

হেঁটে চলেন এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে। কিন্তু কোনমতেই বিরুদ্ধ মনের দরজা খুলতে পারেন না। মনে হয়, তাঁর এতদিনের সমস্ত সাধনা যেন ব্যর্থ হতে চলেছে। আজ যেন সত্যিই তিনি একা···

রাত্রিতে এক গ্রামের ধারে বনের প্রান্তে এক শূন্য কুটীরের দাওয়ায় সাময়িক রাত্রিবাসের আয়োজন। কিন্তু সে রাত্রিতে মহাত্মাজীর অনমনীয় কর্মতালিকার সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল। অসহায় শিশুর মতন চঞ্চল হয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান আর আপনার মনে আপনাকেই জিজ্ঞাসা করে ওঠেন, ক্যায়া করুঁ। কি করবো ? কি করবো ?

সঙ্গী নির্মলকুমার স্তব্ধ বেদনায় দেখেন, প্রমিথিয়ুসের সেই মর্মান্তিক আত্মদাহের জ্বালা। কোথায় পথ ? কে দেবে তার সন্ধান ?

আকুলভাবে গান্ধীজী বলে ওঠেন, তবে কি···এতদিন যা ভেবে এসেছেন, তা সবই ভুল ? এতদিন পরে, এত সংগ্রামের পরে স্বীকার করে নিতে হবে পরাজয়কে ?

আকুলভাবে অন্তর মন্থন করে তিনি খোঁজেন, সেই চরম আত্মিক সঙ্কটে, অস্তিত্বের সেই নিরাবলম্বন নিদারুণ লগ্নে কে দেবে প্রেরণা ? কে দেবে আশ্বাস ? কে দেবে এগিয়ে চলবার শক্তি ?

সূর্য যদি নিভে যায়, কে দেবে আলো ?

হঠাৎ বিদ্যুৎ-ঝলকের মত মহাত্মা গান্ধীর তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ আর্ত অন্তরে জেগে ওঠে ত্রাণ-মন্ত্রের শিখা। নির্মলকুমারের কাছে এসে আকুলভাবে বলে ওঠেন, নির্মল, গাও তো, গাও তো গুরুদেবের সেই গান, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে···

মৃত্যু-গন্ধ ভরা নোয়াখালির সেই রাত্রি-অন্ধকারের নির্জনতায়, ভারতের ইতিহাসের সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তে ধ্বনিত হয়ে উঠলো রবীন্দ্রনাথের সেই সঙ্গীত-বাণী···

যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলে যা···

যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে পথের কাঁটা তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলে যা···

যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে ঘরে ঘরে তারা দুয়ার বন্ধ করে দেয়, তবে বজ্রানলে নিজের বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে তুই একলা জ্বলে যা···

গানের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে মহাত্মা গান্ধীর মনে পরম আশ্বাস··· বজ্রানলে জ্বলে ওঠে আবার যুগ-দধীচির বুকের পাঁজর। পুঁথির বাইরে, সমালোচকের সমালোচনার বাইরে, সেই দিব্য মুহূর্তে মহাত্মা গান্ধীর চেতনার বাস্তবতায় সত্য হয়ে উঠলো রবীন্দ্রনাথের বাণী ও সুর···একজন গান্ধীর অস্তিত্বের চরমসঙ্কটের প্রয়োজন ছিল সেই একটি গানের সার্থকতার জন্যে, সেই একটি গানের ভাষা ও সুরের ব্যাখ্যার জন্যে। সূর্য নিভে গেলে যে আলোতে আবার জ্বলে উঠতে পারে নূতন, রবীন্দ্রনাথের মত কবির ভাষায় অভিধান-গত অর্থকে ছাড়িয়ে থাকে সেই অবিনাশী নিত্য আলো, নিত্য শক্তির উৎস, প্রাণের নিত্যক্ষয় পরিপূরণ করবার অমৃতকণা। তাকেই বলে মন্ত্র। মন্ত্র হলো ভাষায় পরম পরিণতি। অনন্তকালের সহচর। অনাদি শক্তির বাহন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য হলো মানব-মনের মন্ত্র-সংহিতা। তাঁর গান হলো মানব-জীবনের নব-গীতা।

দুই

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, বিশেষ করে তাঁর জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে একটা প্রকাণ্ড অভাব আমাদের সামনে অলঙ্ঘ্য পাঁচিলের মতন দাঁড়িয়ে থাকে। দুটো প্রচণ্ড শতাব্দীর সমস্ত পথ-প্রান্তর ব্যাপী, সারা

বিশ্ব ছেয়ে যে বিরাট জীবনের মহাবট শত শত ঝুরি নামিয়ে শত দিকে এই পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, মহাবটেরই মতন তার শেকড় গভীর মাটির তলায় অদৃশ্যই থেকে গিয়েছে। বাইরের লোক দেখেছে ঋতুতে ঋতুতে অজস্র ফুল ফোটা আর ফুল-ঝরা, দেখেছে ঝরে-যাওয়া পাতার জায়গায় কেমন করে ফুটে উঠেছে আবার সবুজ পাতার সমারোহ, দীর্ঘ ছায়ায় তপ্ত মধ্যাহ্নে কত শ্রান্তক্লান্ত পথিক এসেছে-বসেছে তার ছায়ায়, উড়েযাওয়া কত পাখী পেতেছে তাতে নীড়, কতবার কত কালবৈশাখীর ঝড়ে ভেঙ্গে পড়েছে তার শাখা, জেগেছে আর্ত আর্তনাদ···কিন্তু মাটির কোন্ সুগভীর স্তর থেকে মহানিঃশব্দতায় কিভাবে রস-আহরণ করে মহাবট হয়েছে কাল-জয়ী, তার দৈনন্দিন বিচিত্র ইতিহাস রয়ে গিয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, অলিখিত। প্রাকৃতিক বৃক্ষের কাছ থেকে মানুষ ফুল, ফল, ছায়া পেয়েই সন্তুষ্ট, কিন্তু জীবনবৃক্ষের মূল শেকড়ের সন্ধান না পেলে মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সুবিশাল জীবনের মূল শেকড়ের সন্ধান আমরা আজও শুরু করিনি, বাইরের কতকগুলি বড় বড় ঘটনা ছাড়া, তাঁর জীবনের বিশেষ বিশেষ অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলির অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার কোন সুযোগই নেই। তাঁর সাত-মহলা বিরাট বাড়ির দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে ভিক্ষুকের মত শুধু দেখছি, আবছা দূরে কোথাও ঝকমক করছে বেলোয়ারী ঝাড়, কোথাও চকিতে উড়ে গেল জাফরানি শাড়ীর আঁচলের একটা কোণ, বাতাসে ভেসে আসছে ভিয়েনের গন্ধ, সুখাদ্যের সুবাস, আগুনে-পোড়া যজ্ঞহবির গন্ধ, তার সঙ্গে ক্বচিৎ কখনো সপ্তম মহলের পাঁচিল ডিঙিয়ে হয়ত ভেসে এলো ভৈরবী কি ভেঁরোর দলভ্রষ্ট একটা ছুটো সুরের মাত্রা···তা ছাড়া সেই বিরাট সাত-মহলা বাড়ির অন্তঃপুরে ঘরে ঘরে ঘটছে যে বিচিত্র ব্যাপার তার কোন সংবাদই জানি না আমরা। আজ জীবনকে জানবার, ঘটনার উৎসমূলে পৌঁছবার যে তীব্র-পিপাসা জেগে উঠেছে মানুষের কৌতূহলী মনে, রবীন্দ্রনাথের জীবনের সামনে সে-কৌতূহল বারে বারে অতৃপ্ত হয়েই ফিরে আসে। পরবর্তী মানুষদের জন্যে কবিগুরু শুধু একবার তাঁর সাত-মহলা বাড়ির একটা দরজা খুলে দিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর শৈশব আর কৈশোর-

জীবনের অপরূপ খেলাঘরের ভেতর গিয়ে আমরা দাঁড়াতে পেরেছি··· এবং সেইটুকুর অপরূপত্বই আমাদের কৌতূহলকে আরো সুতীব্র করে তুলেছে। অবশ্য একথা আমরা জানি যে, জগতে এমন এক ধরনের মহাপুরুষেরা আসেন, বাইরের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যাঁদের জীবনের উত্তাপের সন্ধান পাওয়া যায় না, তাঁদের জীবনের সব সংগ্রাম চলে নিঃশব্দে তাঁদের অন্তরে। তাঁদের অন্তরের বাস্তবতাই হলো তাঁদের জীবনের চরম বাস্তবতা। রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী ও সহযাত্রী আর একজন মহাপুরুষ, রমাঁ রোলাঁ, তাই যখন তাঁর আত্মচরিত লেখেন, তার নাম দিয়েছিলেন, "The journey within." রবীন্দ্রনাথের জীবন হলো এই journey within-এরই এপিক। বাইরের যে সব উপাদান ক্রমশ একটু একটু আত্মপ্রকাশ করছে, সন্ধানী শিল্পী তারই ভেতর থেকে একদিন খুঁজে বার করবে এই বিরাট journey within-এর সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক কাহিনী।

তিন

বাইরের উপাদানের সঙ্কেতকে অনুসরণ করে, রবীন্দ্রনাথের এই অন্তর্মুখী জীবনের উৎস-সন্ধানে দেখি, ভারতের সমতল প্রান্তর থেকে একটা দীর্ঘ পথ চলে গিয়েছে ভারতের চির-প্রহরী ভারতাত্মা হিমালয়ের দিকে··· সেই পথের ওপর দেখি বালক রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্ন······পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে চলেছেন বালক রবীন্দ্রনাথ। হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গের নির্জনতায় মহর্ষি চলেছেন ধ্যানের মধ্যে উপলব্ধি করতে বিশ্বচেতনার রহস্যকে। বালক রবীন্দ্রনাথ এর আগে একবার মাত্র কলকাতার বাইরে গিয়েছিলেন, পেনেটিতে। তারপর, এই দীর্ঘ যাত্রা···একেবারে হিমালয়ের বুকে, বক্রোটাশেখরে। অপার মহাবিস্ময়ে তখন জেগে উঠেছে বালক রবীন্দ্রনাথের মন। যেদিকে চেয়ে দেখেন, সেই দিকেই অপার বিস্ময়। প্রত্যেক পথের বাঁক, প্রত্যেক ছাদের আড়াল, বালকের কাছে মনে হয় যেন জীবনের কি মহাসম্পদকে লুকিয়ে রেখেছে।

বালকের এই বিস্ময়-বিকশিত মনের কাছে সব চেয়ে বড় বিস্ময় হলো, তাঁর পিতা। পিতাকে বালক পরম দেবতা বলে জানে।

এই হিমালয় যাত্রার কয়েক মাস আগেই রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়েছে। মহর্ষি নিজে উপনয়নের আগে বালক রবীন্দ্রনাথকে শিখিয়েছেন, উপনয়নের সার্থকতা কি, গায়ত্রী মন্ত্র কি, কি তার মানে, জীবনের সঙ্গে তার কি যোগ। সুপণ্ডিত জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যকে আনিয়ে তিনি বালক পুত্রকে বিশুদ্ধভাবে গায়ত্রী মন্ত্র ও সূর্য মন্ত্রের উচ্চারণ শিখিয়েছেন। পরম শ্রদ্ধাভরে বালক পিতার প্রত্যেকটি কথাকে ধ্রুবসত্য বলে গ্রহণ করেছে। সেই দিন থেকে বালকের চেতনায় আকাশ-পথ-চারী সূর্যের সঙ্গে যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয় সুদীর্ঘ জীবনের অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত সে-আলোক-আত্মীয়তা একদিনের জন্যেও বিচ্ছিন্ন হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনে কোন দিন প্রভাত-রবি আকাশে এসে দেখেননি যে, তাঁর কিরণের আশীর্বাদ নেবার জন্যে পূর্বমুখী হয়ে বসে নেই রবি-কবি। রবীন্দ্র কাব্যে অমর হয়ে রয়ে গিয়েছে এই আলোক-মিতালীর অবিনশ্বর স্মৃতি। এই গায়ত্রী মন্ত্র অথবা সবিতা মন্ত্র হলো তাঁর আত্মিক জীবনের মূল উৎস। শান্তিনিকেতনের প্রত্যেক প্রাক্তন ছাত্রই তা জানেন।

বক্রোটাশেখরের নিচের দিকে তখনো রয়েছে রাত্রির শেষ অন্ধকার। শেখরের ওপরে এসে পড়েছে প্রভাত আলোর প্রথম রশ্মি। সেই রক্ত-রশ্মির আলোয় বসে ধ্যানস্থ মহর্ষি। পদতলে বসে বালক রবীন্দ্রনাথ অপার বিস্ময়ে চেয়ে আছেন সেই ধ্যান-মৌন আলোক-স্নাত মূর্তির দিকে। পেছনে হিমালয়ের তুষার চূড়ায় হচ্ছে সূর্যোদয়।

মহর্ষির উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো ভারতের আদিম সবিতা মন্ত্র।

"উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্।"

পিতাকে অনুসরণ করে বালকও গেয়ে উঠলো,
"দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্…"

জগৎকে প্রকাশ করবার জন্যে উদিত হয়েছে সূর্য···সেদিন সেই বালকের মনেও সূর্য উদিত হয়েছিল, যে সূর্যে মানুষের মনের জগতের হয়েছে নব-প্রকাশ···তারই জ্যোতির্পদাঙ্ক রয়ে গিয়েছে আমাদের বাংলা ভাষায়··· ।

সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্সের আদি কাহিনী

এক

মহাত্মা গান্ধীর জন্মের কুড়ি বছর আগে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে একখানি ছোট বই প্রকাশিত হয়, বইখানির নাম হলো "Civil Disobedience" "সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স"। লেখকের নাম থোরো, হেনরী ডেভিড থোরো।

বইখানি এবং তার প্রতিপাদ্য বিষয়কে সেই সময়কার যুক্তরাষ্ট্রের শাসক-সম্প্রদায় এক উন্মাদ দার্শনিকের পাগলামির খেয়াল বলে গ্রহণ করে। প্রকাশের কয়েক বছরের মধ্যেই বইটির স্মৃতি সাধারণ পাঠকদের মন থেকেও বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেদিন সুদূরতম কল্পনাতেও কেউ ভাবতে পারতো না, সেই নব-গঠিত যুগ্ম-শব্দটি কি মারাত্মক সম্ভাবনা নিয়েই ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সাত-সমুদ্র-তেরো-নদীর পারে আমেরিকার কন্‌কর্ড শহরের ধারে এক নির্জন বনে যে ছোট্ট বীজটি সেদিন পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় এসে পড়েছিল, সেদিন কে জানতো যে জনান্ত দূরে এই ভারতের মাটিতে সেই বীজ থেকে জন্ম নেবে যদুবংশধ্বংসকারী লৌহ-চূর্ণ-জাত শরবনের মত বিরাট এক নবশক্তি জগতের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল পর্যন্ত যা কাঁপিয়ে তুলবে।

মহাত্মা গান্ধীর সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স আন্দোলন থেকে বহুদূরে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যুক্তরাষ্ট্রের এক দূরতম অঞ্চলে পড়ে আছে বিস্মৃত একটি মুহূর্ত······অর্ধ উন্মাদ বলে পরিগণিত একটি অবাস্তব অর্থাৎ আদর্শবাদী মানুষের এক দিনের একক প্রতিবাদ······রাষ্ট্রের প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে একটি অস্ত্রহীন মানুষের আত্মিক প্রতিবাদ······তুচ্ছ বলে মানুষ তাকে উপহাস করেছিল, কিন্তু মানুষের ভাগ্যবিধাতা তাঁর নিজস্ব টাইমটেবিল অনুসারে সেই একটি মানুষের এক দিনের প্রতিবাদকে

আর একটি বিচিত্র মানুষের মধ্যে দিয়ে পরিণত করলেন ইতিহাসের প্রচণ্ডতম এক ভূমিকম্পে······

আজ সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স কথাটা উপহাস বা রসিকতার বস্তু নয়, এটম্ বোমার মত একান্ত বাস্তব ও মারাত্মক······সংগ্রামী মানুষের হাতে প্রচণ্ডতম শক্তি।

দুই

কনকর্ড শহরের প্রান্তে বিরাট পাইন বন······সেই নির্জন বনের ভেতর পাইন গাছে ঘেরা একটা দীঘি······উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একদিন একটি লোক ঘুরতে ঘুরতে সেই দীঘির ধারে এসে থমকে দাঁড়ায় ······এইখানেই এই নির্জন পাইন বনে এই দীঘির ধারে তিনি গড়ে তুলবেন তাঁর বাস-ভবন······

নিজের হাতে তৈরী করেন একটা ছোট কাঠের ঘর·····কাছাকাছি খানিকটা জমি নিয়ে নিজের হাতে করেন চাষ। তাঁর বিশ্বাস, নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে যেটুকু কায়িক পরিশ্রম করা দরকার, তার বেশী কায়িক শ্রম করা মানে হলো জীবনকে নষ্ট করা······এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে মানুষকে দিনের অতি অল্প সময়ই নিয়োজিত করলে চলে যায়··· তার বাইরে সারাটা দিনের প্রকাণ্ড অবসরে মানুষ মনের আনন্দে পারে সৃজন করতে তার নিজস্ব আনন্দলোক।

সেই বনের নির্জনতায় ভদ্রলোক আপনার মনে প্রকৃতির নব-নব বিস্ময়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন, লিখতেন, মাঝে মধ্যে শহর থেকে যে দু'চারজন বন্ধু আসতেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় দিন কাটিয়ে দিতেন।

দৈবাৎ দু'একটা জিনিসের জন্যে ভদ্রলোককে শহরে যেতে হতো এবং দু'একটি জিনিসের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড় ছিল, সেটি হলো, জুতো মেরামত করানো। ভদ্রলোকের সাংসারিক বাজেটে জুতো জিনিসটা একটা প্রধান "আইটেম" ছিল, মেরামত করে করে একটা জুতোকেই তিনি

অক্ষয় অদ্বিতীয় করে রাখতে চাইতেন, এটা তাঁর বিশেষ অর্থনীতিরও একটা প্রকরণ ছিল। এই ভদ্রলোকটিরই নাম হলো হেনরী ডেভিড থোরো। যে জাতের মানুষ মহাত্মা গান্ধী, থোরো ছিলেন সেই জাতেরই তাঁর একজন পূর্বপুরুষ। একই গোত্র।

মহাত্মা গান্ধীর মতনই থোরোর ছিল রাষ্ট্র সম্বন্ধে, রাষ্ট্র আর ব্যক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা নিজস্ব ধারণা এবং সেই ধারণা পুঁথিগত বা ভাবগত ছিল না, সেই ধারণা অনুযায়ী থোরো নিজের প্রতিদিনের কাজকর্মকেও নিয়ন্ত্রিত করতেন।

থোরোর জীবন-নীতিতে রাজনীতির কোন স্থান ছিল না, অবিশ্বাসী যেমন দূর থেকে মন্দিরকে দেখে, থোরোও তেমনি রাষ্ট্র-চিন্তাকে অথবা রাষ্ট্রকে জীবনের পরিধির বাইরে রেখেই সম্মান দেখাতেন।

রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক দুটি বিশেষ জিনিসকে অবলম্বন করে থাকে, একটি হলো ভোট আর একটি হলো ট্যাক্‌স্। ভোট তিনি কোনদিনই দিতেন না। দ্বিতীয়টিকে তিনি নীরবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কিন্তু একটা সীমা পর্যন্ত। রাষ্ট্র যখন খুশী যে কোন ট্যাক্‌স্ ধার্য করবে, তখনি তাই দিতে তিনি বাধ্য, একথা তিনি মানতেন না। তাই প্রাদেশিক সরকার যখন গির্জার সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্যে মাথাপিছু প্রত্যেক নাগরিকের কর ধার্য করলো, থোরো প্রতিবাদ করলেন অর্থাৎ সেই পোল্-ট্যাক্‌স্ তিনি দিলেন না।

কর্তৃপক্ষও বিশেষ কোন হাঙ্গামা না করে, ব্যাপারটাকে চাপা দিয়েই চল্লেন। দু' বছর ধরে থোরো পোল্-ট্যাক্‌স্ দিলেন না। এমন সময় এলো মেক্সিকোর যুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে সারা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মাথা তুলে উঠলো আবার কালনাগিনীর মত ক্রীতদাস প্রথার কথা। মেক্সিকোর যুদ্ধ মানে ক্রীতদাস-প্রথাকে আরো কায়েমী করে দক্ষিণের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করা।

থোরো আর রাজনীতি থেকে সরে থাকতে পারলেন না। কারণ রাজনীতি অন্যায়ভাবে মানব-নীতির ওপর চেপে বসতে চাইছে। যে রাষ্ট্র মানুষ কেনা-বেচার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে চায়, প্রত্যেক মানুষের

উচিত সেই রাষ্ট্রকে অস্বীকার করা। থোরোর সমস্ত অন্তর উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। এই অন্যায়কারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রহীন বিদ্রোহে নাগরিকদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে তিনি একটা ছোট পুস্তিকা লিখলেন, তার নাম দিলেন Civil Disobedience. এই বইতে তাঁর উদ্ভাবিত অস্ত্রহীন নতুন বিদ্রোহের তত্ত্ব ও উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখলেন, "যে জাতি একদিন ঘোষণা করেছিল যে, সে হবে স্বাধীনতার ধাত্রী, সেই জাতির জনসংখ্যার ছ' ভাগের একভাগ লোক যদি ক্রীতদাস হয়ে থাকতে বাধ্য হয় এবং সমস্ত দেশকে যদি সামরিক আইনে জোর করে নিস্তব্ধ করে রাখবার চেষ্টা হয়, তা'হলে আমি বলবো, যাঁরা নিজেদের খাঁটি মানুষ বলে পরিচয় দিতে চান, তাঁদের আজ উচিত to rebel and revolutionize !"

সেই সঙ্গে তিনি লিখলেন, "এই রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্যে যদি কর দিতে হয়, সে কর দেওয়া মানে, একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করবার জন্য অর্থ-সাহায্য করা, এহেন ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকের উচিত কর দেওয়া বন্ধ করা।" গান্ধীজীর নো-ট্যাক্স্ আন্দোলনের বীজ।

এহেন উক্তিকে ক্ষমা করতে পারে, এমন কোন রাষ্ট্র আজও গঠিত হয়নি, যদিও এই সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স আন্দোলন অতি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই বই প্রকাশিত হওয়ার পর থোরোর পোল্-ট্যাক্স্ না-দেওয়ার ব্যাপারটা প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে লক্ষ্য না করা আর সম্ভব হলো না।

তিন

নির্জন পাইন-বনের বাসভবন থেকে একদিন থোরোকে শহরে যেতে হলো, সেই একই প্রয়োজন, জুতো মেরামত করা। ছেঁড়া জুতো নিয়ে মুচীর দোকানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই থোরো দেখলেন, পুলিশের লোকেরা তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। রাগে ক্ষেপে উঠলেন থোরো, সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্সের পেছনে তখনো জন্মায়নি সত্যাগ্রহ। পুলিশের

লোকেরা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে থানার ফাটকে আটক করলো। এবং তাঁর শাস্তি হলো একরাত্রি ফাটক বাস। সকালে যখন থোরোকে ছেড়ে দেওয়া হলো, তখন সেই থানার ফাটকের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে থোরো প্রায় মারতে ওঠেন···সেই কর্মচারী পরে বলেছিলেন, সকালবেলা যখন থোরোকে ছেড়ে দেওয়া হলো, তখন থোরো 'Was mad as the devil.'

সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্সের প্রথম প্রচারকের সেই এক রাত্রের শাস্তির মধ্যে ঐতিহাসিক গুরুত্বের বদলে দেখা যায় একটা রঙ্গমঞ্চগত প্রহসনের লক্ষণ। সেই মুহূর্তটি একান্ত তাচ্ছিল্য আর গ্রাম্য রসিকতার মধ্যে একরাত্রির ভেতরেই শেষ হয়ে যায়। ফাটকওয়ালা থোরোকে ফাটকের ভেতর পোরবার আগে, তাঁর পা থেকে খুলে নিলো, তাঁর তাপ্পিওয়ালা বুটজুতো জোড়াকে, হয়ত ভেবেছিল থোরোকে মানসিক কষ্ট দেবার সেইটেই প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। থোরোর আটক পড়ার খবর তাঁর মা যখন পেলেন, তিনি ভেবেই আকুল হলেন। পুত্রের পোল্‌-ট্যাক্‌স্‌ না দেবার সঙ্কল্পের কথা তিনি জানতেন, অথচ ট্যাক্‌স্‌ না দিলে ছেলে ছাড়া পাবে না। কেউ কেউ বলেন, তাঁর হাতে তখন ট্যাক্‌স্‌ মিটিয়ে দেবার মতন টাকাও ছিল না। সেইজন্যে তাঁদের এক আত্মীয়া ভোর না হতেই সর্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দিয়ে, মুখ লুকিয়ে থানায় গিয়ে ট্যাক্‌সের টাকাটা জমা দিয়ে আসেন। থোরোকে ধরে রাখবার আর কোন আইনসঙ্গত কারণ না থাকায় থানার কর্তা তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। তাঁর বুটজুতো তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

এইখানে একটি গল্পের সৃষ্টি হয়। ইমারসন ছিলেন থোরোর স্বল্প-সংখ্যক বন্ধুদের একজন। তিনি নাকি সকালবেলা অবরুদ্ধ বন্ধুকে দেখবার জন্যে থানায় আসেন। এসে দেখেন, বন্ধু সবে মাত্র মুক্ত হয়েছেন।

ইমারসন ব্যাপারটাকে থোরোর পাগলামির পরিণাম হিসেবেই দেখেছিলেন, তাই বন্ধুকে মৃদু ভর্ৎসনা করে তিনি বলেন, কি ব্যাপার হেনরী? তুমি ফাটকের ভেতর কেন? ক্রুদ্ধ হয়ে থোরো জবাব দিলেন, আমি উল্টে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, ফাটকের বাইরে তুমি কেন?

এই একরাত্রির কাটক-বাসকে, একমাত্র থোরো ছাড়া, সম্পৃক্ত কেউই বিশেষ কোন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু সেই একরাত্রির অভিজ্ঞতায় উত্তেজিত হয়ে থোরো সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যা পরে ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয়, সমসাময়িক তাচ্ছিল্যের ছাই-চাপা হয়ে তা পড়ে ছিল সামান্য কয়েক বৎসর। তারপর একদিন সেই ছাই-চাপা ছোট্ট একটা আগুনের কণা আর এক যুগে, আর এক দেশে, এমনি এক পাগলের মনে জ্বালিয়ে তুললো বিরাট এক দাবানল, যে দাবানলে পরিবর্তিত হয়ে গেল পৃথিবীর মানচিত্রের এবং মানস-চিত্রের একটা প্রধান অংশ। মহাত্মা গান্ধী যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা নতুন রণনীতির সন্ধান করছিলেন, তখন দু'জন বিদেশীর কাছ থেকে তিনি তাঁর দুটি প্রধান অস্ত্রের সন্ধান পান, একটি হলো টলস্টয়ের প্যাসিভ্ রেসিস্টেন্স আর দ্বিতীয়টি হলো থোরোর সিভিল ডিস্-ওবিডিয়েন্স। দু'টি অস্ত্রকেই তিনি তাঁর অসাধারণ মন ও মস্তিষ্কের কারখানায় নূতন ছাঁচে ঢালাই করে সম্পূর্ণ ভারতীয় করে তোলেন। নিদারুণ সন্দেহ ও মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে একদিন তিনি থোরোর সেই সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স লেখার ভেতর সত্যিকারের অনুপ্রেরণার সন্ধান পান। থোরোর সেই রচনার ভেতর ব্যক্তির মর্যাদার যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিল, বিশ্বের রাজনৈতিক সাহিত্যের ইতিহাসে, তার গুটিকতক লাইন অমর হয়ে আছে……।

"I was not born to be forced···I will breathe after my own fashion. If a plant cannot live according to its nature, it dies and so dies a man···"

এই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গটুকু অপেক্ষা করেছিল একজন গান্ধীর জন্যে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মরে না। ছাই-চাপা পড়ে থাকে মাত্র। মহাত্মা গান্ধী খুব বেশী বই পড়েন নি। যে-কখানা বই তিনি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে ছিল থোরোর রচনা-সংগ্রহ।

মাত্র দুটি বুলেট

এক

আজ থেকে ঠিক আটত্রিশ বছর আগে। অস্ট্রিয়ার থেয়ারস্টিনস্টাড দুর্গের সংলগ্ন একটা ছোট হাসপাতাল……অসুস্থ বন্দীদের জন্যেই সেই হাসপাতাল। একটা ছোট ঘরে লোহার খাটের ওপর শুয়ে আছে এক কঙ্কাল মূর্তি।

পরিপূর্ণ কঙ্কাল, শুধু খড়ির মত শাদা একটা চামড়া দিয়ে ঢাকা। কঙ্কালের মতই নিশ্চল, স্থির, নির্বাক। গর্তের ভেতর ঢুকে গিয়েছে দুটো চোখ। নিশ্চল দেহের মধ্যে শুধু সেই দুটো চোখে তখনো জ্বলছে ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ প্রাণের উত্তাপ। কিন্তু সে চোখ নড়ে না, চড়ে না, সোজা চেয়ে থাকে সামনে মাথার ওপরে কড়িকাঠের দিকে। চব্বিশ ঘণ্টা তেমনি চেয়ে থাকে। পাথরের চোখের মতই ঘুমে তা বুঁজে আসে না।

চেহারা দেখে অনুমান করা যায় না শয্যাশায়ীর বয়স কত। কঙ্কালের মতই সে চলে গিয়েছে ঋতু-চক্রের বাইরে।

নির্দিষ্ট সময়ে নার্স এসে নল দিয়ে খানিকটা জলীয় খাদ্য দেহের ভেতর ঢেলে দিয়ে যায়। নিয়মমত নার্স প্রশ্ন করে। কঙ্কাল কোন উত্তরই দেয় না। হয়ত কোন কথাই সে শুনতে পায় না।

কাজ সেরে নার্স চলে যায়। কঙ্কাল-মূর্তি আবার চেয়ে থাকে কড়িকাঠের দিকে। জেগে স্বপ্ন দেখে। অবিরাম অবিচ্ছেদ স্বপ্ন।

ডাক্তারেরা কৌতূহলী হয়ে বহুবার বহু প্রশ্ন করেছে। কি ভাবে সে? কি দেখে সে?

দু'একবার সে উত্তর দিয়েছে। একই উত্তর। সব প্রশ্নের উত্তরে শুধু সে একটা কথাই বলেছে, স্বপ্ন। চব্বিশ ঘণ্টা চোখ চেয়ে জীবিত কঙ্কাল শুধু স্বপ্ন দেখে।

কি সে স্বপ্ন। তার কোন জবাব সে দেয় না, দিতে পারে না।

সেই অবস্থায় কয়েক মাস শুয়ে থাকার পর একদিন নার্স নিয়মিত খাদ্য দিতে এসে দেখে, কঙ্কাল ঘুমিয়ে পড়েছে। মৃত্যু এসে দয়া করে চব্বিশ ঘণ্টা চেয়ে থাকা চোখকে বুঁজিয়ে দিয়েছে।

মৃত্যু ছাড়া তাকে এ দয়া আর কেউ করতো না।

আজ চল্লিশ বছর ধরে সারা পৃথিবী যে অবিচ্ছেদ ভূমিকম্পে কাঁপছে, ভেঙে ধ্বসে পড়ছে যার ধাক্কায় সিংহাসন, রাজ্য, প্রাসাদ······জ্বলে-পুড়ে শ্মশান হয়ে যাচ্ছে শহর-গ্রাম-প্রান্তর, মাটি ফেটে বইছে রক্তের নদী, সে রক্তের নদীতে ভেসে চলেছে অকালে লক্ষ লক্ষ লোক, যারা ভাগ্যক্রমে বেঁচে থাকছে, বেঁচে থাকার অভিশপ্ত বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছে তাদের মেরুদণ্ড, হিংসায় প্রমত্ত পৃথিবীর এই আত্মঘাতী অভিযানের শুরু হয় সেই একান্ত অপ্রয়োজনীয় অপদার্থ নর-কঙ্কালের এক উন্মাদ মুহূর্তের ধাক্কায়···সেই অতি নগণ্য একটি লোকের নিক্ষিপ্ত দুটি বুলেট পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বিভীষিকাময় দাবানলের সৃষ্টি করে। তারই হাতের নিক্ষিপ্ত বুলেট নিয়ে আসে সভ্য মানুষের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যার নাম।

কঙ্কালে পরিণত হবার আগে, এই যুবক একটি চলমান মোটরগাড়িতে দু'বার দুটি বুলেট ছোঁড়ে······তার ফলে রাশিয়ার তুহিন-প্রান্তর থেকে আফ্রিকার ঘন জঙ্গল পর্যন্ত সপ্ত-সাগর বেষ্টিত এই সমগ্র ধরণী এক বিচিত্র বীভৎস অনির্বাণ হিংসা আর হত্যার আগুনে জ্বলে ওঠে। সে আগুন আজও জ্বলছে।

দুই

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে য়ুরোপের বেল্‌গ্রেড শহরে হোটেল বল্‌কান নামে একটা নামজাদা হোটেল ছিল। বাইরে থেকে যারা আসতো, তারা এই হোটেলেই এসে উঠতো। এই হোটেলের আশেপাশে চারিদিকে ছিল সরু সরু সব গলি। সেই সব গলির ভেতর ছোট ছোট

বিস্তর কফি-ঘর ছিল। একতলার আধ-অন্ধকার আধ-আলো যে কোন কফি-ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়তো, ছোট ছোট গোল কাঠের টেবিল ঘিরে অতি তরুণ সব ছাত্রের দল কফির কাপ নিয়ে জটলা করছে। দুনিয়ার যত সমস্যা, তাই নিয়ে চলেছে তর্ক, আলোচনা, বচসা। এই সব কফি-ঘরের একটা বিশেষত্ব ছিল, কফি-ঘরের মালিকেরা তাদের দোকানের নামকরণ নিয়ে রীতিমত পাল্লা দিতো, শ্লাভ অক্ষরে সার্বিয়ান ভাষায় প্রত্যেক কফি-ঘরের দরজার ওপরে বড় বড় টাইপে দোকানের নাম সাইনবোর্ডে লেখা থাকতো, নামগুলোর মধ্যে দোকানের মালিকের কবিত্বের নির্ভুল পরিচয় ফুটে থাকতো, অতি নিরীহ কবিত্বপূর্ণ সব নাম, অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, তাজা ফুলের মালা, কাঁচের টবে রঙিন মাছ, শিশির ভেজা সবুজ ঘাস, বসন্তদিনের প্রথম ফুল ইত্যাদি। হয়ত সেই নামের বিচিত্রতায় আকৃষ্ট হয়ে সেই সব কফি-ঘরে যারা নিয়মিত কফি খেতে আসতো, তারা ছিল অধিকাংশই ছাত্র, স্কুল ও কলেজের ছাত্র, একেবারে কাঁচা কিশোরের দল। তাদের চেহারা এবং পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলেই বোঝা যায়, তারা সেই বয়স থেকেই বোহেমিয়ান হবার সাধনা শুরু করেছে। এলোমেলো পোশাক, এলোমেলো চুল, এলোমেলো কথাবার্তা। পাকবার আগেই যে ফল শুকিয়ে যায়, তাদের প্রত্যেকের মুখে সেই অকালে শুকিয়ে যাওয়ার চিহ্ন···শুকনো মুখের দিকে চাইলেই চোখে পড়ে ক্ষুধিত মানুষের চোখের মতন দুটো করে অস্বাভাবিক চোখ। বিংশ শতাব্দীর বিত্তহীন মধ্যবিত্ত ঘরের নতুন জাতের তরুণের দল। বিপ্লবপন্থী রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের যজ্ঞের সমিধ। আমাদের দেশের মতন, সে সময় য়ুরোপের বহু দেশেও রাজনীতির একটা বিশেষ যুগ আসে, তাকে চল্‌তি ভাষায় বলা যেতে পারে, রাজনৈতিক দাদাদের যুগ। দাদা থাকলেই ভাই থাকা দরকার। কফিখানার সেই বোহেমিয়ান তরুণ ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক দাদারা ভাই খুঁজতে আসতেন। সে যুগের রাজনৈতিক দাদারা ছিলেন একজাতের ছেলেধরার দল। কোন ছেলে যে উপযুক্ত ভাই হতে পারবে, তা তাঁরা পরখ করে দেখতেন। যে ছেলে যত রোমান্টিক, যত আদর্শবাদী, যত ঘরছাড়া, সে ছেলে ভাই

হবার তত উপযুক্ত। তাই এই সব কফির আড্ডায় বিপ্লবী দাদারাও গোপনে আসা-যাওয়া করতেন, কাণ খাড়া করে শুনতেন, কোন্ টেবিলে কোন্ ছেলে কি-জাতের পাগলামী করছে।

তখন বল্‌কান রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে বহু ছোট ছোট স্টেটে ভেঙে পড়েছে এবং যত ভেঙেছে তত দুর্বল হয়েছে। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অস্ট্রিয়া তখন এই সব খণ্ড-খণ্ড বিভক্ত স্টেটগুলোর ওপর আধিপত্য করে চলেছে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী এই সব স্টেটগুলোকে কাদার তালের মত চটকে জ্বালানি ঘুঁটেরূপে ব্যবহার করবার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। বেল্‌গ্রেড শহরের কফির আড্ডায় এই সব পরাধীন স্টেট থেকে তরুণ ছাত্রের দল জমায়েত হতো, তাদের সমস্ত কথার ভেতর থেকে একটা কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠতো, যা কিছু অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর তাই খারাপ এবং রোমান্টিক তারুণ্যের স্বভাব-ধর্ম অনুযায়ী, তারা যা কিছু ভাবতো, তা চিৎকার করেই ভাবতো এবং চিৎকার-করে-ভাববার পক্ষে এই কফিখানাগুলো অধিকতর নিরাপদ স্থান ছিল। এই কফিখানার আড্ডায় এক তরুণ-বন্ধুর সঙ্গে গ্যাব্রিলো প্রিন্‌সেপ বলে সতরো বছরের একটি ছেলে একদিন এসে উপস্থিত হয়। বেল্‌গ্রেডে সে পড়তে এসেছিল। কিন্তু কলেজের চেয়ে এই কফির আড্ডাই তাকে বেশী করে আকর্ষণ করলো।

বোস্‌নিয়ার পাহাড়ের কোলে নগণ্য এক গাঁয়ে যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে, সেদিন তার দেশ স্বাধীন ছিল। কিন্তু বড় হয়ে যেদিন সে হাঁটতে শিখলো সেদিন সে শুনলো, তার দেশ অস্ট্রিয়া দখল করে নিয়েছে। স্কুলে পড়তে গিয়ে দেখে, স্কুলের দরজায় দাঁড়িয়ে অস্ট্রিয়ার পুলিশ। প্রায়ই সেই সব পুলিশের লোক স্কুলের ভেতর এসে ছাত্রদের খাতাপত্র, বই খুঁজে দেখে, ছেলেদের নানান রকমের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। ভয়ে তাদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। তাদের চোখের সামনে দেখে, হাতে হাতকড়া পরিয়ে কোন কোন মাস্টারকে ধরে নিয়ে যায়। পরিবর্তে নতুন মাস্টার আসে, তারা ছাত্রদের বোঝাতে চেষ্টা করে, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী হলো তাদের সকলের মা…ধাত্রী…

মাঝে মাঝে হঠাৎ স্কুলের দেয়ালে লাল-কালিতে বড় বড় অক্ষরে কারা লিখে রাখে, অস্ট্রিয়া নিপাত যাক। প্রিন্‌সেপ কৌতূহলী হয়ে ওঠে। ক্রমশ সে নতুনতর রহস্যের সন্ধান পায়। হাতে-লেখা খবরের কাগজ। স্কুলের ছুটির পর তারা কয়েকজন মিলে বনের ভেতর গিয়ে সেই হাতে-লেখা কাগজ পড়ে। সেই হাতে-লেখা কাগজ থেকে জানতে পারে, দূর সুইজারল্যাণ্ডে একদল লোক মৃত্যুকে তুচ্ছ করে, পুলিশের চোখ এড়িয়ে, উপবাসে অর্ধাসনে, জগতের সমস্ত নির্যাতিত দেশের মুক্তির জন্যে এক মহা-আয়োজন করছে। তারা এই জগৎ থেকে দারিদ্র্য দূর করবে, মানুষে মানুষে অন্যায় ভেদকে লুপ্ত করবে, প্রতিষ্ঠা করবে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য, যেখানে সব মানুষ পাবে সমান অধিকার।

কিশোর প্রিন্‌সেপের চোখের সামনে দৃষ্টির অগোচর নামহীন পরিচয়হীন জগৎ-কল্যাণকামী সেই সব লোক দেবতার মতন জেগে ওঠে। সাম্যবাদ, কম্যুনিজম, জাতীয়তাবাদ, তাদের পার্থক্য কোথায়, তাদের চরিত্রই বা কি, তা সে জানে না, জানবার মত শিক্ষাও তার নেই…নির্যাতিত মানুষের মুক্তি, সেই আদর্শের মধ্যে তার রোমান্টিক তরুণ মন যেন পৃথিবীর দুঃখ-হরণ মন্ত্রের সন্ধান পায়। স্কুলের পাঠ্য-পুস্তক আর ভাল লাগে না, তার দিবাস্বপ্নে সে নিজেকে জগতের মুক্তি-দাতাদের একজন হিসাবে দেখে। চারদিকে কান পেতে থাকে। ক্রমশ তার কানে আসে শুভ সংবাদ…তার নিজের দেশেই গোপনে সেই মুক্তি-দাতাদের সঙ্ঘ গড়ে উঠছে। তারা নিজেদের Comidatji অর্থাৎ কমরেড বলে ডাকে। প্রিন্‌সেপ ঠিক করে, যেমন করে হোক, Comidatjiদের একজন হতে হবে।

তিন

তখন টেররিস্ট আন্দোলনের যুগ। সার্বিয়ার সৈন্য বিভাগের দু'জন বড় অফিসার, মেজর Voja Tankositch আর কর্নেল Dvagutin Dimitrijevitch, অস্ট্রিয়ার রাজ-সরকারের বেতনভোগী, সরকারী

কাজের আড়ালে গোপনে গড়ে তুলছিলেন টেররিস্ট দল, বল্‌কান অঞ্চল থেকে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করবার জন্যে। মেজর ভোয়ার কর্ম-তালিকার প্রথম ও প্রধান বিষয় ছিল, বিদেশী অর্থাৎ অস্ট্রিয়ান কর্মচারীদের একে একে সরিয়ে ফেলা, অর্থাৎ হত্যা করা। সেই উদ্দেশ্যে তিনি সারা দেশের মধ্যে সুনিপুণ গোপনতার-জাল ফেলেছিলেন, ছেলে ধরবার জন্যে, যে সব ছেলে তারুণ্যের অন্ধ আদর্শবাদিতায় উন্মাদের মত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। টেররিস্ট নেতারা অভিজ্ঞ শিকারীর মত এই জাতের ছেলেদের ঠিক খুঁজে বার করতো, তারপর কিছুকাল সেন্টিমেন্টে দম দিয়ে হাতে রিভলবার দিয়ে ছেড়ে দিতো···তাদের শেখানো হতো, হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও হত্যা করতে হবে···মারতে সে-ই পারে, যে নিজে মরতে পারে।

প্রিন্‌সেপ কালক্রমে স্বয়ং মেজর ভোয়ার হাতে এসে পড়লো। মেজর বুঝলেন, উপযুক্ত সাধক। তিনি একটা চিঠি দিয়ে প্রিনসেপকে বেল্‌গ্রেডে সরকারী শিক্ষা বিভাগে পাঠিয়ে দিলেন, দুঃস্থ ছাত্র কিন্তু মেধাবী, উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হলে তিনি সুখী হবেন।

প্রিনসেপ বিনা বেতনে বেল্‌গ্রেডের এক কলেজে ভর্তি হয়ে গেল। সেখান থেকে কফির আড্ডা···পৌঁছতে দেরি হলো না।

যে সব তরুণদের ভবিষ্যৎ হত্যাকারীরূপে তালিম দেওয়া হতো, তাদের এই কফির আড্ডায় মেজর ভোয়ার গুপ্তচরেরা লক্ষ্য করতো। দলের অন্তরঙ্গতা থেকে তাদের দূরে রাখা হতো কিন্তু এই দূরত্ব এমন করে বজায় রাখতে হতো, যাতে কৌতূহল না নষ্ট হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারতো একটা অদৃশ্য হাত তাদের চালিয়ে নিয়ে চলেছে—কিন্তু সে হাতের মালিককে তারা দেখতে পেতো না।

এই সব টেররিস্ট দলের চাকার ভেতরে চাকার মতন, দলের ভেতর দল থাকতো। মেজর ভোয়ার প্রধান দলের ভেতর আর একটা অন্তরঙ্গ দল ছিল, তার নাম হলো, Union of Deaths, মৃত্যু-মিলন। এই দলের সভ্যদের বলা হতো, Black Hands, কালো-হাত। কালো-হাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নাম লুপ্ত হয়ে যেতো, তখন তাদের

নাম সংখ্যায় পরিণত হতো। মেজর ভোয়া নিজে এই দলের সভ্য ছিলেন এবং দলের ভেতর তাঁর পরিচয় ছিল ৬ নম্বর। কালো-হাতদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা নিজের হাতে হত্যা করে হাত কালো করতো না।

চার

অস্ট্রিয়ান একজন গভর্নরকে খুন করবার জন্যে প্রিনসেপের দলের একজন বন্ধু নিযুক্ত হয়। কিন্তু চারবার গুলী করার পর যখন গভর্নর অক্ষত রয়ে গেল, তখন প্রিনসেপের বন্ধুটি দলের নিয়ম অনুযায়ী শেষ গুলীটা নিজের প্রতিই লক্ষ্য করে এবং সে লক্ষ্য অভ্রান্তই হয়। শহরের বাইরে এক পরিত্যক্ত গোরস্থানে বিপ্লবীরা গোপনে মৃত বন্ধুর কবর দেয় এবং সেই কবর তাদের গোপন-তীর্থ হয়ে ওঠে। যখনি কোন মারাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার দরকার হতো, তখনই তারা এই কবরে এসে মিলিত হতো। ১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে এক নিশীথ রাত্রে সেই পরিত্যক্ত গোরস্থানে প্রিনসেপ আর তার বন্ধুরা সমবেত হয়েছে, বিশেষ প্রয়োজনীয় এক সিদ্ধান্তের জন্যে। এবার কে হবে লক্ষ্য? সকলেই একমত হলো, এবার লক্ষ্য হবে আর্চডিউক ফার্ডিন্যাণ্ড। অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী!

কিন্তু এ সিদ্ধান্ত হলো তাদের ব্যক্তিগত। দলের নয়। প্রিনসেপ এতদিন দলে আছে, কিন্তু আজও পর্যন্ত কোন "কাজ" পায়নি। কাজ করবার জন্যে সে উদ্‌গ্রীব!

প্রিনসেপ জানতো না, তার প্রত্যেক কথা, তার প্রত্যেক ভঙ্গী লক্ষ্য করা হচ্ছে। হঠাৎ একদিন প্রিনসেপ খামে করে একটা চিঠি পেলো। খাম খুলে দেখে, খবরের কাগজের একটা কাটিং, তাতে একটা সংবাদ—আর্চডিউক ফার্ডিন্যাণ্ড ২৩শে জুন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর সঙ্গে সেরাজে-ভোতে সৈন্য পরিদর্শন উৎসবে যোগদান করতে আসছেন। সেই সংবাদটুকুর সঙ্গে একটা শ্লিপ আঁটা, একটা ঠিকানা।

প্রিনসেপ খাম হাতে করে সেই ঠিকানায় গিয়ে উপস্থিত হলো। দেখে তার পূর্ব পরিচিত এক বন্ধুই তার অপেক্ষা করে আছে।

বন্ধু হেসে বলে, এবার তুমি কাজ পাবে। চলো!

দুজনে উপস্থিত হয় মেজর ভোয়ার সামনে। যথারীতি শপথ-গ্রহণের পর, মেজর ভোয়া তাদের হাতে দিলেন দুটো ব্রাউনিঙ পিস্টল আর পোটাসিয়াম-সাইনাডের ছোট ছোট কতকগুলো এ্যাম্‌পুল।

রাত্রির অন্ধকারে তারা দু'জনে গিয়ে উঠলো সেরাজেভোর ট্রেনে।

পাঁচ

২৩শে জুন সকালবেলা ফার্ডিন্যাণ্ড প্রিয়তমা পত্নী ডাচেস অফ হোহেন-বার্গকে সঙ্গে নিয়ে বিরাট এক মোটরে সেরাজেভোর পথে এগিয়ে চলেছেন।

কিছুদূর যেতে না যেতেই মোটরের কল বিগড়ে গেল। অত্যন্ত দামী মোটর, বিশেষভাবে তৈরী। আর্চডিউক বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু সেদিন যন্ত্র আর কিছুতেই ঠিক হলো না।

বাধ্য হয়ে ফাডিণ্যাণ্ড ট্রেনে উঠলেন। হঠাৎ মাঝপথে রাত্রিবেলায় ট্রেনের আলো সব নিভে গেল।

ফাডিন্যাণ্ড বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন, ভাল আপদ দেখছি! এবার যদি কোন বিপত্তি হয়, তাহলে ফিরে যাবো, সেরাজেভোতে আর যাচ্ছি না!

কিন্তু পথে আর কোন বিপত্তি হলো না।

যথারীতি ফার্ডিন্যাণ্ড সৈন্য পরিদর্শন করলেন।

পরের দিন সকালবেলা ডাচেসকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাজার করতে বেরুলেন, উপহার দেবার মত কিছু জিনিসপত্র কেনবার জন্যে।

জিনিসপত্র কিনে গাড়িতে উঠবেন, দেখেন, কিছুদূরে নোংরা পোশাকে একটা হ্যাংলামতন ছেলে একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছে। সেদিন প্রিনসেপের পকেটে পিস্টল ছিল না। সে ভাবেনি এমনভাবে হঠাৎ তার শিকারের সন্ধান পেয়ে যাবে।

রবিবার সকালবেলা। ফার্ডিন্যাণ্ড শোভাযাত্রা করে বেরিয়েছেন। শহরের পথ ঘুরে টাউনহলে আসবেন, অভিনন্দন নেবার জন্যে।

কুমুরিয়া ব্রীজের কাছে আসতে চারদিক থেকে জনতা পুলিশ কর্ডন ভেঙে মোটরের পথরোধ করে দাঁড়ালো। বাধ্য হয়ে মোটরের গতি শ্লথ করতে হলো।

একটা বোমা এসে পড়লো। কিন্তু গাড়ীতে লেগে বাইরে পড়ে গেল।

ফার্ডিন্যাণ্ড টাউনহলে পৌঁছলেন। অভিনন্দিত হবার পর ফিরলেন। ভিড়ের চাপে শফার মোটরের গতি শ্লথ করে। প্রিনসেপ এক লাফে ফুটবোর্ডের ওপর লাফিয়ে ওঠে। এক মুহূর্তের মধ্যে পকেট থেকে রিভলভার বার করে উপরি-উপরি দু'বার ছোঁড়ে। ফার্ডিন্যাণ্ডের গলা ফুঁড়ে গুলী বেরিয়ে গেল।

প্রিনসেপ তাড়াতাড়ি পোটাসিয়াম-সাইনাডের এ্যাম্‌পুলটা মুখে পুরতে যায় কিন্তু একজন সৈনিকের ধাক্কায় এ্যাম্‌পুলটা পড়ে গেল। প্রিনসেপের আর মরা হলো না···

সেই দুটি বুলেট ফার্ডিন্যাণ্ডের দেহকে ভেদ করে গিয়ে লাগলো য়ুরোপের বারুদখানায়।

দেখতে দেখতে য়ুরোপের প্রত্যেক রাজধানীতে বেজে উঠলো রণ-দামামা···প্রলয়ের বজ্রনাদ।

য়ুরোপ এবং সেই সঙ্গে সারা পৃথিবী জ্বলতে শুরু করলো···

থেয়ারষ্টিনস্টাড্‌ দুর্গের হাসপাতালে শুয়ে নর-কঙ্কালরূপী প্রিনসেপ তখন স্বপ্ন দেখছে···।

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত

এক

অবিস্মরণীয় মুহূর্ত···কিন্তু সেই-মুহূর্তের চিহ্ন কোথাও নেই। অথচ মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা। শুধু এক মহানিঃশব্দ জীবন-সাধকের স্মৃতিকথায় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত পড়ে গুটিকতক কথা, সেই বিস্মৃত বিলুপ্ত অবিস্মরণীয় মুহূর্তের একমাত্র স্মরণ-চিহ্ন। মাত্র দেয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট ফাটল, সেই ফাটলের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে···এই বাংলার এক তরুণ কিশোরের অমর ক্ষণ-অস্তিত্বের এক অপূর্ব অধ্যায়।

যে মহানিঃশব্দ জীবন-সাধকের স্বল্পাক্ষর স্মৃতিকথা থেকে এই মুহূর্তের সন্ধান পেয়েছি, তাঁর নাম চারুচন্দ্র দত্ত। বিগত যুগের বাংলার এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব···নিদ্রিত বাংলায় সিভিলিয়ান লৌহশাসনের যুগে সিভিলিয়ান বিপ্লব-নেতা···স্বদেশী যুগের অন্তরঙ্গ বিপ্লব-অধিনায়কদের প্রধানতম একজন·· বিপ্লব-গুরু শ্রীঅরবিন্দের বন্ধু, মিতা, কর্মসহচর··· পকেটে বোমা আর পাশে প্রফুল্ল চাকীকে নিয়ে লাট-নিধনে যাঁকে ঘুরতে হয়েছে···শ্রীঅরবিন্দের প্রতিনিধিরূপে যাঁকে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র আর নর্মদার তীরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের আরব্ধ গোপন ভবানী-মন্দিরের কাজ তদারক করবার জন্যে···জীবনের আর এক প্রান্তে এসে যিনি সেই কর্ম-সহচর বন্ধু শ্রীঅরবিন্দকে জীবনের পরম-ইষ্ট, গুরুবর বলে নিঃশেষে করেন আত্মসমর্পণ···রচনা করেন মানবীয় সম্পর্কের এক মধুরতর পুরাণ, নিজের মধু-ক্ষরা জীবনের প্রতিটি নিঃশব্দ মুহূর্ত দিয়ে। তাঁর স্বল্পাক্ষর স্মৃতিকথার ভেতরে যেন দিবালগ্নে অকস্মাৎ দেখতে পেলাম, শত শত শতাব্দী আগের ভারতের দুটি অপরূপ আবির্ভাব; শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন···বাংলা ভাষায় শুনতে পেলাম আবার অর্জুনের কণ্ঠে সেই মধুর আত্ম-নিবেদন—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তম্
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥

দুঃখের বিষয়, আজকের বাঙলী তার একান্ত আপনার জনদের ভুলে যাচ্ছে। তাঁদের জানবার, বোঝবার চেষ্টা ও প্রবৃত্তিরও অভাব ঘটছে। যাঁদের নিয়ে আমরা কোলাহল করি, তাঁদের দলে চারু দত্ত নেই। তাতে চারু দত্তের কোন ক্ষতি নেই, ক্ষতি আমাদেরই···এবং এ ক্ষতি সর্বনাশা, মারাত্মক।

কিন্তু আজকে আমি যে-মুহূর্তের কাহিনী বলতে চলেছি, সে তাঁর জীবনের কাহিনী নয়···তিনি জানতেন এমন একজনের কাহিনী··· বাংলার অপরূপ এক কিশোর কুমারের কাহিনী···ক্ষুদিরাম তার নাম।

এবং চারু দত্তকে যাঁরা জানেন, তাঁরা বিশেষভাবেই জানেন, তাঁর সাক্ষ্য অভ্রান্ত। কিন্তু এত অল্প কথায় এই মুহূর্তটির রেখাচিত্র তিনি এঁকে গিয়েছেন যে, বর্তমান লেখককে বাধ্য হয়ে সত্যানুসারিণী কল্পনার কিছু কিছু সাহায্য নিতে হয়েছে। দত্ত মহাশয় স্বল্পপরিচিত ক্ষুদিরামের জীবনের এমন গোটা কতক দিনের সংবাদ জানিয়েছেন, যার চিহ্ন কোথাও আর নেই। অথচ সেই গোটাকতক দিনের পরিচয়ের মধ্যে আছে ক্ষুদিরামের আসল পরিচয়।

দুই

মজফ্ফরপুরের দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্ল চাকী আর ক্ষুদিরাম বনের ভেতর দিয়ে দু'জনে দু'দিকে ছুটে চল্লেন। তাঁরা তখন জানতেন, তাঁদের ওপর ন্যস্ত কর্তব্য যথাযোগ্যভাবে তাঁরা পালন করেছেন···তাঁদের বোমায় কিংস্‌ফোর্ড মারা পড়েছেন। প্রফুল্ল যান বাঁকিপুরের দিকে, ক্ষুদিরাম ধরেন সমস্তিপুরের রাস্তা। রাস্তা নয়, ভয়াবহ জঙ্গলের পথ।

পঁচিশ মাইল একাদিক্রমে কখনো ছুটে, কখনো জোরে হেঁটে ক্ষুদিরাম যখন সকালবেলার দিকে ওয়ার্নি স্টেশনের কাছে এসে পড়লেন, তখন তাঁর আর দাঁড়াবার শক্তি নেই···তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।

স্টেশনের কাছাকাছি একটা মুদীর দোকান চোখে পড়তেই ক্ষুদিরাম দোকানের ভেতর ঢুকে পড়লেন। সামনেই বেঞ্চির মতন বসবার জায়গা। তার একটাতেই বসে পড়লেন। এত ক্লান্ত যে, জল খাবেন সে কথা মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না।

হঠাৎ কানে এলো অন্য বেঞ্চির ওপর দু'চার জন খদ্দের জমায়েত হয়ে আড্ডা দিচ্ছে। মজফ্‌ফরপুরের কথা নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। হত্যাকারীর আগে হত্যার সংবাদ এসে পৌঁছিয়েছে···ক্ষুদিরামের কানে এলো একজন বলছে, আরে মুসিবৎ, ক্লিন্‌স্‌ফোর্ট তো নেহি মরা।

ক্ষুদিরাম আপনার অজ্ঞাতে বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়ালেন। দোকানের আর এক পাশ দিয়ে নিঃশব্দে দুটি লোক প্রবেশ করলো, ক্ষুদিরাম তাদের দেখতেই পেলেন না। কিন্তু তারা ঘরে ঢুকেই ওয়ার্নি স্টেশনের ধারে মুদীর দোকানে সেই অদ্ভুত চেহারা বাঙালী ছেলেকে দেখেই থমকে দাঁড়ালো।

আড্ডাধারী বলে, বেহুদা দো মেম্‌ সাব্‌ খুন্‌ হো গেয়ি।

ক্ষুদিরামের শুষ্ক গলার ভেতর দিয়ে একটা চাপা-ফাটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। সকলেই তাঁর দিকে ফিরে চায়।

ক্ষুদিরাম হাতজোড় করে বলেন, বড় তেষ্টা পেয়েছে ভাই, এক গেলাস জল······

মুদী তাড়াতাড়ি করে একলোটা জল নিয়ে আসে। ক্ষুদিরাম হাতেব আঁচলা পাতেন। জল লোটা থেকে হাতে পড়ে, কিন্তু মুখে ওঠে না। আগন্তুক দু'জন দু'দিক থেকে ক্ষুদিরামকে অকস্মাৎ জাপটে ধরে। ছাড়িয়ে নেবার জন্যে ক্ষুদিরাম প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ফলে কোমর থেকে সশব্দে রিভলবারটা মাটিতে পড়ে গেল। একটা ছোট রিভলবার তখনো জামার পকেটে ছিল। নিরুপায় বুঝে ক্ষুদিরাম কোন রকমে একটা হাত পকেটের ভেতর ঢুকিয়ে রিভলবারটা বার করবার চেষ্টা

করলেন, কিন্তু ছদ্মবেশী পুলিশের লোক তাঁর অভিসন্ধি বুঝতে পেরে হাত চেপে ধরলো। ক্ষুদিরামকে মাটিতে ফেলে পিছমোড়া করে তাঁর হাত বেঁধে ফেলা হলো। সেই অবস্থায় তাঁকে মজফ্‌ফরপুরে নিয়ে এসে বন্দী করা হলো।

তিন

তারপর, কলকাতায় মুরারীপুকুর লেনের বাগানে বারীন্দ্রকুমার ও তাঁর বিপ্লব-সহচরদের গ্রেপ্তার, আলীপুরে বোমার মামলা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, এ সব কাহিনীর সঙ্গে প্রত্যেক বাঙালীই পরিচিত। পুলিশের হাতে বন্দী হবার পর, লোকচক্ষুর অন্তরালে কারাগারের ভেতর ক্ষুদিরামের জীবনের সেই কয়েকটি দিনের কথা, যা আজও পর্যন্ত অপ্রকাশিতই আছে, আজকের বাংলার তরুণ-তরুণীদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

ক্ষুদিরামকে জীবিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করতে পারায় পুলিশের খুশির অন্ত ছিল না। একটা প্রচণ্ড বিপ্লব-আন্দোলন বাংলার মাটিতে শেকড় গেড়ে বসেছে, সে সম্বন্ধে পুলিশের কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু এই বিপ্লব কতখানি ব্যাপক হয়েছে, কোথায় কতদূর ছড়িয়ে পড়েছে, কারা পৃষ্ঠপোষকরূপে এর পেছনে আছে, পুলিশের কর্তারা তখনো পর্যন্ত তার বিশেষ কোন সঠিক খবর সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি। তাই ক্ষুদিরামকে জীবন্ত ধরতে পেরে, তাঁর কাছ থেকে সেই সব গোপন সংবাদ আদায় করবার জন্যে পুলিশের কর্তারা উঠে-পড়ে লাগলেন।

মজফ্‌ফরপুরের ফাঁড়িতে প্রথম ক'দিন ক্ষুদিরামকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণার মধ্যে থাকতে হয়। কিন্তু তার ভেতর ক্ষুদিরামের মুখ থেকে একটাও গোপন কথা বার করা গেল না। কোন অনুশোচনা, আক্ষেপ বা কিছুই নয়। পুলিশের কাছে তিনি যে জবানবন্দী দেন, তাতে প্রফুল্ল চাকীর নাম পর্যন্ত গোপন করেছিলেন। তিনি একাই কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করবার সঙ্কল্প নিয়ে মজফ্‌ফরপুরে আসেন। আসবার সময় হাওড়া

স্টেশনে দীনেশচন্দ্র রায় বলে একটি ছেলের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ট্রেনে সেই ছেলেটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং জানতে পারেন একই উদ্দেশ্যে দীনেশচন্দ্রও একা মজফ্‌ফরপুরে যাচ্ছেন। মজফ্‌ফরপুরে কিংস্‌ফোর্ডের ফিটনের ওপর ক্ষুদিরামই একা বোমা ছোঁড়েন। পুলিশ অবশ্য বুঝতেই পারলো, ক্ষুদিরামের এ জবানবন্দী সর্বৈব মিথ্যা। কিন্তু পুলিশের শত চেষ্টা আর শত জেরাতেও ক্ষুদিরাম তৃতীয় কোন লোকের নাম উচ্চারণ করলেন না। তখন পুলিশের কর্তারা ভেবেচিন্তে সেই উন্মুখ-যৌবন তরুণের চারদিকে কৌশলে অব্যর্থ মায়াজাল পাতলেন।

নির্জন কারাগৃহের নির্যাতনের মধ্যে হঠাৎ একদিন এক প্রবীণ বাঙালী অফিসার এসে উপস্থিত হলেন। বন্দীর ঘরের তালা খুলে দিল প্রহরী। বাঙালী অফিসার ঘরে ঢুকেই চারদিকে চেয়ে বলে উঠলেন, কি সর্বনাশ! এই ঘরে তোমাকে রেখেছে? ইস্‌……ভুলেও একটু হাওয়া আসবার পথ নেই! ছিঃ ছিঃ!

ক্ষুদিরাম নীরবে সেই ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। মায়ায়, মমতায়, সহানুভূতিতে ভদ্রলোকের চোখ-মুখ মাখনের মত গলে ওঠে। তখনি ভদ্রলোক জেলারকে ডেকে পাঠালেন এবং ক্ষুদিরামের সামনে তাঁকে রীতিমত ধমক দিয়ে আদেশ করলেন, বন্দী যেন এক তিল কোন অসুবিধা না ভোগ করে! খুন করেছে বটে কিন্তু বুঝতে হবে, তারা সাধারণ খুনী নয়……একটা মস্ত বড় আদর্শবাদের প্রেরণাতেই এ কাজ তারা করেছে!

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ক্ষুদিরাম দেখলেন, তাঁর খাঁচা পরিবর্তিত হয়ে গেল। সামনে উঠোন, ফুলগাছ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটা ঘর, তাতে বেশ মোটা করে ধব্‌ধবে বিছানা পাতা……কুঁজোয় জল……দু'ঘণ্টা তিন ঘণ্টা অন্তর একজন করে লোক এসে জিজ্ঞাসা করে, আপনার কি চাই? পান? সিগারেট? চা? খাবার?

সন্ধ্যেবেলা অফিসার ভদ্রলোক আসেন ও উঠোনে সামনাসামনি দুটো চেয়ার পাতা হয়। ভদ্রলোক পরম স্নেহভরে ক্ষুদিরামকে নিয়ে এসে বসেন। গল্প করেন। যেন জগতে কোথাও কোন গণ্ডগোল ঘটেনি।

একথা সেকথার মধ্যে ভদ্রলোক হঠাৎ হেসে ওঠেন ও সম্পূর্ণ নির্বিকার চিত্তে বলেন, শুনেছ ভায়া! কলকাতায় অরবিন্দ বারীন ঘোষ সব ধরা পড়েছে?

ক্ষুদিরাম যথাসম্ভব নির্বিকার মুখে বসে থাকে।

ভদ্রলোক আবার হেসে ওঠেন, বারীন ছেলেটি খাসা..... সে অকপটে সব কথা খুলে পুলিশকে জানিয়েছে......বাঁচবার সে-ছাড়া আর পথ নেই......তোমার কথাও বলেছে......

ভদ্রলোক সোজা চেয়ে থাকেন ক্ষুদিরামের দিকে।

ক্ষুদিরাম বলে ওঠে, আমার কথা? আমার কথা তিনি কি করে জানবেন?

ভদ্রলোক ক্ষুদিরামের হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে সস্নেহে নেন্, যদিও কাছে-ভিতে কেউ ছিল না, তবুও ক্ষুদিরামের কানের কাছে গিয়ে চুপিচুপি বলেন, ভায়া, পুলিশের কাজ করি বলে, মনে করো না যে আমরা প্রাণহীন। আমি জানি, তোমার মতন ছেলে বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই তোমার কাঁচা বয়স...কিন্তু জীবনের কোন সুখ-স্বাদই তো ভোগ করোনি...সামনে ফাঁসির দড়ি ঝুলছে...অথচ, আমি তো দেখছি, লোহা দিয়ে তৈরী তোমার মন। বারীন তোমার নাম করলো, অথচ, কই, তুমি তো একবারও তার নাম করলে না...এখনো পর্যন্ত তুমি চেষ্টা করছো...

ভদ্রলোক সকরুণভাবে হেসে ওঠেন।

ক্ষুদিরামের দিকে সস্নেহে চেয়ে ভদ্রলোক বলেন, আমি তোমাকে সত্যিই প্রশংসা করি ক্ষুদিরাম...কিন্তু এ সব কথা আমাদের কাছে গোপন করার আর কোন মানেই হয় না...তুমি দেখতে চাও, বারীনের স্টেটমেণ্টের কপি তোমাকে দেখাতে পারি...তোমার মত ছেলেকে যদি বাঁচাতে পারি...দেশের উপকারই হবে...তাই বলছি, বারীনের মতন তুমিও মন খোলসা করে যা-যা জান, একটা Statement দাও...তাড়াতাড়ি কিছু নেই...রাতটা ভেবে দেখ...হাঁ, তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো? যদি তোমার অন্য কিছু দরকার হয়...

ক্ষুদিরাম অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করে, অন্য কিছু কি··· ? আমার তো কোন অসুবিধেই হচ্ছে না।

ভদ্রলোক হেসে ওঠেন, আরে, তোমার মতন কাঁচাবয়সে···এই তো ভোগ করবার সময়···তুমি কোন লজ্জা করো না ভাই, তোমার যা দরকার লাগে, চেয়ে পাঠাবে···সরকারের হুকুম, যাতে তোমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয়···

ভদ্রলোক চলে যান। ক্ষুদিরাম মাথার ওপরে আকাশের দিকে চেয়ে মনে মনে বলে ওঠে, মৃত্যুতে ভরে গিয়েছে পেয়ালা, আমার আর কিসের অভাব ?

সেদিন রাত্রিতে বন্দীর নির্জন ঘরে আবছা অন্ধকারে, বিদ্যুৎশিখার মত কি যেন নড়ে উঠলো·· ক্ষুদিরাম বিছানা থেকে উঠে বসে। চেয়ে দেখে, অপরূপ সুন্দরী এক তরুণী সলজ্জ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। তরুণী ধীরে হ্যারিকেনের কমানো সলতেটা বাড়িয়ে দেয়। অন্যমনস্কভাবে তরুণীর বক্ষবাস স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে ··দুলে উঠে দুটি পদ্মকোরক।

ধীরে এগিয়ে আসে তরুণী, এগিয়ে আসে বাসবদত্তা কিশোর সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে। পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে তরুণী সলজ্জ-কণ্ঠে বলে, দিন, একটু পা টিপে দিই।

সর্পাহতের মত কিশোর লাফিয়ে ওঠে। বিছানা ছেড়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে বলে, কে তুমি ?

আয়ত চোখ দু'টি ঘুরিয়ে তরুণী বলে, আপনার দাসী! আপনার সেবা করতে এসেছি !

কিশোর বলে, আমি ব্রহ্মচারী!

বাসবদত্তা হেসে ওঠে। বলে, এখানে তো কেউ নেই···কেউ জানবেও না!

শান্ত অবিচল কণ্ঠে কিশোর বলে, যেখানে কেউ থাকে না, সেখানেই তো জেগে থাকেন ভগবান।

বোবা বিস্ময়ে তরুণী চেয়ে থাকে কিশোর তরুণের দিকে।

তেমনি শান্তকণ্ঠে কিশোর বলে, মহাদেবীর চরণ ছুঁয়ে শপথ করেছি, জগতের সব নারী আমার মা···সব নারীই আমার কাছে মহাদেবী। তাই মাগো, হাতজোড় করে মিনতি করছি, তুমি ফিরে যাও!

লজ্জায় তরুণী উঠে দাঁড়ায়। রাগে তার চোখ ইস্পাতের মতন জ্বলে ওঠে। বহু টাকার ইনাম তার ফস্‌কে গেল। নীরবে চোখের দৃষ্টিতে ক্রূর ভর্ৎসনা করে তরুণী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মাটির উপর বসে মহাদেবীকে প্রণাম করে, বন্দে মাতরম্‌।

পিছনে তার সদ্যছিন্ন পারিজাতের মালা হাতে এসে দাঁড়ায় মৃত্যু-কন্যা···স্বয়ম্বরা।

গোমতীর তীরে

এক

মামলা শেষ হয়ে এসেছে।

বিচারক মিঃ কার্নডফ তাঁর রায় দেবার জন্যে প্রস্তুত। বিচারককে সাহায্য করবার জন্যে দু'জন স্থানীয় ভদ্রলোক এসেসর্ নিযুক্ত হয়েছিলেন, বাবু নাথুনি প্রসাদ ও বাবু জনকপ্রসাদ। তাঁরা তিনজনে পরামর্শ করে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন, আসামী দোষী। এবার বিচারক তাঁর রায় দেবেন।

কিন্তু আসামী নিশ্চিন্তমনে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙতে শুনলো, বিচারক এখুনি রায় দেবেন।

বিচারক গভীরকণ্ঠে রায় দিতে আরম্ভ করলেন। আসামী আদালতের কড়িকাঠের দিকে চেয়ে দেখছে, একটা টিকটিকি শিকারের আশায় মাথা তুলে কেমন ধীর-নিস্পন্দভাবে অপেক্ষা করে আছে।

বিচারক রায় শেষ করে দণ্ডাজ্ঞা দিলেন, মৃত্যু···ফাঁসিতে মৃত্যু।

ইংরেজ সিভিলিয়ান বিচারক মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ শেষ করে আসামীর দিকে চাইলেন···দেখলেন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী নির্বিকার বসে হাসছে। বিচারক ভাল করে আসামীকে চেয়ে দেখলেন। তেমনি নির্বিকার, উদাসীন। সমস্ত আদালত নিস্তব্ধ।

বিচারকের ধারণা হলো, নিশ্চয়ই আসামী তাঁর দণ্ডাজ্ঞা শুনতে পায়নি, অথবা বুঝতে পারেনি। নইলে আঠারো বছরের ছেলে মৃত্যুদণ্ড শুনে ঐরকম নিবিকার থাকতে পারে?

ইংরেজ বিচারক তাই আসামীকে সোজা ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এইমাত্র আমি তোমার বিরুদ্ধে যে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছি, তা তুমি শুনেছ?

তেমনি হেসে শুধু ঘাড় নেড়ে আসামী জানায়, হাঁ শুনেছি।

সে-উদাসীন-নির্বিকারতায় দণ্ডদাতা বিচারকের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তিনি উপযাচক হয়ে আসামীকে বলেন, তুমি যদি হাইকোর্টে আপীল করতে চাও, তাহলে সাতদিনের মধ্যে করতে হবে, বুঝলে ?

শান্ত অবিচলিতকণ্ঠে আসামী বলে, তার দরকার নেই ! তবে এখানে সকলের সামনে, একটা কথা বলতে চাই !

বিচারক বলেন, না, এখানে তোমার কোন কথা শোনবার আর আমার সময় নেই। আপীল সংক্রান্ত যা কিছু···

আসামী আবার হেসে ওঠে, না, না, আপীল সম্বন্ধে আমি কোন কথাই বলতে চাই না। আমার দরকার নেই। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি এই প্রকাশ্য আদালতে জানিয়ে যেতে চাই, কি করে বোমা তৈরী করা যায়···

বিচারক আসন ছেড়ে উঠে পড়েন। সশস্ত্র প্রহরীরা মৃত্যুদণ্ডিত তরুণ ক্ষুদিরামকে ধরে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে তোলে।

তাকে কারাগার থেকে নিয়ে আসবার ও নিয়ে যাবার জন্যে একটা আলাদা ফীটন-গাড়ী ঠিক করা হয়েছিল। শৃঙ্খলিত ক্ষুদিরাম সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত হয়ে সেই ফীটনে গিয়ে উঠলো।

শহর থেকে দু'মাইল দূরে কারাগার। ফীটন যাবার রাস্তার দু'ধারে কৌতূহলী বেহারীরা স্তব্ধ-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ সেই স্তব্ধ মানুষের সারির ভেতর থেকে দু'একটা লোক সেলাম করে ওঠে, দু'একটা লোক হাতজোড় করে নমস্কার করে। যুগ-যুগান্তরের অন্ধকার অচেতনের ভেতর নড়ে ওঠে ভয়ত্রাতা অগ্নিশিখা।

দুই

মামলার সময় উকীল সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী একান্তভাবে চেষ্টা করেন, যদি কোনরকম আইনের মার-প্যাঁচে ক্ষুদিরামকে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। সেই উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরামের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি তিনি চান। এবং অনুমতি পান। কিন্তু ক্ষুদিরামের সঙ্গে

দেখা করে, কথাবার্তা বলে বুঝলেন, সে চেষ্টা বৃথা। কোন শাস্তি, কোন আশঙ্কা, তার ক্ষীণতম ছায়া সেই তরুণ বিপ্লবীর মনে এসে পড়েনি।

কাষাই নদীর ধারে জঙ্গলের ভেতর এক ভাঙা ভূতুড়ে বাড়ির অন্ধকার ঘরে একদিন তেরো বছরের একটি বালক রক্ত-রসনা দিক-বসনা শ্যামামায়ের পায়ে নিজের বক্ষ-রক্তনিষিক্ত তিনটি তুলসীপত্র দিয়ে বিপ্লবের যে অভীমন্ত্রকে গ্রহণ করেছিল, আজ সে মন্ত্রের পরীক্ষার দিন। তার বিপ্লব-মন্ত্রের দীক্ষাগুরু সত্যেন বসুর নির্দেশে সেদিন সে তিনটি শপথকে অঙ্গীকার করে নিয়েছিল।

—দলের কোন কথা কোন অবস্থায় বা কোন কারণে বাইরের কোন লোকের কাছে বলবো না।

—দলের নেতা যা আদেশ করবেন, বিনা প্রশ্নে তখুনি তা পালন করবো, তাতে মৃত্যু হলেও বিচলিত হবো না এবং যদি কোন কারণে কোনদিন এই শপথ ভঙ্গ করি, তাহলে তার জন্যে মৃত্যুদণ্ড নিতে প্রস্তুত রইলাম।

উকীল সতীশবাবু বুঝলেন, এই তিনটি শপথের বাইরে বন্দী ক্ষুদি-রামের মনে আর কোন চিন্তা বা কোন ভাবনা নেই। তবুও উকীলের অভ্যাসবশতঃ সতীশবাবু বল্লেন, কেন তুমি পুলিসের কাছে নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করলে?

বন্দী ক্ষুদিরাম হেসে উঠলো। শান্তকণ্ঠে বললো, কেন অস্বীকার করবো বলতে পারেন?

সেই নিরুদ্বেগ শান্ত মুখের দিকে চেয়ে সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করেন, তোমার মনে কি মৃত্যুভয়ের কোন দোলা জাগে না।

শান্তকণ্ঠে ক্ষুদিরাম বলে, আমি গীতা পড়েছি।

—তোমার মনে কি কোন দুঃখ হয় না।

…না, কোন দুঃখ আমার মনে নেই।

—কাউকে দেখতে চাও কি?

—যদি একবার মেদিনীপুরকে দেখতে পেতাম…

সতীশবাবু নতমস্তকে ফিরে এলেন। ফেরবার সময় তিনি নাকি ক্ষুদিরামকে বলেছিলেন, ক্ষুদিরাম, ভগবানকে স্মরণ করো।

সতীশবাবু হয়ত তখন জানতেন না, যে মন থেকে সর্বভয়ের কম্পন চলে যায়, সেই মনে তখন নিজেই আসন পেতে বসেন ভগবান।

তিন

ক্ষুদিরামের যখন সাত বছর বয়স, সেই সময় বালক বুঝতে পারলো পৃথিবীতে তার আপনার জন কেউ নেই। বাপ-মা ছু'জনেই মারা যান। এক আত্মীয়ের বাড়িতে বালক আশ্রয় পেলো কিন্তু ছু'বেলা ছু'মুঠো ভাতের জন্যে বালকের ওপর যে অত্যাচার চললো, তাতে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন বালক সেই আশ্রয় ছেড়ে নিরুদ্দেশ বেরিয়ে পড়লো। দশ বছরের ছেলে···পথঘাট বিশেষ কিছুই জানা নেই···নাই বা জানা থাকলো···সামনে বন-জঙ্গল, সাপের আড্ডা, প্রায়ই ডাকে ফেউ··· সাপকে মাড়িয়ে যাবে সে, ল্যাজ ধরে কত সাপকে সে ঘুরিয়েছে··· জঙ্গলের ওপারে মাইল দশেক দূরে মেদিনীপুর শহর···সেই শহরে তার আপনার জন কেউ নেই···আপনার জন কাউকে সে চায় না···মনে পড়লো, একজনের কথা, তার ধর্ম-মা, তাঁর কাছেই গিয়ে উঠবে। এক-টানা দশ মাইল সেই জঙ্গল আর কাঁটাবন ভেঙে বালক ক্ষুদিরাম যখন তার ধর্ম-মা'র বাড়িতে এসে দাঁড়ালো, তখন আর তার দাঁড়াবার শক্তি নেই। ধর্ম-মা অনেক বোঝালেন কিন্তু সেই দশ বছরের ছেলে প্রতিজ্ঞা করে বসলো, সে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে তবু সেই আত্মীয়ের বাড়ি যাবে না।

বালকের একমাত্র আপনার জন, তার ভগ্নীপতি তখন তমলুকে থাকতেন। চেষ্টা-চরিত্র করে বালককে তমলুকে ভগ্নীপতি অমৃতলাল রায়ের কাছে পাঠানো হলো। তার বছর তিনেক পরে অমৃতলাল বদলী হয়ে মেদিনীপুরে এলেন, ক্ষুদিরামও আবার ফিরে এলো মেদিনীপুরে, ভর্তি হলো মেদিনীপুরের সরকারী স্কুলে। এই স্কুলের সঙ্গে বাংলাদেশের

এক বিস্মৃতকীর্তি মহাপুরুষের স্মৃতি বংশ-পরম্পরায় বিজড়িত। এই স্কুলে দীর্ঘদিন এক বৃদ্ধ প্রধান-শিক্ষক ছিলেন···তখন দেশে সবেমাত্র ইংরেজী শিক্ষার পত্তন হয়েছে···সারা দেশ তখন জড়তায় নিস্তব্ধ। সেই বৃদ্ধ সেই সময় একা আপনার মনে স্বপ্ন দেখতেন, একদিন এই সুপ্রাচীনা দেশ আবার নবচেতনায় জেগে উঠেছে, নতুন মানুষেরা এসে এক নতুন মহাসভা গড়ে তুলেছে, সেই মহাসভার পতাকা হাতে ভারতের তরুণ-তরুণীরা এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতার সংগ্রামে···সংগ্রামে জয়লাভ করে তারা সম্মিলিতভাবে গড়ে তুলেছে নতুন এক ভারতবর্ষকে···এই বৃদ্ধের নাম হলো রাজনারায়ণ বসু, শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ। কংগ্রেসের বহু আগে, এই বৃদ্ধের চেতনায়, এই বৃদ্ধের রচনায় প্রথম জন্মগ্রহণ করে স্বাধীন ভারতের বাস্তব সংগ্রামের ভাবমূর্তি। রাজনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়াচরণও এই স্কুলের শিক্ষকতা করেন। অভয়াচরণের পরবর্তী যুগে, তাঁর পুত্র, সত্যেন্দ্রনাথও এই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন এবং নিশিদিন ভাবতেন, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ মহাজাতির যে স্বপ্ন দেখে গিয়েছেন, কি করে তাকে সত্য করে তোলা যায়। রাজনারায়ণের দৌহিত্রও তখন বরোদার রাজকার্য ছেড়ে বাংলায় এসেছেন সেই স্বপ্নকে মূর্তি দেবার জন্যে। অরবিন্দকে কেন্দ্র করে বাংলায় তখন সংগোপনে চলেছে স্বাধীনতার বিপ্লব আয়োজন। সেই বিপ্লবী দলের নেতা হয়েছেন অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার। সত্যেন্দ্রনাথও এই দলে যোগদান করেছেন এবং জাতির তরুণদের মনে বিপ্লবের রঙ ধরাবার জন্যেই নিয়েছেন শিক্ষকের বৃত্তি। সারাদেশের মধ্যে তখন তাঁরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কোথায় আছে সেই সব তরুণপ্রাণ, বিবেকানন্দের ভাষায় যাদের জীবন হলো মায়ের কাছে বলিপ্রদত্ত। শিক্ষকতা হলো বিপ্লব-সাধনারই ছদ্মবেশ।

ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরে এসে সরকারী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়। সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের সন্ধানী চোখ সেই বিচিত্র কিশোরের ওপর পড়লো। মাতাপিতাহীন স্নেহপাগল বালক ক্ষুদিরাম সেই তরুণ শিক্ষকের কাছে পেলো, যা সে জগতে কারুর কাছে পায়নি, প্রাণের স্পর্শ। ধীরে ধীরে সত্যেন্দ্রনাথ কিশোর ক্ষুদিরামের অন্তরকে দেশ-প্রেমের

অগ্নিশিখায় জাগিয়ে তুলতে লাগলেন। এমন সময় মেদিনীপুরে এলো স্বদেশী আন্দোলনের বন্যার জলতরঙ্গ। মেদিনীপুরের চারদিকে শুরু হয়ে গেল বিলিতী বর্জনের তীব্র আন্দোলন। রাত্রিবেলা বিলিতী কাপড়ের দোকান আগুনে পুড়ে যায়, নদীতে নুনের নৌকা উলটে যায়, সরকারী ডাকবাক্স ভেঙে পড়ে থাকে, সারা মেদিনীপুরে আর তার আশে-পাশের গ্রামে পড়ে গেল এক মহা হই-চই। চারদিকে পুলিসের লোক ঘুরে বেড়ায় এই গোপন বিপ্লবীদের ধরবার জন্যে। সত্যেন্দ্রনাথ তখনো কিশোর ক্ষুদিরামকে দলের অন্তরঙ্গতায় স্থান দেননি, তবে বিপ্লবের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ক্ষুদিরাম এই সব সংগোপন বৈপ্লবিক কাজে আগে থাকতেই ছুটে যায়···ঠিক বুঝতে পারে না, কার নির্দেশে, কার পরিচালনায় এই সব কাণ্ড ঘটছে। সত্যেন্দ্রনাথ অতন্দ্রদৃষ্টিতে এই কিশোর উৎসাহীকে লক্ষ্য করে চলেন। ইদানীং ক্ষুদিরাম প্রায়ই বাড়ি থেকে বিনা নোটিশে চলে যায়, কোন কোন দিন রাত্রিতে বাড়ি ফেরে না, কোন কোন দিন লুকিয়ে ভোরের বেলা ফেরে। তার আশ্রয়দাতা বিরক্ত, ভীত ও ক্রমশ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। তিনি সরকারের গোলাম, সরকার তাঁর অন্নদাতা, তিনি কি করে তাঁর বাড়িতে সরকারবিদ্রোহীকে পুষতে পারেন। আজ অনেকেই ক্ষুদিরামের আত্মীয়রূপে নিজেদের পরিচয় সগর্বে দিতে পারেন, কিন্তু সেদিন ক্ষুদিরামের আত্মীয়তাকে অস্বীকার করাই ছিল সরকারী চাকুরের সনাতন আত্মরক্ষা নীতির স্বাভাবিক প্রকাশ। এবং একথা সত্য যে, সেদিন কিশোর ক্ষুদিরাম তাঁর ভগ্নীপতির আশ্রয় চিরকালের মত ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর পেছনে কতখানি শাসন আর কতখানি নির্যাতন ছিল, তা জানবার কোন উপায়ই নেই। তবে আমরা দেখি, শিশুকাল থেকে স্নেহহীন ভাগ্যহীন সেই অনাথ বালক একমাত্র আত্মীয়ের আশ্রয় ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে, নিদারুণ বেদনায় কাষাই-এর অপর পারে ঘন জঙ্গলের ভেতর পরিত্যক্ত বুড়োশিবের মন্দিরে অনাহারে ধর্ণা দিয়ে পড়ে আছে। ভীষণ বিষাক্ত সাপের ভয়ে সে মন্দিরের দিকে কেউ যায় না। বালক লোকের মুখে মুখে সেই পরিত্যক্ত বুড়োশিবের মহিমার বহু কাহিনী শুনেছিল,

শুনেছিল একান্ত মনে সেই বুড়োশিবের কাছে যে যা চায়, শ্মশানেশ্বর নাকি তাকে তাই দিয়ে থাকেন। তাই সর্ব-আশ্রয়চ্যুত সেই কিশোর বালক নিরম্বু উপবাসে সেই বুড়োশিবের কাছে তু'দিন ধরে ধর্ণা দিয়ে পড়ে আছে, হে শিব, পূর্ণ করো আমার মনের বাসনা।

তু'দিন যখন বালকের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না, তখন বাড়ির সকলে চিন্তিত হয়ে পড়লো। খবরটা মাস্টারমশাই-এর কানে গেল, ক্ষুদিরাম বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষুদিরামের গতিবিধি এবং মনের সব খবরই জানতেন। তিনি খুঁজতে খুঁজতে কাষাই-এর ওপারে সেই নির্জন পরিত্যক্ত ভগ্ন-শিবমন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। দেখেন, মন্দিরের ভগ্ন-চত্বরে শুয়ে আছে ক্ষুদিরাম। অস্ফুট স্বরে কিশোর প্রার্থনা করছে, দেশের কাজে আমি উৎসর্গ করতে চাই আমার জীবন। হে শিব, সার্থক করো আমার এই বাসনাকে।

ধীরে সত্যেন্দ্রনাথ কিশোরের কাছে এসে তাকে ডাকেন। কিশোর মুখ তুলে দেখে, মাস্টারমশাই!

সত্যেন্দ্রনাথ বলেন, এই বুড়োশিবকে ছুঁয়ে শপথ করো, আজ যা শুনবে, জীবনে তা কাউকে বলবে না।

কিশোর শপথ করে।

সেইদিন সত্যেন্দ্রনাথ শ্যামাজননীর সামনে কিশোরকে দিলেন বিপ্লব মন্ত্রের দীক্ষা, মরণ-মন্ত্রের দীক্ষা।

চার

বুড়োশিব সার্থক করেছিলেন সেই কিশোরের অন্তরের প্রার্থনাকে। বাংলার জাগরণের ইতিহাসে ক্ষুদিরামের বাস্তব অস্তিত্বের আয়ু মাত্র এক মুহূর্তকাল। সেই একটি মুহূর্তও নিদারুণ ভুল ও ব্যর্থতায় পঙ্গু। তবুও সেই একটি মুহূর্তের আয়ু দেশজোড়া জমাট জড়ত্বের ভেতর জাগিয়ে গেল অমর প্রাণের বিদ্যুৎবহ্নিকে ভয়ের শৃঙ্খলে বাঁধা জাতির মনকে একটি প্রাণের স্ফুলিঙ্গে দিল অভয়-মুক্তি।

ফাঁসির আগের দিন কালিদাসবাবু কারাগারে মৃত্যুপথযাত্রী কিশোরের সঙ্গে দেখা করেন……তিনি দেখে এলেন, মৃত্যুর মহিমায় দীপ্ত এক অপরূপ মন। যে-মন সর্ব-ভয়কে, মৃত্যুভয়কে অনায়াসে, আনন্দে গিয়েছে উত্তীর্ণ করে……

চলে আসবার সময় শেষকথা জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত্যুর আগে কোন শেষ ইচ্ছা থাকে বলো, পূরণ করতে চেষ্টা করবো।

স্নিগ্ধকণ্ঠে কিশোর বললো, আমার শেষ ইচ্ছা, কাল ফাঁসিতে যাবার আগে, যদি মা চতুর্ভুজার একটু প্রসাদ পাই।

পরের দিন উষাকালে। জেলের একজন ব্রাহ্মণ প্রহরী কিশোরের হাতে এনে দিল চতুর্ভুজার প্রসাদ।

সেই প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে কিশোর চললো ফাঁসির মঞ্চের দিকে……

বাইরে গোমতীর তীরে তখন উঠছে নতুন দিনের প্রভাত রবি।

পরিত্যক্ত অন্ধকার কারাকক্ষে দেখা গেল, পড়ে আছে দু'খানা বই, গীতা আর রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী।

এমন করেই বিশ্বাসঘাতক মরে

এক

আমার এক প্রোগ্রেসিভ ছাত্র-বন্ধু, একদিন আমাকে প্রশ্ন করলো, আপনি স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে যে রকম উচ্ছ্বাস করেছেন, আপনি বলুন তো, সত্যিকারের রাজনৈতিক রিয়ালিজিমের দিক্ থেকে সেই আন্দোলনে কি করা হয়েছে? গোটাকতক সাহেব কর্মচারী আর দেশী গোয়েন্দাকে খুন করবার চেষ্টা ছাড়া, সে-আন্দোলনের রাজনৈতিক কৃতিত্ব কতটুকু? গণ-চেতনার সঙ্গে তার কি সংযোগ? স্বদেশ-প্রেমের উৎকট সেন্টিমেণ্টালিজিম ছাড়া সে-অন্দোলনের রাজনৈতিক মূল্য কি?

বন্ধুকে বল্লাম, রাজনীতি তত্ত্বের কথা না তুলে সাধারণভাবে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। একটা গল্প শোন। ছোট গল্প। বলেছেন চৈনিক সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ রিয়ালিস্ট, কনফুসিয়াস। কনফুসিয়াসের এক বন্ধুর ছেলে যৌবন-সমাগমে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। বৃদ্ধ বাপ কনফুসিয়াসকে এসে ধরলেন। কনফুসিয়াস ছেলেটিকে ডাকিয়ে আনালেন। বল্লেন, বুড়ো বাপের যতই দোষ থাক তাঁকে এখন অস্বীকার করা ছেলের পক্ষে অকর্তব্য। ছেলে রেগে বল্লো, আপনি তো জানেন, আমি যা কিছু করেছি, নিজের চেষ্টায় করেছি। বাবা আমার জন্যে কি করেছেন? কনফুসিয়াস তার জবাবে বলেছিলেন, তোমার বাবা তোমাকে জন্ম দিয়েছিলেন, কৃতজ্ঞতার পক্ষে এর চেয়ে বেশী কিছু দরকার নেই! তোমার প্রশ্নের উত্তরে, আমারও তাই বক্তব্য। বাংলাদেশে উনিশ শো পাঁচ জন্ম দিয়েছিল স্বাধীন ভারতবর্ষকে। সেদিন গুটিকতক সেন্টি-মেণ্টাল বাঙালী তরুণ যে-সব রাজনৈতিক কার্য করেছিলেন, তার মধ্যে হয়ত পাগলামি আর অবিবেচনাই বেশি ছিল, কিন্তু সেই গুটিকতক তরুণ বাঙালী নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্রে ও আচরণে সেদিন চরিত্রভ্রষ্ট ও ভয়-মুমূর্ষু একটা সমগ্র জাতির মনের চেহারা বদলে দিয়ে যায়…সর্ব-ভয়

থেকে, সর্ব-ক্ষুদ্রতা থেকে, সর্ব-শিথিলতা থেকে জাতির মনকে মুক্ত করে তারা দিয়ে যায় দুর্জয় প্রতিবাদের দুঃসাহস, দিয়ে যায় নবনী-কোমল আমাদের চরিত্রে অনমনীয় দার্ঢ্য, প্রতিষ্ঠা করে যায় আমাদের জাতীয় চরিত্রের নব-ভিত্তি, কান্নার পাঁকে পিছল বাঙালীর জীবনে তারা রেখে যায় প্রচণ্ড হাসির রৌদ্র-রুদ্র উল্লাস·····

বন্ধুকে কাছে টেনে নিয়ে বলি, রাজনৈতিক পন্থা হিসাবে আজকের যুগ টেররিজ্‌মের উন্মাদনাকে বহু দূরে পেছনে ফেলে এসেছে, তবু আজ আমার সহযাত্রী তরুণ-বন্ধুদের নিয়ে যেতে চাই বাংলার অগ্নিযুগের সেই টেররিস্টদের কাছেই, কারণ সেখানে আছে চরিত্র, আছে দার্ঢ্য, আছে সংকল্পের তেজ, ক্ষুদ্রতার প্রতিবাদ, অহমিকাহীন ব্যক্তিত্বের অগ্নিশিখা, আছে উৎসর্গীকৃত জীবনের পাবক উত্তাপ, যার অভাবে আজ এত কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকেও মনে হয় যেন নিরর্থক।

আজ যাব বাংলার সেই অগ্নি-যুগের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তে······

দুই

মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা। সে-ঘটনার সঙ্গে সেদিন যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ এখনো জীবিত আছেন। কিন্তু সেদিনকার সে-জীবন তাঁদের মধ্যে আর নেই। আগুন নিভে গিয়েছে, ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আলীপুর জেলে মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় বন্দী শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর রাজনৈতিক মন্ত্র-শিষ্যরা দিন গুণছেন···আদালতে বিচার চলেছে··· বন্দীরা লোহার খাঁচার ভেতর বসে প্রকাশ্য আদালতে শৃঙ্খল বাজিয়ে গান গায়· বন্দী উল্লাসকরের ভরাট গলায় ভরে ওঠে আদালতকক্ষ, সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি!

স্পেশাল ব্রাঞ্চের রামসদয়বাবু ইংরেজ প্রভুর নিমকের ঋণ পরিশোধ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। তরুণ বন্দীদের কাছে পরমহিতৈষী পিতৃব্যের মতন এসে বলেন, বাবা, তোমাদের বুঝবে এই ইংরেজবেটারা!

আমি জানি না কত বড় তোমাদের প্রাণ। যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন যাতে ভালোয় ভালোয় মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যায়, সেই জন্যে……

রামসদয়বাবু নানা কৌশলে, কখনো আলাদা-আলাদাভাবে, কখনো ছোট-ছোট দলে বন্দীদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, মন-খোলসা করে যে-যা করেছ, বলে ফেল…বারীন তো স্বীকারোক্তি করেছেই…অতএব, ফাঁসি থেকে তোমরা যদি বাঁচতে চাও, তো এ্যাপ্রুভার হও!

রামসদয়বাবু হয়রান হয়ে যান, এতগুলো ছেলে, কাঁচা বয়সী বাঙালীর ছেলে, মাথার ওপর ঝুলছে ফাঁসির দড়ি, অথচ একজনও কেউ তাদের মধ্যে এ্যাপ্রুভার হয়ে বাঁচতে চায় না! জাতটার চরিত্র কি রাতারাতি বদলে গেল?

আদালতে যাওয়া আর আসার মধ্যে ক্রমশ বন্দীদের কানে একটা কথা আসতে লাগলো, তাদের দলের মধ্যে নরেন গোঁসাই নাকি এ্যাপ্রুভার হয়েছে!

জেলে identification parade-এর সময় নরেন গোঁসাই শ্রীঅরবিন্দের পাশেই ছিলেন।* শ্রীঅরবিন্দ নরেন গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, নরেন, তুমি কি পুলিশের সঙ্গে কোন বন্দোবস্ত করেছো?

নির্বিকারচিত্তে নরেন গোঁসাই বলে, আর বলেন কেন? পুলিশের লোকেরা অষ্টপ্রহর আমাকে জ্বালাতন করে মারছে, এ্যাপ্রুভার হবার জন্যে!

শ্রীঅরবিন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাদের কি উত্তর দিয়েছ?

নরেন গোঁসাই বলে, আমি কি জানি বলুন যে তাদের জানাবো! তবুও তারা তা বিশ্বাস করবে না, খালি খবরের জন্যে আমার কাছে আসছে যাচ্ছে।

মহা-রসিক শ্রীঅরবিন্দ হেসে গোঁসাইকে বলেছিলেন, এবার যখন পুলিশ খবরের জন্যে তোমার কাছে আসবে, তুমি বলো স্যার এ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার আমাদের গুপ্ত-সমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক!

---

* কারাকাহিনী—শ্রীঅরবিন্দ।

নরেন গোঁসাই হেসে বলে, আমি প্রায় সেই রকমই একটা খবর দিয়েছি···তাদের বলেছি, সুরেন বাঁড়ুয্যে আমাদের head ছিলেন।

হঠাৎ শ্রীঅরবিন্দ গম্ভীর হয়ে যান। বুঝলেন, এই অপদার্থ লোকটি যে-কথা বল্লো, তার ভেতর একটা সুপরিকল্পিত কূটবুদ্ধির খেলা আছে। তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন, একথা বলবার তোমার কি দরকার ছিল ?

শ্রীঅরবিন্দের স্থির চোখের দিকে চেয়ে নরেন গোঁসাই থতমত খেয়ে যায়, নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টায় বলে, মরুক না পুলিশ ঘুরে !

ক্রমশ বন্দীদের বুঝতে বাকী রইলো না, নরেন গোঁসাই বোকা সেজে তখনো তাদের প্রতারিত করছে। একদিন বন্দীদের ভেতর থেকে একজন তাকে পদাঘাত করলো। পুলিশের লোকেরা বুঝলো, গোঁসাইকে আর বন্দীদের মধ্যে ছেড়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাকে আলাদা করে য়ুরোপীয় কয়েদীদের হাসপাতালে প্রহরী বেষ্টিত করে রাখা হলো। আদালতে পুলিশ প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করলো যে, নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হয়েছে।

আজ সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, নরেন গোঁসাই পুলিশের চর হয়েই গুপ্ত-সমিতিতে প্রবেশ করে।* জগতের প্রত্যেক বিপ্লবী-আন্দোলনে বিপ্লবী-দলের ভেতর চর রেখে শাসকেরা সেই দলকে ভাঙতে চেষ্টা করে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সেদিন বাংলাদেশে যে সব তরুণ এই বিপ্লব-আন্দোলনে জীবন সমর্পণ করে, তাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক কেউ ছিল না। বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্যেই ধনীর লম্পট পুত্র দুশ্চরিত্র নরেন গোঁসাই এই দলে যোগদান করে এবং লোকের নিষেধ সত্বেও সেদিন রোমান্টিক আদর্শবাদী তরুণ দলনেতা বারীন্দ্রকুমার অনুতপ্ত পাপী হিসাবে নরেন গোঁসাইকে গ্রহণ করেন। তবে সেই আন্দোলনের যে-টুকু ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায়, দলের কোন অন্তরঙ্গ ব্যাপারে নরেন গোঁসাইকে অন্তর্ভুক্ত করা হতো না। তার আচরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা

* অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস (১ম খণ্ড)—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

যায়, গোড়া থেকেই তার উদ্দেশ্য ছিল, এই বিপ্লবী দলের সংগোপন সহায়কারী ও সহযোগীদের নাম সংগ্রহ করা। একটা ব্যাপারে গোঁসাই-এর খুব উৎসাহ ছিল। শ্রীঅরবিন্দের বিলুপ্ত রচনা ভবানী-মন্দিরের আদর্শে তখন গোপনে আনন্দমঠের মতন ভবানী-মন্দির গড়ে তোলবার একটা পরিকল্পনা হয়। এই ভবানী-মন্দিরের জন্যে চাঁদা তোলবার ব্যাপারে নরেনের বিশেষ উৎসাহ দেখা যেতো, কারণ প্রত্যক্ষভাবে সাহায্যকারীদের জানবার সুযোগ তাতে ঘটতো। এছাড়া, আর একটা ব্যাপারে তার খুব উৎসাহ ছিল ; বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে ডাকাতির জল্পনা-কল্পনা করা। কোথায় কিভাবে ডাকাতি করা যেতে পারে, তাই নিয়ে নরেন বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে প্রায়ই গল্প করতো। এ সমস্তই হলো ছদ্মবেশী চরের লক্ষণ।

তিন

কারাগারের ভেতর মৃত্যু-পথযাত্রী বিপ্লবীরা যখন পাকাপাকিভাবে জানলেন নরেন রাজসাক্ষী হয়েছে, তখন তাঁরা ভীত হয়ে উঠলেন, নিজেদের জন্যে নয়, তাঁরা তো নিজেদের কাজ নিজেরা স্বীকারই করেছেন, তাঁরা ভীত হয়ে উঠলেন বিপ্লব-আন্দোলনের জন্যে, দলের অবশিষ্ট সভ্যদের জন্যে, যাঁরা পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে তখনো কারাগারের বাইরে রয়েছেন।

কারাগারের ভেতর পরামর্শ সভা বসলো। সত্যেন্দ্রনাথ বল্লেন, সময় নষ্ট না করে কারাগারের ভেতরই নরেনকে হত্যা করতে হবে। বারীন্দ্রকুমার দলপতি হিসাবে সে প্রস্তাবের ঘোরতর প্রতিবাদ করলেন। তিনি তখন কারাগার ভেঙে পালাবার পরিকল্পনা করছিলেন, তার জন্যে দুটো রিভলবার যোগাড় করেছেন। নরেন গোঁসাইকে হত্যা করতে গেলে, সে পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া, এ হত্যার অপরাধের বোঝা শ্রীঅরবিন্দের ঘাড়েও পড়তে পারে। দলপতি হিসাবে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার দায়িত্ব তিনি বাইরের মুক্ত বিপ্লবীদের ওপর

ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে আদেশ করলেন, তাঁর মন থেকে এ পরিকল্পনা তিনি যেন মুছে ফেলেন।

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তা পারলেন না। যুগে যুগে এই বিশ্বাসঘাতকতা বাংলার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রেখেছে, তাঁর জীবন দিয়ে তিনি এই পাপের শিকড়কে জাতীয় চেতনার মাটি থেকে এমনভাবে উপড়ে ফেলে দিয়ে যাবেন, যাতে ভবিষ্যতে এই বাংলার মাটিতে আর কেউ এই জঘন্য হীনতার কথা চেতনায় না আনতে পারে। যেদিন নরেন গোঁসাই সম্পর্কে বন্দীদের পরামর্শ হয়, সেদিন চোখে-চশমা একটি শ্যামবর্ণ তরুণ বন্দী নীরবে সমস্ত কথা শুনছিল। কোন কথা সে উচ্চারণ করলো না। কানাইলাল। নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলো, সুযোগের জন্যে।

সত্যেন্দ্রনাথের হাঁফানির অসুখ ছিল। সেই সময়ে হঠাৎ হাঁফানিটা বেড়েও উঠেছিল। বন্ধু হেমচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে সত্যেন্দ্রনাথ সেই হাঁফানিরই সুযোগ গ্রহণ করলেন। জেলের ডাক্তারের কাছে খবর এলো, বন্দী সত্যেন্দ্রনাথের হাঁফানির যন্ত্রণা অসহ্যরকম বেড়েছে, এখুনি ব্যবস্থা করা দরকার। ডাক্তার এসে দেখলেন, যন্ত্রণায় সত্যেন্দ্রনাথ ছটফট করছেন, সহৃদয় ডাক্তারবাবু হাসপাতালের ব্যবস্থা করলেন।

তাড়াতাড়ি সত্যেন্দ্রনাথকে সেল্ থেকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন, এ যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না, কি ভুলই করেছি জীবনে!

কথাটা জেল কর্তৃপক্ষের কাণে গেল। তাঁদের একজন এসে সহানুভূতি দেখিয়ে বল্লেন, যদি ভুল বলেই বুঝতে পেরে থাকেন, তাহলে অকারণে কেন আর এ যন্ত্রণা ভোগ করছেন!

সত্যেন্দ্রনাথ পাকা অভিনেতার মতন মাথার চুল টানতে টানতে বলেন, এই কদিন ধরে, অষ্টপ্রহর সে-ই কথাই ভাবছি···নরেন ঠিকই করেছে!

জেলের কর্তাটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলেন, আপনিও ইচ্ছা

করলে নিজের মুক্তি অর্জন করতে পারেন, রাজসাক্ষী হয়ে···রাজী থাকেন তো বলুন ?

সত্যেন্দ্রনাথ আবেগভরে তাঁর হাত ধরে বলেন, আমি রাজসাক্ষী হতে চাই কিন্তু আমার বন্ধুরা যদি জানতে পারে···সেই এক ভয়···পুলিশ যদি কথা দেয়, একথা এখন কিছুতেই প্রকাশ করবে না, তাহলে আমি রাজসাক্ষী হতে রাজী আছি।

তিনি আশ্বাস দেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন···আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি পুলিশকে রাজী করাবো···একথা এখন কাউকেই জানানো হবে না···আপনাকে রোগী হিসাবে হাসপাতালে আলাদা করে রাখা হবে। কেউ জানতে পারবে না।

দূরের দিকে চেয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান।

চার

পুলিশের কর্তারা যখন শুনলেন, সত্যেন্দ্রনাথ রাজসাক্ষী হতে চেয়েছেন, তাঁরা উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সত্যেন্দ্রনাথের অনুরোধ মত কথাটা গোপন রাখা হলো। সবাই জানলো, বাড়াবাড়ি অসুখের জন্যে তাঁকে জেলের হাসপাতালে রাখা হয়েছে।

সকলের চেয়ে খুশী হলো নরেন গোঁসাই। এতদিন সে ছিল একা, আজ তার দোসর মিললো এবং যে-সে দোসর নয়, দলের একজন সবচেয়ে বড় নেতা, স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ আর বারীন্দ্রকুমারের মাতুল। যদিও সব সময় গোঁসাইকে সশস্ত্র প্রহরী আগলে ছিল এবং বন্দীদের কাছ থেকে দূরে হাসপাতালের য়ুরোপীয় ওয়ার্ডে তাকে রাখা হয়েছিল, তবুও সেই জঘন্য পাপের নিঃসঙ্গতায় নিদারুণ আতঙ্কে তার দিন কাটতো। আজ সে সাহস পেলো, তার পাশে আর একজন আছে।

পুলিশের কর্তারা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলেন, বুঝলেন খবরটা মিথ্যা নয়। সত্যেন্দ্রনাথ রাজসাক্ষী হতে প্রস্তুত, যৌবনের উদ্দীপনায় যা করে ফেলেছেন, তার জন্যে আজ অনুতপ্ত তিনি, তিনি বাঁচতে চান।

অনুমান করতে পারি পুলিশের কর্তা বিজ্ঞের মতন অনুতপ্ত সত্যেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন, জীবনের কি মায়া, বেঁচে থাকবার কি অসীম প্রলোভন !

…কোটি কোটি লোকের মধ্যে একজন হয়ত মৃত্যুকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে এবং তার জন্যে সেই একটি লোককে করতে হয় কঠোর যোগ-সাধনা…উন্মাদনার মুহূর্তে হয়ত কেউ কেউ পারে মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে… কিন্তু মৃত্যুর কোলে বসে, দিনের পর দিন ধীরস্থির অবিচলিতচিত্তে জীবনকে নিয়ে খেলা করা, এ এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বীরত্ব, অতি দুর্লভ তার প্রকাশ…

তাই সত্যেন্দ্রনাথের কথায় সন্দেহ করবার কোন অবকাশই পেলেন না পুলিশের কর্তারা। তবু আনুষ্ঠানিক সমস্ত সতর্কতা যথারীতি বজায় রেখেই তাঁরা অগ্রসর হলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ জানালেন, আমাদের দু'জনের জবানবন্দী যাতে দু'রকম না হয়, তার জন্যে নরেনের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

অতি সমীচীন কথা। দু'জন রাজসাক্ষী যদি দু'রকম কথা বলে, তাহলে আসামীদের ব্যারিস্টারের জেরায় মামলা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। জেলের কর্তারা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে গোঁসাই-এর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। হিগিন্‌স বলে শ্বেতাঙ্গ কয়েদী জেলের কর্তাদের খুব বিশ্বাসের পাত্র ছিল, গোঁসাই-এর রক্ষী ও প্রহরীরূপে তাকে ঠিক করা হলো। হাজার হোক রাজার জাতের লোক। কোন দেশী লোকের ওপর এ ভার দেওয়া নিরাপদ নয়। হিগিন্‌সের সঙ্গে গোঁসাই হাসপাতালের ঘরে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলো।

সত্যেন্দ্রনাথ আর নরেন গোঁসাই…কিভাবে প্রথম দর্শনে পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করেছিল, তার কোন নজীর কোথাও নেই। যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে বোঝা যায়, সত্যেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চেয়ে নরেন গোঁসাই তার ব্যথার ব্যথী, অন্ধকারে পথভ্রান্ত পথিক-বন্ধুকেই দেখতে পায়। গোঁসাই-এর মনে কোন সন্দেহ ছিল না, সে স্থির জানতো এ মামলা থেকে সে মুক্তি পাবেই। সে বলেছিল, আমার বাবা

মামলার রাজা···শত শত মামলা তিনি চালিয়েছেন···তিনি ঠিক আমাকে বার করে নেবেন।

তার মনের কথা বলবার সুযোগ পেয়ে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

···বাবা বলেছেন আমাকে বিলেতে পাঠাবেন। গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করবে। বিলেতে নতুন করে আমার জীবন আরম্ভ করবো··

কপালে সিঁদুরের টিপ, বলির পাঁঠা যেমন হাড়িকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে কচি ঘাস দেখে খাবার জন্যে নির্ভাবনায় ডাকতে থাকে, গোঁসাই তেমনিভাবে বলে চলে, তার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনার কথা···

সত্যেন্দ্রনাথ স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে দেখেন, দেখেন তাঁর জাতির ইতিহাসের সমস্ত কলঙ্ক সামনেই সেই নির্লজ্জ মুখে ফুটে উঠেছে—

পাঁচ

বারীন্দ্রকুমার জেল ভেঙে পালাবার পরিকল্পনায় জেলের ভেতরে থেকেই দুটো রিভলবার যোগাড় করেছিলেন। উঠোনের টালির তলায় মাটির ভেতর লুকিয়ে পুঁতে রেখেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ চোরের উপর বাটপাড়ি করবার প্লান করেছিলেন। কাউকে না জানিয়ে সেই দুটি রিভলবারের সাহায্যে তিনি নরেন গোঁসাইকে বধ করবার পরিকল্পনা গড়ে তুলেছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধু হেমচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং হেমচন্দ্রের মারফত কানাইলালও এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন। তাঁরা যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন, তাতে একজনের হাত থেকে যদি কোন রকমে গোঁসাই বেঁচে যায়, দ্বিতীয়জনের হাতে তাকে মরতেই হবে। নরেন গোঁসাই কিছুতেই বেঁচে থেকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে পারবে না···তাঁরা তো মরবেনই···কিন্তু কারাগারের বাইরে এখনো যে-সব বিপ্লবী অশৃঙ্খলিত হয়ে আছে, তাদের রক্ষা করতেই হবে। বিপ্লবকে, বিপ্লব-দলকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। আদালতে সাক্ষ্য দেবার আগেই গোঁসাইকে বধ করতে হবে। তাই দুই বন্ধুতে স্থির করেছিলেন, ১লা সেপ্টেম্বর, সোমবার, সকালে উদ্যোগ শেষ করতে হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ হাসপাতালে চলে গেলে একদিন সুযোগ বুঝে হেমচন্দ্র কানাইলালকে দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে রিভলভার পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। হঠাৎ কানাইলালের পেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হলো। ডাক্তার এলেন। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করা দরকার। স্ট্রেচার এলো। কানাইলাল মহাকালীকে স্মরণ করে কম্বলের তলা থেকে রিভলবারটা কোমরে গুঁজে নিলেন।

কানাইলাল হাসপাতালে গিয়ে পৌছতেই চক্রান্ত অনুযায়ী সত্যেন্দ্রনাথ ওয়াডারকে ডেকে পাঠালেন। কানে কানে বললেন এই সুযোগ, তিনি একবার কানাইলালকে বাজিয়ে দেখতে চান, যদি সে এপ্রুভার হতে চায়!

কানাইলালের স্ট্রেচার সত্যেন্দ্রনাথের বেডের পাশেই আনা হলো। সত্যেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে ইঙ্গিত করতে ওয়ার্ডার সরে গেল। এ সব কথা গোপনেই হওয়া উচিত। সেই কয়েক মুহূর্তের অবকাশের মধ্যে কানাইলালের কোমর থেকে রিভলবার সত্যেন্দ্রনাথের কোমরে চলে গেল।

বাইরে থেকে ওয়ার্ডার শুনতে পেলেন, কানাইলাল চীৎকার করে বলছেন, তুমি নরাধম, তাই আমার কাছে এ প্রস্তাব করতে পারলে। যদি এটা জেল না হতো, তাহলে···

ওয়ার্ডার বুঝলেন, না ব্যাপার সুবিধের নয়। তাড়াতাড়ি কানাই-লালকে স্ট্রেচারসুদ্ধ সরিয়ে আনা হলো।

সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃপক্ষকে জানালেন, দরকার নেই, আমাদের দু'জনের statementই যথেষ্ট হবে···তবে statement-টা লিখে ফেলা দরকার··· মৌখিক আলোচনা আমরা করেছি বটে কিন্তু তাতে গোলমাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে···আর দেরী করা ঠিক হবে না, কানাইলাল জেনে গিয়েছে···কাল সকালেই আপনি গোঁসাইকে নিয়ে আসুন···আর statement লেখবার জন্যে কিছু কাগজ আর কলমের ব্যবস্থা করবেন···

ছয়

পরের দিন সকালবেলা। ১লা সেপ্টেম্বর, সোমবার। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেই কানাইলাল টালির তলা থেকে দ্বিতীয় রিভলবারটা তুলে নিয়ে রাত্রিতে মাথার শিয়রে কম্বলের তলায় রেখে···সেদিন রাত্রিতে কানাইলাল কি ঘুমিয়েছিলেন? কল্পনার চোখে দেখি, উনিশ শো আটের আগস্টের সেই শেষ দিনের রাত্রিশেষে কারাগারের লাল পাঁচিলের ওপারে উঠ্ছে প্রভাতের রক্ত-রবি, তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ হাস-পাতালের দোতলা থেকে চেয়ে দেখেন সেই রক্ত-আলোর দিকে, কালের যবনিকার আড়াল থেকে যেন দেখতে পাই দুটি হাত পূর্ব-আকাশের দিকে প্রণামবদ্ধ হয়ে উঠেছে, অকম্পিত দুটি হাত, অস্ফুট কানে আসে শান্ত একটি প্রণামমন্ত্র, বন্দেমাতরম্!

সকাল হতেই পূর্ব-ব্যবস্থা মত রক্ষী হিগিন্সের সঙ্গে নরেন গোঁসাই আসে হাসপাতালে সত্যেন্দ্রনাথের ঘরে। সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তুত হয়েই বসে ছিলেন। হিগিন্স কাগজ-কলমের ব্যবস্থা করে দিয়ে ঘরের বাইরে চলে আসে।

সেদিন সেই মুহূর্তে সেই দু'জনের কি কথাবার্তা হয়েছিল, তার কোন নজীরই কোথাও নেই। পাবারও কোন উপায় নেই। যদি কোন কথা হয়ে থাকে, তা শুধু শুনেছিল মহাকাল।

সত্যেন্দ্রনাথ একবার শুধু উঠে জানালা দিয়ে নিচে দেখলেন, হাঁ, ঠিকই আছে, সহযাত্রী বন্ধু ঠিক সময়ই উঠে সজাগ হয়ে আছে। উঠোনের একধারে কানাইলাল একমনে দাঁতন করে চলেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঘরের ভেতরে ফিরে আসেন।

নরেন গোঁসাই বলে, তাহলে আরম্ভ করা যাক···

সত্যেন্দ্রনাথ কোমরে হাত দিয়ে বলেন, হাঁ···আরম্ভ করা যাক··· বিশ্বাসঘাতক···জাতির শত্রু···

কোমর থেকে রিভলবার বার করে নিমেষের মধ্যে গোঁসাইকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লেন···

গোঁসাই আর্তনাদ করে লাফিয়ে একেবারে সিঁড়িতে গিয়ে পড়লো …এক লাফে সিঁড়ি থেকে নীচে গিয়ে পড়লো…

সত্যেন্দ্রনাথ তাকে অনুসরণ করে ছুটতে আরম্ভ করলেন…হিগিন্‌স বাধা দিল…সত্যেন্দ্রনাথ হিগিন্‌সকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লেন…আহত হয়ে হিগিন্‌স পড়ে গেল…

কানাইলাল নীচে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। গোঁসাই ছুটে পালাতেই তিনি রিভলবার বার করে গোঁসাইকে তাড়া করে চল্লেন…

গুলীর আওয়াজে দেখতে দেখতে জেলের পাগলাঘণ্টি বেজে উঠলো …চারদিকে সোরগোল পড়ে গেল। জেলার যোগেনবাবু হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছিলেন, সামনেই দেখেন দুটি ক্ষুধিত বন্য শার্দূল, রিভলভার হাতে সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল। সামনেই কতকগুলো বেঞ্চি পড়ে ছিল। জেলার নিমেষের মধ্যে সেই বেঞ্চির তলায় গিয়ে আত্মগোপন করলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ আর কানাইলালের আর কোন লক্ষ্য ছিল না, শুধু গোঁসাইকে অনুসরণ করা। গোঁসাই অসহায়ভাবে একটা নর্দমার ধারে পড়ে গেল। সত্যেন্দ্রনাথ আর কানাইলাল উন্মাদের মতন তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েন, চীৎকার করে ওঠেন, এমনি করেই বিশ্বাসঘাতক মরে!

একটার পর একটা রিভলভারে বাকি যতগুলো গুলী ছিল গোঁসাই-এর দেহে বিদ্ধ করেন। চীৎকার করে ওঠেন…

"বাংলাদেশে আর যেন কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে সাহস না পায়!"

গুলী ফুরিয়ে গেলে দুই বন্ধুই রিভলভার দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন finished!

সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরীরা এসে দুজনকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেললো।

রক্তাক্ত আবর্জনার মত নরেন গোঁসাই-এর দেহ তখন পড়ে ছিল নর্দমায়।

সাত

আলীপুরের সেসন জজ মিঃ এফ. আর. রো-র এজলাসে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার নতুন অপরাধে বোমার মামলার আসামী সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলালের আলাদা করে বিচার হলো। আসামী দু'জনের পক্ষ থেকে উকীল নরেন্দ্রনাথ বসু আদালতে আবেদন করেন, যেন কয়েদীর পোশাকের পরিবর্তে সাধারণ ভদ্রলোকের পোশাকে অভিযুক্ত দু'জনকে আদালতে আনা হয়।

সে-আবেদন বিচারক গ্রাহ্য করেন নি। কয়েদীর পোশাকে সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল আদালতের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের বাঁচাবার জন্যে উকীলেরা আইনের ছিদ্রপথ খুঁজছিলেন। কিন্তু তাঁরা দু'জন তখন জীবন্ত অবস্থাতেই মৃত্যুর ওপারে চলে গিয়েছিলেন। জীবন্মুক্ত।

বিচারক কানাইলালকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কিছু বলবার আছে ?

শান্তকণ্ঠে কানাইলাল বলেন, না!

—তোমার পক্ষে কোন উকীল আছে ?

—না!

—তুমি কি চাও, আদালত থেকে তোমার পক্ষে একজন উকীল দেওয়া হোক্!

সেই একই স্বল্পাক্ষর উত্তর. না!

বিচারক তারপরে সত্যেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কিছু বলবার আছে!

সত্যেন্দ্রনাথ বলেন, আমি কোন দোষ করিনি, কারুর কাছে!

জেরার তৃতীয় দিন বিচারক কানাইলালকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেকথা বলেছিলে, সেকথা প্রত্যাহার করতে চাও ?

কানাইলাল তেমনি শান্তকণ্ঠে বল্লেন, হাঁ, প্রত্যাহার করতে চাই! উত্তেজনার বশে ভুল কথা বলেছিলাম!

আদালতসুদ্ধ লোক কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

বিচারক জিজ্ঞাসা করেন, এখন তাহলে কি বলতে চাও ?

কানাইলাল বলেন, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আমি বলেছিলাম আমি আর সত্যেন দু'জনে নরেন গোঁসাইকে খুন করেছি। সেকথা আমি প্রত্যাহার করে নিতে চাই, আজ আমি বলছি, আমি একাই নরেন গোঁসাইকে খুন করেছি, তাকে হত্যা করার সমস্ত দায়িত্ব একা আমার। এই আমার শেষ কথা।

সমস্ত আদালত নির্বাক, নিস্পন্দ। বিদেশী বিচারকও কয়েক মুহূর্ত নির্বাক স্থির হয়ে যান।

তারপর রায় দিলেন, দু'জনেরই মৃত্যুদণ্ড।

ফাঁসির আগের মুহূর্তে আইনের প্রথামত মৃত্যু-পথ-যাত্রী বন্দীকে তাঁর ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী প্রার্থনার অবকাশ দেওয়া হয়।

সত্যেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁর এই সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আছে কি না!

সত্যেন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছিলেন তাঁর পিতৃব্য ঋষি রাজনারায়ণ বসুর আদর্শে। ধর্ম আর জীবন যাঁর কাছে ছিল অভিন্ন। তাই অন্তিম মুহূর্তে সত্যেন্দ্রনাথ জানালেন, আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীকে একবার দেখতে চাই।

অশ্রু-সজল-চোখে বৃদ্ধ আচার্য এলেন কারাগারে।

লোহার গরাদের ওপারে দাঁড়িয়ে সৌম্যদর্শন ভারত-ঋষি···লোহার গরাদের এপারে দাঁড়িয়ে ভারতের নব-জাগ্রত তরুণ।

শান্তকণ্ঠে তরুণ বলে, হে আচার্য যাবার সময় আমাকে দিন্ শান্তি-মন্ত্র।

সেই লৌহ-মৃত্যু-বাসরে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী প্রার্থনা করেন, হে যাত্রী, যাবার সময় তোমার পিতা, তোমার পিতৃব্যকে স্মরণ করো। তাঁরা দুজনেই ছিলেন মুক্তপ্রাণ মহাপুরুষ। তুমি আজ চলেছ সেই আনন্দময় পিতৃসকাশেই।

যুক্তকরে মৃত্যুপথযাত্রী স্মরণ করে পিতৃপুরুষদের।

এভারেস্ট চূড়ায়

এক

আজ থেকে আশী বছর আগে। তখনো তুঙ্গ-শৃঙ্গ পথে আসেনি য়ুরোপ থেকে কোন অভিযানকারী।

বিশ হাজার ফিট উঁচুতে অতি দুর্গম কাংলাচেন গিরিবর্ত্মের দিকে এগিয়ে চলেছে তিনটি প্রাণী। সামনে যিনি এগিয়ে চলেছেন তিনি বাঙালী, তাঁর পেছনে যিনি তিনি একজন তিব্বতীয়, তৃতীয় হলো একজন শেরপা নাম ফুরচঙ্। বাঙালীর নাম শরৎচন্দ্র দাশ, তিব্বতীয়ের নাম উগায়েন-গিয়াৎস্থ।

উনিশ হাজার ফিট ছাড়িয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো তীব্র শ্বাসকষ্ট। প্রত্যেক পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে দম যেন ফুরিয়ে আসে। সামনে যতদূর চোখ যায়, চিরশুভ্র তুষার···সেই অমলিন তুষারের মুকুরে সূর্য-কিরণ প্রতিফলিত হয়ে চোখকে অন্ধ করে দেয়···তিনজনের মধ্যে মাত্র একটা সবুজ চশমা। চোখ বন্ধ করে তিনজন কিছুক্ষণ করে বিশ্রাম নেয়, আবার চলে। অতি কষ্টে। ক্ষিদেয় শরীর ভেঙে পড়ে। সঙ্গে মাত্র শুকনো জনার। শরৎচন্দ্র বহু কষ্টে চা তৈরী করেন। সেই চা আর শুকনো জনার।

বিকেলের দিকে তাঁরা বিশ হাজার ফিটের কাছাকাছি গিয়ে উঠলেন। হঠাৎ এমন সময় চারদিক থেকে জেগে ওঠে যেন প্রলয়ের আর্তনাদ। নিমেষের মধ্যে সব অন্ধকার হয়ে যায়। চারদিকে ছুটতে আরম্ভ করে তুষার। শুরু হয় ভয়াবহ তুষারঝঞ্ঝা। মনে হয়, তৃণখণ্ডের মত সেই তিনটি প্রাণীকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে ঝড়ে। যে কোন উপায়ে মাথা গোঁজবার একটা আশ্রয় চাই। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে সৌভাগ্যবশতঃ চোখে পড়লো, পাহাড়ের গায়ে একটা গর্ত···এক রকম পাহাড়ী শৃগালের গর্ত···পরিত্যক্ত সেই গর্তের ভেতর ঢুকে কোন রকমে

তাঁরা সেদিনকার রাত্রির তুষার-আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করেন…।

মাত্র আশী বছর আগে হিমালয়ের বিশ হাজার ফিট উঁচুতে শরৎচন্দ্রের দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী আজ আমরা প্রায়ই ভুলে গিয়েছি। সেদিন শরৎচন্দ্র যখন হিমালয়ের পথে এই অভিযানে বেরিয়েছিলেন, তাঁর পেছনে কোন পার্বত্য-ক্লাবের কোন সহযোগিতা ছিল না, পর্বত-আরোহণের সাজ-সজ্জারও কোন বালাই ছিল না…শুধু তাঁর অদম্য দুঃসাহসিকতা আর তাঁর তিব্বতী বন্ধু উগায়েন-গিয়াৎসুর সহযোগিতা। উগায়েন-গিয়াৎসু এত মোটা ছিলেন যে, আজকের কোন পর্বত-অভিযানকারীর দল তাঁর চেহারা দেখেই তাঁকে বাতিল করে দিতো। তবে, সেদিনও তাঁদের সঙ্গে ছিল একজন শেরপা, শেরপা ফুরচুঙ্।

শরৎচন্দ্রের লেখা পড়লে জানা যায়, ফুরচুঙ্ না থাকলে, তাঁরা দু'জনে হয়ত হিমালয়ের তুষার-পথে কোথাও সমাহিত হয়ে থাকতেন। তাঁদের তিনজনের যা কিছু জিনিসপত্র, তা অধিকাংশ সময়ই ফুরচুঙ্ বহন করতো। মাঝে মাঝে এমন সঙ্কটজনক অবস্থা আসতো, যখন ফুরচুঙ্ পিঠে করে তাঁদের নিয়ে ওপরে উঠেছে, তাঁদের পৌঁছে দিয়ে আবার নেমে এসে মোট নিয়ে গিয়েছে। সমস্ত হিমালয়-অভিযান এই শেরপাদের পিঠের ওপর এগিয়ে গিয়েছে। শেরপারা অশিক্ষিত, তাদের দেহ ও মনে যে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি আর দুর্জয় দুঃসাহসিকতা আছে, তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করবার শিক্ষা তারা পায়নি, তাই তারা হিমালয়-অভিযানের ইতিহাসে শুধু ভারবাহী হয়েই ছিল, কিন্তু কোন হিমালয়-অভিযানই এই শেরপাদের ছাড়া এক পাও এগোতে পারতো না। আজ হিলারীর সঙ্গে শেরপা তেনজিঙ্গ যে এভারেস্টের চূড়ায় পদার্পণ করেছেন, এর মধ্যে ইতিহাস-পুরুষের সুবিচারেরই নির্দেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্রের হিমালয়-অভিযানের কাহিনী সরকারী দফ্তরের গোপনীয় ফাইলের আড়ালে বহুদিন পর্যন্ত চাপা ছিল… তিনি যে দু'

দু'বার নিঃসঙ্গ অবস্থায় সিকিম থেকে লাসা পর্যন্ত গিয়েছেন আর এসেছেন, হিমালয়ের তুঙ্গ-শৃঙ্গ অঞ্চলের বহু তুষারক্ষেত্রে তাঁরই প্রথম পায়ের ছাপ পড়েছে···হিমালয়ের অগঠিত মানচিত্রের বহু জায়গার নাম যে তাঁরই দেওয়া···হিমালয়ের বিশ হাজার ফিট পর্যন্ত তিনিই এ যুগে পৌঁছতে পেরেছিলেন, সে কথা যে কোন কারণেই হোক, পরবর্তী হিমালয়-অভিযানের কাহিনীর আড়ালে চাপা পড়ে যায়। যে সব শিক্ষিত য়ুরোপীয় হিমালয়-আরোহীর দল পরে এই পথে এসেছেন, তাঁরা হিমালয়-অভিযানের যে সব ইতিহাস লিখেছেন, তাতে তাঁরা য়ুরোপীয় কালচারের সভ্যতার মর্যাদা রেখে একজন সামান্য কুলীরও দান অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে গিয়েছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র পর্বত-আরোহণকারী ছিলেন না বলে তাঁর কথা তাঁরাও বাদ দিয়ে গিয়েছেন। টেকনিক্যাল দিক থেকে শরৎচন্দ্রকে পর্বত-আরোহণকারী না ধরলেও, হিমালয়ের রহস্যাবৃত তুঙ্গ-পথে শরৎচন্দ্রের প্রাচীনতর কীর্তি কম রোমান্টিক নয়। আজ সময় এসেছে, জাতির এই সব বিস্মৃতপ্রায় কীর্তিমানদের নাম ও পরিচয় জাতির মানসিক মানচিত্রে যথাযোগ্য স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার। সে কাজ যখন শুরু হবে, তখন আমরা দেখতে পাবো আধুনিক কালের দূরদুর্গম পথে অভিযানকারীদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের নামের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত কিষণ সিং নইন সিং, মোল্লা আতা মুহম্মদ প্রভৃতিরও নাম এসে পড়েছে।

দুই

ভেবেছিলাম সদ্য-বিজয়ী হিলারী আর তেনজিঙ্গের কথা বলবো। কিন্তু এসে গেল শরৎচন্দ্রের কথা। তার একটা বিশেষ কারণ আছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে আল্‌প্‌সের চূড়ায়, ককেশাসের শৃঙ্গে, মধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে, আফ্রিকার দুর্গম অন্তরে, দূর মেরু-অঞ্চলে, হিমালয়ের মেঘচুম্বী শিখরে শিখরে, যেখানে পড়ে আছে অনাবিষ্কৃত রহস্য, সেখানেই দলের পর দল ছুটেছে পাশ্চাত্য দেশের দুঃসাহসিকের দল···দুর্জয়ের দুর্গম

পথে। এই অবিরাম অবিচ্ছেদ মৃত্যুঞ্জয় অভিযান বিংশ-শতাব্দীর মানুষের মনে জাগিয়ে তুলেছে মানব-সম্ভাবনার এক মহাকাব্যকে…জ্বালিয়ে তুলেছে মানুষের মনে সর্ব-জড়ত্ব-নাশা প্রাণের শুভ্র শিখাকে।

শিশুকাল থেকে এই মৃত্যুঞ্জয়ী দুঃসাহসিকদের পদাঙ্ক আমি পুঁথির পাতায় অনুসরণ করে এসেছি, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁদের কাহিনী পড়েছি এবং আমার মতন এ যুগের অধিকাংশ ছেলেমেয়ের চোখেমুখে দেখেছি, এসে পড়েছে এই শুভ্র-শিখার আলো। সেই সঙ্গে ভেতরের দিকে চেয়ে দেখেছি, মনের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে একটা বিশ্বাস, এই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রণের খেলায় মাততে পারে শুধু ওরা…অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা …আর সেই সঙ্গে নিজের দেশের লোকদের দিকে চেয়ে আপনা থেকে পড়েছে একটা দীর্ঘশ্বাস, মনে হয়েছে, যে উপাদানে গড়া য়ুরোপীয় মেরুযাত্রীর দেহ-মন…আমাদের এই ভারতীয় দেহ-মনের গঠনে বুঝি নেই সে উপাদান।

তাই যখন দেখি, আজ দুই যুগ ধরে আমাদের ভাষায় শিশুদের জন্যে, কিশোর-কিশোরীদের জন্যে বিচিত্র সব এ্যাডভেঞ্চারের কল্পিত কাহিনী বা উপন্যাস লেখা হচ্ছে, সে-সব কাহিনীর নায়ক বা নায়িকা হলো কোন বাঙালী তরুণ বা কোন ভারতীয় তরুণী, যারা অবলীলাক্রমে উপন্যাসের পাতার ভেতর দিয়ে সাহারা মরুভূমিতে মরু-দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করেছে, লিভিংস্টোন আফ্রিকার যে-জঙ্গলে ঢুকতে পারেন নি, সেই জঙ্গলের ভেতরে অবলীলাক্রমে গিয়ে সিংহের সঙ্গে লড়াই করছে, গণ্ডারের পিঠে লাগাম লাগিয়ে ছুটছে, নর-খাদকদের অগ্নি-উৎসবে করোটির মালা পরে নাচছে, নায়গ্রা-জলপ্রপাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে গাছের ডাল মনে করে অজগরকে জাপটে ধরে উঠে পড়ছে, দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে ঠ্যাং-গুলি খেলছে…তখন বুঝতে পারি, আমাদের রুগ্ন মনে এই পাশ্চাত্য নব-বীরত্বের প্রভাব কি ভয়াবহ আকারে ফুটে উঠেছে। এই বিকৃতি, এই আত্ম-প্রবঞ্চিত মিথ্যার বিষ থেকে আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরীদের রক্ষা করা উচিত এবং তার জন্যে যদি প্রয়োজন হয়, আমার ধারণা, আইনের সাহায্য নেওয়া দরকার। আইন শুধু যৌন-গত

অশ্লীলতাকে অশ্লীলতা বলে স্বীকার করে, কিন্তু সাহিত্য-ধর্মে এই জাতীয় মিথ্যা হলো সবচেয়ে বড় মারাত্মক অশ্লীলতা, ইংরেজীতে যাকে বলে vulgarity.

এই প্রসঙ্গে, আর একটা কথা বলা দরকার। আমার নিজের মনে পাশ্চাত্ত্য জাতিদের দেহ-মনের গঠনের বিশেষ উপাদান সম্বন্ধে যে বিশ্বাস একদিন জেগে উঠেছিল এবং যে-বিশ্বাস আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে অল্প-বিস্তর ছড়িয়ে আছে, যতই এগিয়ে চলেছি ততই সে-বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে আসছে। জগতে একটা বিশেষ জাতি আছে এবং একমাত্র সেই জাতিরই বিশেষ কোন গুণ আছে, যা অন্য কোন জাতির নেই, বিজ্ঞান এসে এই প্রাচীন জাতিগত আত্মতৃপ্তিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। যদিও বহু ইতিহাস লেখা হয়েছে তবুও এই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় সবে মাত্র শুরু হয়েছে। জাতিতে জাতিতে এই পরিচয়কে জাতিপ্রেমে-অন্ধ ঐতিহাসিকেরাই এবং জাতি-স্বার্থে শৃঙ্খলিত রাজনৈতিকেরাই তৈরীকরা একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিকৃত করে এসেছেন।

আজকের শতাব্দীতে মানুষের মনে এক নূতন চেতনা জেগেছে, যার আলোয় নতুন করে মানুষ এই পৃথিবীকে দেখছে এবং সেই নব-চেতনার আলোয় বিশেষ জাতির বিশেষ শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে দাবি ঠাকুরমার কাহিনীতে পরিণত হতে চলেছে। গত চল্লিশ বছরের হিমালয়-অভিযানের বাস্তবতার ভেতর দিয়ে এই সত্যই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আজ এভারেস্টের চূড়ায় দাঁড়িয়ে হিলারী আর তেনজিঙ্গ সেই সত্যকেই প্রমাণিত করলেন।

হিমালয়ের পাদমূলে অভিজাত য়ুরোপীয় আর অশিক্ষিত শেরপার যে-দূরত্ব ছিল, পঁচিশ হাজার ফুট উঁচুতে নিয়ে গিয়ে গিরিরাজ অক্সিজেনহীন অতি সূক্ষ্ম বায়ুস্তরে তাকে আছড়ে ভেঙে ফেলে দিয়েছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা যাঁরা, হিমালয়ের ছায়া থেকে বহু দূরে, গ্রীষ্মদগ্ধ প্রান্তরে ঘরে বসে সেই সংবাদ পড়ছি এবং তার ওপর মন্তব্য করছি, তাঁদের মনে হিমালয়ের এই প্রভাব এখনো এসে পড়েনি।

তাঁদের মধ্যে অনেকেই এভারেস্ট বিজয়ে গর্বিত হয়ে শেরপা তেনজিঙ্গ যে domiciled বাঙালী এবং সেই জন্যেই বাঙালী এবং সেই জন্যেই এভারেস্টের চূড়ায় এই প্রথম একজন বাঙালীর পায়ের ছাপ পড়লো, সেই কথাই চীৎকার করে এমন করে বলছেন যে, পাড়াসুদ্ধ লোক হাসছে, তাঁদের কানে যাচ্ছে না। আজ বাঙালীর এই নির্লজ্জ রসিকতায় হিমালয় উঠেছে অট্টহাস্য করে। যাঁরা শোনবার তাঁরা শুনছেন এই পাথুরে অট্টহাসি।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, আইনস্টাইনের একটা কথা। তাঁর থিওরী অফ্ রিলেটিভিটী সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেই সময় তিনি জার্মানীতে। নিজের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সেই সময় তিনি লিখেছিলেন, আজ যদি আমার থিওরী অফ্ রিলেটিভিটী সত্য বলে গৃহীত হয়, তাহলে সারা জার্মানী আমাকে জার্মান বলে অভিনন্দিত করবে, যদি প্রমাণিত হয় সেটা ভুল তাহলে সারা জার্মানী একবাক্যে ঘোষণা করবে আমি ইহুদী।

তাই শেরপা তেনজিঙ্গ আজ বাঙালী।

মৃত্যুর মুখোমুখি এই সব অভিযান বেদনার বাস্তবতায় বারে বারে অভিযানকারীদের মনে ভেঙে দিয়েছে জাতি, দেশ ও সম্প্রদায়ের ছোট ছোট পাঁচিল……।

পৃথিবী ছাড়িয়ে, মেঘলোক ছাড়িয়ে, তুষারের মৃত্যু-প্রাচীর ছাড়িয়ে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর এভারেস্টের চূড়ায় গিয়ে যে দাঁড়ায়, সে কোন্ চোখে পৃথিবীকে দেখে? যে-চূড়ায় সর্বপ্রথম পৃথিবীকে স্পর্শ করে সূর্যের আলো নেমে আসে প্রতিদিনের প্রান্তরে, সে-চূড়ায় তেনজিঙ্গ আর হিলারীর সঙ্গে আমিও কি ছিলাম না?

তিন

১৯৫৩ সালের ২৯শে মে সকাল সাড়ে এগারোটা।

এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ায়, যেখানে সেদিনও পর্যন্ত পড়ে নি কোন

মানুষের পায়ের চিহ্ন, সেখানে এসে দাঁড়ালো একজন মানুষ, পৃথিবীর অতি-সাধারণ স্তরের একজন মানুষ, শেরপা তেনজিঙ্গ নোর্‌কে। উঠে দাঁড়িয়েই তেনজিঙ্গ হাত বাড়িয়ে আর একজন মানুষকে উঠে আসতে সাহায্য করলেন, দুঃসাধ্য দুর্গম পথে তাঁর একক সহযাত্রী, এডমণ্ড পার্সিভ্যাল হিলারী!

নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশের তলায়, দিগন্তবিস্তৃত নিঃসীম নির্জনতার মধ্যে মানবীয় বীর্যের সর্বোচ্চ শিখরে এসে পৌঁছল দুটি মানুষ। মানবীয় সম্ভাবনার মহারহস্যের সাগরের তলায় অদৃশ্য শুক্তির সংগোপন গর্ভে জন্ম নিলো মানব-মনের নব-মুক্তা! সেই একটি দুর্লভ মুহূর্তের আলোক-তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয়ে উঠলো, সর্ব-প্রয়োজন আর সর্ব-লাভ-লোকসানের অতীত মানুষের চলমান ইতিহাসের প্রাণবাণী, আমি পৌঁছিয়েছি!

সেদিন সেই একটি শুভ্র-নীল মুহূর্তে, তেনজিঙ্গ আর হিলারীর সঙ্গে সঙ্গে নিখিল নর-নারীও গিয়ে দাঁড়ালো দুঃসাধ্যতার সর্বোচ্চ শৈলশৃঙ্গে।

চার

আজ থেকে একশো চার বছর আগে, সার্ভে অব্‌ ইণ্ডিয়ার অফিসে বসে একজন বাঙালী, মানচিত্রহীন হিমালয়ের সার্ভেম্যাপে হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গের আঙ্কিক অবস্থান হিসাব করে দেখছেন। তাঁর সামনে বড় বড় নীল কাগজে ত্রি-কোণ আকারে বিভিন্ন শৃঙ্গের অবস্থান রয়েছে। তার মধ্যে একটা শৃঙ্গের ওপর তাঁর নজর গিয়ে পড়লো, মানচিত্রে তার নাম আর পরিচয় দেওয়া আছে, ল্যাটিন সংখ্যায় পনেরো। বিভিন্ন শৃঙ্গের উচ্চতা অঙ্ক কষে বার করতে গিয়ে তিনি দেখলেন, সেই নামহীন পনেরো নম্বর শৃঙ্গের উচ্চতা হলো ২৯০০২ ফুট, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বত-শৃঙ্গ। আনন্দের আবেগে তিনি তক্ষুণি ছুটলেন, সার্ভেয়ার-জেনারেল স্যার এ্যাড্রু ওয়াফের ঘরে। ঘরে ঢুকেই উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, স্যার, আমি জগতের সবচেয়ে উঁচু পর্বত-শৃঙ্গের আবিষ্কার করেছি।

দেখা গেল, সেই সার্ভে-অফিসারের সিদ্ধান্ত মিথ্যা নয়…কাগজে-

কলমে তিনি সত্যই পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত-শৃঙ্গের সন্ধান পেয়েছেন··· সেই নামহীন পনেরো নম্বর শৃঙ্গই পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বত-শৃঙ্গ।

ভূতপূর্ব সার্ভেয়ার-জেনারেল স্যার জর্জ এভারেস্টের নামে সেই নামহীন পনেরো নম্বর শৃঙ্গের নাম রাখা হলো মাউণ্ট এভারেস্ট।

সরকারী দফ্তরের কাগজের আড়ালে চাপা পড়ে গেল আবিষ্কর্তা সেই বাঙালী অফিসার, রাধানাথ শিকদারের নাম। সার্ভের অঙ্কের অরণ্যের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এভারেস্ট, হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া, পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ, ভূগোলের বিস্ময়। অ্যাডভেঞ্চার-পিপাসু য়ুরোপীয় পর্বত-আরোহণকারীদের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো তার ওপর। তার আগে, য়ুরোপের আল্‌পস্-পর্বতমালার প্রত্যেক শিখরেই তারা উঠেছে··· আল্‌পস্ তাদের দিয়েছে পর্বত-আরোহণের আনন্দ···খেলার থ্রিল্···তাই তারা আল্‌পস্-ময় সুইজারল্যাণ্ডের নাম রাখলো, দি প্লে-গ্রাউণ্ড অফ্ য়ুরোপ। পর্বত-আরোহণের নতুন থ্রিলের সন্ধানে তারা হিমালয়ের দিকে চাইলো, কাশ্মীর থেকে আসাম পর্যন্ত দু' হাজার মাইলব্যাপী পড়ে আছে হিমালয়, চূড়ার পর চূড়া···নাঙ্গা পর্বত, নন্দা দেবী, ক্যামেট, ত্রিশূল, কৈলাস, গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা, কে-টু, এভারেস্ট···পর্বত-আরোহণকারীর নন্দন-ভূমি। দলে দলে পর্বত-আরোহণকারীরা আসতে শুরু করলো ভারতবর্ষে, হিমালয়ের তুষার ক্ষেত্রে। কিন্তু হিমালয়ের সঙ্গে যতই তাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হতে লাগলো, ততই স্পষ্টভাবে তাঁরা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলেন, হিমালয় আল্‌পস্ নয়···হিমালয়ের শৃঙ্গে ওঠা পর্বত-আরোহণের খেলা নয়। তাই হিমালয়-অভিযানকে ঘিরে ধীরে ধীরে বিংশ-শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক মানুষের চেতনায় জেগে উঠলো এই বিচিত্র পর্বত সম্পর্কে এক অভিনব মিষ্টিক চেতনা, যে-চেতনার সঙ্গে ভারতবর্ষের সভ্যতার আছে রক্ত-সংযোগ। এই পর্বত-অভিযানে এসে য়ুরোপ প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারলো, হিমালয়কে ভারতবর্ষ কি চোখে দেখে, কেন দেখে······কেন কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারত-কবিরা এই তুষার-মৌলি নিস্তব্ধ বিশালতাকে ভারতবর্ষের তপস্যার প্রতীক বলে বন্দনা গেয়েছেন। সেইজন্যে হিমালয়-অভিযানে যে

ঔৎসুক্য আর কৌতূহল জেগে ওঠে, সে শুধু একটা পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার অ্যাডভেঞ্চারের থ্রিল নয়, তার মধ্যে জেগে ওঠে যুগ-যুগান্তরসঞ্চিত হিমালয়ের সমস্ত রোমান্স ও রহস্য। হিমালয়ের চূড়ায় ওঠা যখন শেষ হয়ে যাবে, অভিযানকারীদের পায়ের চিহ্ন তখন আবার ঢাকা পড়ে যাবে চির-তুষারে, কিন্তু তাঁদের পায়ের শব্দে আজ বিংশশতাব্দীতে ভাঙলো হিমালয়ের যে মৌনতা, রুদ্ধ-দ্বার চির-রহস্য-ক্ষেত্রে তাঁদের পায়ে পায়ে জেগে উঠলো যে-পথ, মানস-চক্ষে আজ দেখছি, সে-পথের ওপর দিয়ে চলেছে আগামী পৃথিবীর মানুষ, অস্ত্র হাতে নয়, প্রদীপ হাতে…… শত-শতাব্দী ধরে হিমালয় তাব স্তব্ধ বিশালতায় সঞ্চিত করে রেখেছে বিষ-বাণ-দগ্ধ মানুষের জন্য যে বিশল্যকরণী, তার সন্ধানে।

তাই আজ এই এভারেষ্ট-অভিযানের কাহিনী আমার কাছে শুধু পর্বত-আরোহণের কাহিনী নয়……এ হলো মানুষের সভ্যতায় হিমালয়ের নব-জন্ম কাহিনী। হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় যে-মানুষ এসেছে, সে-মানুষই একদিন খোঁজ করবে হিমালয়ের আত্মাকে। এভারেষ্ট অভিযানে তারই সূচনা। বিংশ-শতাব্দীর দগ্ধ সমতল-প্রান্তরে তাই আজ এসে পড়েছে হিমালয়ের ছায়া।

হিমালয়ের সমস্ত বিশালতা, সমস্ত রহস্য, সমস্ত দুর্গমতার প্রতীক হয়েছিল এভারেস্ট। এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে গিয়ে মানুষকে বুঝতে হয়েছিল, এটা পর্বত-আরোহণে খেলা নয়, অভিনব এক সংগ্রাম, যে-সংগ্রামে দরকার মানুষের মনের সমস্ত আত্মিক শক্তি এবং এভারেস্ট-বিজয়ের সবচেয়ে বড় কথা হলো, সে-শক্তি পৃথিবীর অবজ্ঞাত সাধারণ মানুষের মনের বিবরে শীতদিনের সর্পের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে নিশ্চেতন অপেক্ষায় শুয়ে আছে। আগামী পৃথিবীর শক্তির সরবরাহ সেখান থেকেই আসবে। সেই আধারকে যোগ্য সুযোগ দিতে হবে, জাগাতে হবে, শ্রদ্ধায় স্বীকার করতে হবে।

এভারেস্টের শেষ এক হাজার ফুটে এগিয়ে যাবার জন্যে শেরপা তেনজিঙ্গকে ছেড়ে দিতে হবে পথ।

পাঁচ

প্রায় ত্রিশ বছরের চেষ্টার ফলে, এভারেস্ট-অভিযাত্রীর দল বুঝতে পারলেন, দক্ষিণ দিক থেকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের দিক থেকে এভারেস্টের ওপরে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার। একমাত্র উপায় হলো যদি উত্তর দিক থেকে অর্থাৎ তিব্বতের দিক থেকে এই পর্বতকে আক্রমণ করা যায়। সেদিক দিয়েও অসুবিধা কম নয়, মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে, তুষার-প্রান্তরের মধ্য দিয়ে তিনশো মাইল অতিক্রম করলে তবে এভারেস্টের অঙ্গে গিয়ে ওঠা সম্ভব···তারপর সেখান থেকে শুরু হতে পারে আসল অভিযান। এই তিনশো মাইলের নির্বান্ধব পথ হলো তিব্বত আর নেপালের অন্তর্ভুক্ত। বাইরের কৌতূহলী বিশ্বের যেখানে প্রবেশ নিষেধ।

বৃটিশ গভর্নমেন্টের চেষ্টায় কোন রকমে নেপালের অনুমতি পাওয়া যেতে পারে, তিব্বতের অনুমতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। হিমালয়ের দুর্ভেদ্যতায় সুরক্ষিত হয়ে তিব্বত মানবীয় সভ্যতার ক্রম-বিকাশের ধারা থেকে নিজেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন রেখে চলেছে, কোন বিদেশীকে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য জাতির কোন লোককে সে তার সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে দেবে না। তিব্বতের সর্বময় কর্তা দালাইলামার কাছে যখনি এই পর্বত-আরোহণের কথা জানানো হয়েছে, তিনি এবং তাঁর সভাসদেরা পাশ্চাত্য জাতির এই অকারণ কৌতূহলকে গভীর সন্দেহের চোখে দেখেছেন। এই অকারণ কৌতূহলের আর কোন ব্যাখ্যাই তাঁরা করে উঠতে পারেন নি। তাছাড়া, এভারেস্ট তাঁদের কাছে শুধু একটা পাহাড় নয়, এভারেস্ট হলো চো-মো-লুঙ্-মো, পর্বত-জননী মহাদেবী। এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ায় হলো এই মহাদেবীর আসন। পাছে কোন কৌতূহলী মানুষের পায়ের শব্দে দেবীর মহাপ্রশান্তির ব্যাঘাত ঘটে, সেইজন্যে পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় বিরাট সব তুষার-গহ্বরে বাস করে মৃত্যুদূতের মতন সারমেয়রা, চো-মো-লুঙ্-মোর চিরজাগ্রত সব প্রহরী। এভারেস্টের পদতলে যারা থাকে, তারা মাঝে মাঝে রাত্রি-নিশীথে শুনেছে মহাদেবীর রক্ষা-প্রহরীদের রহস্যময় ভয়াল

চীৎকার-ধ্বনি। তাই পূজার জন্যে প্রয়োজন হলে তারা চো-মো-লুঙ্-মোর ওপরে কিছুদূর পর্যন্ত যায়, তার ওপরে ওঠা তারা কোনদিন কল্পনাও করে না।

ইংরেজ-অভিযাত্রীদল এই পার্বতী-শ্রদ্ধাকে বুঝতে পারে না, তাদের দেশে কোন বড় পর্বত না থাকার দরুন তাদের চরিত্রে কোন পর্বত-সম্মোহনই ছিল না। তাই বারে বারে তারা চেষ্টা করে দালাইলামাকে বোঝাতে এভারেস্টের চূড়ায় গিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোন দূরভিসন্ধি তাদের নেই। স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাসবাণ্ড, লর্ড মর্লি, লর্ড কার্জন, লর্ড চেমস্ফোর্ড, প্রত্যেকেই এভারেস্ট-অভিযানের সহায়তায় দালাইলামার অনুমতির জন্যে চেষ্টা করেন কিন্তু ১৯২০ পর্যন্ত তার কোন সুফলই পাওয়া যায় না। কেউ পারে না দালাইলামার সন্দেহ ঘোচাতে!

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এভারেস্ট-অভিযানের উৎসাহ আবার ইংরেজ পর্বত-আরোহণকারীদের মধ্যে জেগে ওঠে। মানুষের কাছে অজেয় থাকবে এভারেস্টের চূড়া, বীর্যবান মানুষ স্বচ্ছন্দচিত্তে এ পরাজয়কে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। ১৯২১ সালে কর্ণেল হাওয়ার্ড বারি এলেন ভারতবর্ষে, দালাইলামার অনুমতি-লাভের জন্যে শুরু হলো আবার আয়োজন-উদ্যোগ। তখন লর্ড চেমস্ফোর্ড ভারতের ভাইস্রয়। তিনিও উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তখন সিকিমে বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেণ্ট ছিলেন স্যার চার্লস বেল্। তার আগে বহুদিন তিনি তিব্বতে বৃটিশ প্রতিনিধিরূপে বাস করে এসেছেন এবং সেইসময় দালাইলামার সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কের বাইরে তাঁর একটা প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই বিদেশী লোকটিকে দালাইলামা অন্তর থেকে ভালবাসতেন, বিশ্বাস করতেন। স্যার চার্ল্স্ বেল্ সরকারী কাজে তিব্বতে এলেন কিন্তু তাঁর মূল লক্ষ্য রইলো দালাইলামার কাছে বন্ধু হিসাবে এভারেস্ট-অভিযাত্রী-দের আবেদনকে উপস্থিত করা।

লাসা থেকে একমাইল দূরে নোর্-বু-লিঙ্-কা। সেখানে দালাইলামার প্রাসাদ। বহু দরজা পেরিয়ে, বহু মহল পেরিয়ে, প্রাসাদের অন্তরঙ্গ মহলে বিরাট এক কক্ষ……চারদিকে মন্দিরের আবহাওয়া……ধূপ-

ধুনা-অগুরু গন্ধ। দালাইলামা তাঁর অন্তরঙ্গ কক্ষে বন্ধু হিসাবে আমন্ত্রণ করেছেন স্যার চালস্ বেল্‌কে।

সনাতন তিব্বতী প্রথায় চলে অতিথিকে অভ্যর্থনার ঘটা। অভ্যর্থনার পর দালাইলামা বলে উঠেন, এ সময়ে, এত শীতের মধ্যে কেন এলেন? না আছে ফুল, না আছে সূর্যের আলো, এসময়ে তিব্বতে সব নিস্তেজ, হিম!

দালাইলামার সেই আন্তরিক অভ্যর্থনায় স্যার চার্লস্ বেল্ এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, সেদিন তিনি আর তাঁর গোপন উদ্দেশ্যের কথা বলতে পারলেন না। তিনি দ্বিতীয় আর একদিন দেখা করবার অনুমতি চাইলেন। সেদিন তিনি সঙ্গে করে হিমালয়-অঞ্চলের একটা মানচিত্র নিয়ে এলেন। ধীরে ধীরে তিনি উনবিংশ-শতাব্দীর বিজ্ঞানী য়ুরোপের পরিচয় দালাইলামাকে দিতে আরম্ভ করলেন, পৃথিবীর অজানা রহস্যের আবিষ্কারে বিংশ-শতাব্দীর মানুষের নিছক জ্ঞান-স্পৃহার কথা উদাহরণের পর উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন। দালাইলামা তন্ময় হয়ে শোনেন। পরিশেষে, স্যার চার্লস্ এভারেস্ট-অভিযানের কথা তুল্লেন এবং ম্যাপ দেখিয়ে বোঝালেন, কেন তিব্বতের ভেতর দিয়ে অভিযানকারীদের এই পর্বতে আরোহণ করতে হবে।

সমস্ত শুনে গম্ভীরভাবে দালাইলামা বল্লেন, এভারেস্ট-অভিযনকারী-দের সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তিব্বতীরা বুঝবে না!

স্যার চার্লস্ বলেন, আমি বহুদিন ধরে তিব্বতের সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশেছি, কাজ করেছি, আমি কোনদিন কল্পনা করতে পারি না যে, আমি সজ্ঞানে তিব্বতের কোন ক্ষতি করতে পারি! আমার বিশ্বাস, আমার সম্বন্ধেও তারা সে ধারণা করতে পারে না। আপনিই বলুন, কোনদিন কোনভাবে তিব্বতের কোন ক্ষতি করেছি?

শান্তকণ্ঠে দালাইলামা বলেন, না, তিব্বতের বিন্দুমাত্র ক্ষতি তুমি করোনি……বরঞ্চ তার উপকার করেছ!

কয়েক মিনিট নীরবে চিন্তা করেন। তারপর বলেন, বেশ, মানচিত্রটা

আমার কাছে রেখে যাও, আমি আমার লোকদের বোঝাতে চেষ্টা করবো।

তার কয়েকদিন পরে দালাইলামার প্রধান সেক্রেটারী এসে স্যার চার্লস্ বেলের হাতে একটা ছোট্ট তুলোট কাগজ দিলেন, দালাইলামার অনুমতি। স্যার চার্লস্ কাগজ খুলে দেখলেন দালাইলামার নিজের হাতের লেখা, বিচিত তিব্বতী পরিভাষায় তিব্বত-প্রবেশের রাজকীয় অনুমোদন,

"মহা-তুষারের পঞ্চরত্ন-আধারের পশ্চিমে,
উপল উপত্যকার অন্তরঙ্গ মাঠের কাছে,
শ্বেত কাঁচ-দুর্গের সীমানার মধ্যে,
আছে দক্ষিণের বিহঙ্গ-দেশ।"

স্বল্পাক্ষর এই বিচিত্র আদেশের মধ্যে আছে এভারেস্ট-অভিযানের ঐতিহাসিক সূচনা।

ছয়

নেপালের একেবারে পূর্ব-সীমান্তে···চারিদিকে চিরতুহিনাবৃত হিমালয়ের তুঙ্গ-শৃঙ্গ···এভারেস্টের পাদমূলের কাছাকাছি ওখালডুঙ্গা অঞ্চলে··· বিরাট বটের শাখায় ছোট্ট পাখির নীড়ের মত, তুষার-প্রান্তরের মধ্যে একটি ছোট্ট গ্রাম, থামি। একদিন সেই গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে একটি কিশোর নেপালী ছেলে দুর্গম পাহাড়ে-পথে দাঁড়ালো! পেছন ফিরে একবার তার ছোট্ট গ্রামটিকে দেখে নিলো···গ্রাম ছেড়ে, ঘরের আশ্রয় ছেড়ে সে আজ চলেছে অজানা পৃথিবীতে তার ভাগ্য-পরীক্ষা করতে। থামির সেই জনবিরল অসাড় তুহিন নির্জীবতায় তার দুরন্ত মন হাঁপিয়ে উঠতো। পাঠশালায় মন বসতো না, চাষ-বাসে গা ঘামাতো না, তাই সে মনে মনে ঠিক করলো, কাউকে না জানিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে! সে শুনেছে হিমালয়ের ওধারে, বহুদূরে, কতদূরে তা সে জানে না, আছে দার্জিলিং শহর···বিরাট শহর···একবার যদি কোন রকমে সেখানে গিয়ে

পৌঁছতে পারে। দুর্গম পাহাড়ে-পথে একা কিশোর এগিয়ে চলে··· দিনের পর দিন! দীর্ঘ পথের শেষে কিশোর তেনজিঙ্গ নোর্‌কে একদিন এসে পৌঁছল দার্জিলিঙ্গে···ইস্পাতের ফ্রেমে-আঁটা আভিজাত্যের শৈল-রাজধানী···সেখানে পাহাড়ের উঁচু-নিচু স্তরের মত, থাকের পর থাক সাজানো আছে আভিজাত্যের জাতি-ভেদের স্তর···কিশোর তেনজিঙ্গ এসে পৌঁছল তার সর্বনিম্ন স্তরে, যেখানে আভিজাত্যের বোঝা বইবার জন্যে থাকে মালবাহী শেরপা কুলীর দল। পথ থেকে ফটক পর্যন্ত তাদের গতির সীমানা। যুগ-যুগ সঞ্চিত অব্যবহৃত প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের ফটকের বাইরে।

সেই নিষিদ্ধ ফটকের সামনে এসে সেদিন দাঁড়ালো কিশোর তেনজিঙ্গ, অবজ্ঞাত এক বিচিত্র মানব-গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক প্রতিনিধিরূপে।

সাত

বিধাতা যাদের চিহ্নিত-করে পাঠান, তাদের মধ্যে তিনি দিয়ে দেন অপার কৌতূহল, বিচিত্র প্রাণশক্তি যার সাহায্যে সব বাধাকে, সকল বিরোধিতা আর বিরূপতাকে ঠেলে ফেলে সব চেয়ে পেছনের লোক হঠাৎ একদিন এগিয়ে আসে একেবারে সকলের আগে।

কিশোর তেনজিঙ্গের মনে ছিল সেই কৌতূহল, রক্ত-কণিকায় ছিল সেই প্রাণশক্তি।

দার্জিলিঙ্গের শেরপাদের আড্ডায় সে শোনে, এই পথ দিয়ে দলে দলে সব য়ুরোপীয় পর্যটকেরা গিয়েছে এভারেস্টের পথে, তাদের সঙ্গে তাদের মাল-পত্র নিয়ে গিয়েছে অনেক শেরপা, মাঝ-পথ থেকে তারা সবাই এসেছে ফিরে ব্যর্থ হয়ে···

অপার বিস্ময়ে তাদের মুখে ব্রুস, নর্টন, ম্যালোরী, সোমারভিল রাট্‌-লেজের গল্প শোনে···য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সব পর্বত-আরোহণকারীরা কিন্তু এভারেস্টের কাছে সবাই পরাজিত হয়ে ফিরে ফিরে এসেছে।

এইসব কাহিনী শুনতে শুনতে উন্মুখ-যৌবন তেনজিঙ্গের মনে জেগে ওঠে দুরন্ত দুরাকাঙ্ক্ষা, এভারেস্টের ছায়ায় সে জন্মেছে, এই হিমালয়ের মাতৃক্রোড়ে সে লালিত-পালিত হয়েছে, হিমালয় তার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ থেকে তাকে ডাকছে, সে যাবে, সে পৌছবে!

মালবাহী সামান্য একজন শেরপার এই দুরাকাঙ্ক্ষার কথা শুনলে তখন জগৎ হয়ত হেসে উঠতো।

তাই অন্তরের বাসনা অন্তরে সংগোপন রেখে তেনজিঙ্গ নতুন এভারেস্ট অভিযানে যোগদান করবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। ১৯৩৫ সালে সে সুযোগ এলো। এরিক-শিপটনের অভিযানে তিনি ভারবাহী শেরপা হয়ে যোগদান করলেন। এবং তারপর থেকে হিমালয়ের পথে যত বড় অভিযান গিয়েছে, তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই তেনজিঙ্গ যোগদান করেছেন…শেষবারের কথা বাদ দিয়ে এভারেস্টের পথেই তিনি সাতবার যাতায়াত করেছেন…এভারেস্টের তুষার-পথের প্রত্যেক উত্থান-পতন, প্রত্যেক আকস্মিকতার সঙ্গে তিনি এমনভাবে পরিচিত হয়ে যান যে, সেই দুর্জ্জেয় পর্বতকে তিনি তাঁর অন্তরের পরম বন্ধু বলে গ্রহণ করেন।

গত বছর মে মাসে সুইস্ অভিযান এভারেস্টের ৭৯২ ফুট থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। সেই অভিযানের পক্ষ থেকে রেমণ্ড ল্যামবার্ট আর তেনজিঙ্গ সেদিন এভারেস্টের ২৮২১০ ফুট উঁচুতে গিয়ে উঠেছিলেন। ল্যামবার্টের সঙ্গে অক্সিজেন-যন্ত্র ছিল কিন্তু তেনজিঙ্গ অক্সিজেন-যন্ত্র না নিয়েই উঠেছিলেন।

সামনে আর মাত্র ৭৯২ ফুট। এমন সময় চারিদিক অন্ধকার করে ধেয়ে এলো প্রমত্ত ঝড়…তুষার-ঝঞ্ঝা।

ল্যামবার্ট কালবিলম্ব না করে ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তেনজিঙ্গ কাতরভাবে প্রার্থনা করলেন—আমাকে অনুমতি দিন এগিয়ে যাবার।

ল্যামবার্ট তেনজিঙ্গকে অন্তর থেকে ভালবাসতেন। তেনজিঙ্গের হাত ধরে বল্লেন, আমি তোমাকে মরতে দিতে পারি না। তবুও

তেনজিঙ্গ বল্লেন, না···না···আমার সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা করবেন না, এভারেস্ট আমার বন্ধু, তার হাত থেকে আমি কিছুতেই মৃত্যু পেতে পারি না!

কিন্তু দুর্যোগের মাত্রা বেড়েই চল্লো। বাধ্য হয়েই তেনজিঙ্গকে সেবার ফিরে আসতে হয়েছিল।

বন্ধুর হাত থেকে মৃত্যু নয়, অমরত্ব নেবার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে হলো আর একটা বছর।

আট

এভারেস্ট-অভিযানের ইতিহাস নয়, সেই ইতিহাসের দু'একটি মুহূর্তের সঙ্গে আমার সম্পর্ক।

গত ত্রিশ বছর ধরে এভারেস্টকে জয় করবার জন্যে মানুষ যে-দুঃসাধ্য সাধনা করেছে, মৃত্যু-কন্টকিত দুলঙ্ঘ্য বাধার বিরুদ্ধে বারে বারে যেভাবে এগিয়ে এসেছে, যান্ত্রিক যুগের মানুষের মনে তা ব্যক্তিগত বীর্যের বিলুপ্ত পুরাণকে আবার জাগিয়ে তুলেছে।

এভারেস্টের দুর্লভ চূড়ায় উঠতে গিয়ে প্রান্তরবাসী মানুষদের এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতাই তার ছিল না। এইসব সমস্যাকে সমাধান করবার জন্যে একদিকে যেমন দরকার হয়েছে দেহের শেষবিন্দু শক্তি, তেমনি প্রয়োজন হয়েছে মনেরও বিচিত্রতম চরম প্রসার। এবং এভারেস্টকে জয় করতে গিয়ে মানুষকে দেহের বাধার চেয়ে বেশী ধাক্কা খেতে হয়েছে মনের বাধার কাছ থেকে।

এভারেস্ট-অভিযানের সূচনার পরই বোঝা গেল, এই প্রচেষ্টার সার্থকতা নির্ভর করছে, এমন একটি ব্যাপারের ওপর, যার সঙ্গে পর্বত-আরোহণের কোন যোগ নেই।

আজকের সভ্যতার অন্তর্নিহিত এক দ্বন্দ্বই এভারেস্টের চব্বিশ হাজার ফিটের ওপর প্রচণ্ড বাধা হয়ে পাশ্চাত্য পর্বত-আরোহণকারীদের সচেতন করে তুললো এবং এভারেস্টের প্রত্যেক ব্যর্থ অভিযানের ভেতর

দিয়েই সেই একটি ব্যাপারই ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগলো। সে ব্যাপার হলো আজকের সভ্যতার অন্তর্নিহিত পাশ্চাত্য জাতির শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান ও দাবি। চব্বিশ হাজার ফুটের ওপরে নিয়ে গিয়ে এভারেস্ট সে-অভিমানকে পাথরে আছড়ে ভেঙে দিয়েছে।

প্রত্যেক অভিযানের মধ্যেই এই বিচিত্র দ্বন্দ্ব ওতপ্রোত হয়েছিল, কিন্তু তাকে নানাভাবে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল এবং আজও হচ্ছে। এভারেস্ট-অভিযানে সবচেয়ে যে বড় বাধাকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে, সে হলো, চব্বিশ হাজার ফুটের ওপর থেকে বায়ুতে অক্সিজেনের অভাব এবং পার্বত্য প্রকৃতির অনিশ্চয়তা। সে-বাধা যে প্রচণ্ড তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই বাধার আড়ালে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা জাতের আর এক বাধা, সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতির শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানের বাধা।

এভারেস্ট-অভিযানের প্রাথমিক ব্যর্থতার পরই বোঝা গেল, এই ভয়ঙ্কর বিচিত্র পাহাড়কে জয় করতে হলে, অশিক্ষিত শেরপা কুলীদের সাহায্য নিতেই হবে···পাশ্চাত্য পর্বত-আরোহণকারীদের শিক্ষা, সাহস ও বৈজ্ঞানিক আয়োজন যতই থাকুক না কেন, এভারেস্টের পাদমূলে পৌঁছান থেকে তার চূড়ায় ওঠা পর্যন্ত যে-বিরাট আয়োজনের দরকার, তাতে ভারবাহী মানুষের একান্ত প্রয়োজন। দার্জিলিং থেকে এভারেস্টের পাদমূলে যেখানে ১নং ক্যাম্প গড়ে তোলা হয়, এই দীর্ঘ পার্বত্য পথই হলো তিনশো মাইল। অভিযানের আসা-যাওয়ার সমস্ত রসদ, তাঁবু, বিছানা, যন্ত্রপাতি, প্রয়োজনীয় অন্য সমস্ত জিনিস সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে···কারণ দার্জিলিং ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচে যায়। তারপর এক নম্বর ক্যাম্প থেকে ক্রমশ তাঁবু ফেলতে ফেলতে ওপরে উঠতে হবে এবং প্রত্যেক তাঁবুতে ফেরবার সময়ের জন্যে দরকারী জিনিসপত্র ও খাদ্য সঞ্চয় করে রেখে যেতে হবে।

শেরপা কুলীদের এই ভার নিয়ে মূল পর্বত-আরোহণকারীদের সঙ্গে সমানে উঠতে হয়। দার্জিলিং থেকে ১নং ক্যাম্প পর্যন্ত যে-সব শেরপা আসে, তাদের অধিকাংশেরই যাত্রা এক নম্বর ক্যাম্পেই শেষ হয়ে যায়।

১নং ক্যাম্প থেকে ওপরে ওঠবার জন্যে বাছাই-করা মুষ্টিমেয় শেরপাদের নেওয়া হয়। অভিযানের পরিচালককে দেখতে হয়, যাতে সংখ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়ভাবে কম হয়। কারণ যতই ওপরে ওঠা যাবে, ততই থাকবার জায়গার আয়তন কমে আসবে। পর্বত-আরোহণকারী শেরপাদের পিঠের বোঝার ওজন সেই অনুপাতে বাড়ে।

প্রথম প্রথম অভিযানে দেখা গেল, বিশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে শেরপারা আর পিঠে বোঝা নিয়ে সেই অক্সিজেনহীন বায়ুমণ্ডলে উঠতে চাইত না···তারা যদি প্রয়োজনীয় খাদ্য, তাঁবু, বিছানা ও জিনিসপত্র নিয়ে ওপরে আর না ওঠে, তা'হলে মূল আরোহণকারীদের সেই বোঝা বইতে হয়। সেই বোঝা বইতে মূল আবোহণকারীদের যে শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়, তারপর আর ওপরে ওঠবার মতন শক্তি তাঁদের থাকে না··· দেহ ও মনের তখন যে-অবস্থা হয়, সে-অবস্থায় অগ্রসর হওয়া মানে, মৃত্যুকে যেচে বরণ করে নেওয়া। শুধু যে দেহের শক্তি ভেঙে পড়ে তা নয়, বিশ হাজার ফুটের ওপর থেকেই মনের ওপরও বিচিত্র প্রভাব পড়তে থাকে। আমাদের দুর্ভাগ্য, এভারেস্ট-অভিযানের সঙ্গী অশিক্ষিত শেরপারা কোনদিন নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারবে না, যদি তারা সে সুযোগ পেতো, তাহলে হিমালয়ের সেই দুর্গম উচ্চতায় সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের অনেক বিচিত্র কাহিনী আমরা শুনতে পেতাম।

যাঁরা এভারেস্ট-অভিযানের ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন যে, পাশ্চাত্য আরোহণকারীরা একটা কথা ব্যবহার করেন, acclamatise···অর্থাৎ হিমালয়ের সেই সুউচ্চ স্তরের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া। এটা শুধু আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া নয়, এর মধ্যে আছে তাঁদের অপরিত্যাজ্য সঙ্গী সেই অশিক্ষিত শেরপাদের সঙ্গে নিজেদের খাপ-খাইয়ে নেওয়ার ব্যাপারও।

প্রথম প্রথম এভারেস্টের শেষের দিকে যখন অভিযানকারীরা গিয়ে পৌঁছিয়েছে, তখন এমন অবস্থা হতো যে, স্থানের অল্পতার দরুণ শেরপাদের সঙ্গে এক তাঁবুতে তাঁদের শুতে হতো, পাশাপাশি, অঙ্গাঙ্গী

…অক্সিজেনহীন সেই উচ্চতায় মন যেখানে অবসাদে বিচিত্রভাবে তিক্ত হয়ে উঠেছে, সেখানে এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাকে মেনে নিতে তাঁদের রীতিমত মনের কসরত করতে হয়েছে।

যে-সব বাছাই-করা শেরপা বিশ হাজার ফুটে বোঝা নিয়ে উঠতো, তারাও অনেকে বোঝা নিয়ে আর ওপরে উঠতে চাইতো না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বোঝা বইতে গিয়ে রক্ত-বমন করেছে…তুষারে অবশ হয়ে পড়ে গিয়েছে…দু' একজন পাগলও হয়ে গিয়েছিল। তখন নানাভাবে তাদের বোঝান হয়েছে, তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এই থেকেই 'টাইগার' কথাটার উৎপত্তি হয়েছে। যে শেরপা ২৪ হাজার ফুটের ওপর বোঝা নিয়ে উঠতে পারে, তাকে টাইগার উপাধি দেওয়া হয় এবং এই উপাধির সঙ্গে সঙ্গে সে স্বতন্ত্র মর্যাদা ও ব্যবহার পায়।

এইভাবে ক্রমশ ক্রমশ অবস্থার চাপে সুসভ্য পাশ্চাত্য পর্বত-আরোহণকারী আর অশিক্ষিত শেরপাদের মধ্যে একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। ভারবাহী শেরপাদের মনেও ক্রমশ জেগে উঠেছে, একই পথে একই দুর্ভাগ্য সয়ে এবং ততোধিক বেশী বোঝা বয়ে কেন তারা হয়ে থাকবে শুধু ভারবাহী…কেন তাদের পর্বত-আরোহণকারী বলে গণ্য করা হবে না? কেন পাশ্চাত্য পর্বত-আরোহণকারীদের জন্যে এক রকম খাদ্যের ব্যবস্থা, আর তাদের জন্যে অন্য রকম ব্যবস্থা? এভারেস্টের শেষ হাজার ফুট থেকে বারে বারে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে পাশ্চাত্য পর্বত-আরোহীরা, তবুও সেই হাজার ফুট এগিয়ে যাবার জন্যে তাদের দেওয়া হয় না অনুমতি। কেন?

সমস্ত শেরপাদের মনের এই প্রশ্ন মূর্তি ধরে জেগে উঠলো তেনজিঙ্গের ভেতর। তাই এবার যখন অভিযান শুরু হয়, তেনজিঙ্গ অভিযানের পরিচালকের কাছে স্পষ্টভাবে উত্থাপন করলেন তাঁর দাবির কথা… এভারেস্ট-অভিযানে পর্বত-আরোহণকারী বলে তাঁকে স্বীকার করতে হবে এবং যদি শেষ হাজার ফুটে উঠতে তিনি সক্ষম থাকেন, তাঁকে একলা এগিয়ে যাবার অনুমতি দিতে হবে।

কাঠমাণ্ডুর বৃটিশ এম্‌ব্যাসিতে এই নিয়ে অভিযান-কমিটির এক

বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয় এবং সেই অধিবেশনে অভিযানের পরিচালক তেনজিঙ্গকে পর্বত-আরোহণকারী বলে স্বীকার করলেন এবং সক্ষম হলে এভারেস্টের চূড়ায় গিয়ে পদার্পণ করবার অনুমতি দিলেন।

নয়

কর্নেল হান্ট এভারেস্ট-অভিযানের ক্যাম্প থেকে বেতারে কাটমাণ্ডুর বৃটিশ এম্‌ব্যাসিতে এভারেস্ট-বিজয়ের খবর গোপন রাখবার জন্যে এই মর্মে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন,

তুষারের অবস্থা খারাপ। অভিযান পরিত্যক্ত হলো। বেসক্যাম্প। উনত্রিশে। সদয় আবহাওয়ার অপেক্ষায় আছি। সব কুশল।

এম্‌ব্যাসির গোপনকক্ষে কর্নেল হান্টের এই সংবাদ যখন পৌঁছল তখন তার মানে দাঁড়াল,

হিলারী ও তেনজিঙ্গ উনত্রিশ তারিখে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছিয়েছে। সব কুশল।

সেই সংবাদ যখন পশ্চিমবঙ্গের সমতল প্রান্তরে এসে পৌঁছল, তখন তার মানে দাঁড়াল,

জয় বাঙালীর জয়! একজন বাঙালীই এতদিন পরে এভারেস্টের চূড়ায় গিয়ে উঠলো…জয় মা, বঙ্গজননী!

সেই সংবাদ বঙ্গেতর ভারতবর্ষ থেকে যখন ফিরে এলো, তখন তার মানে দাঁড়াল,

জয়, জয়, জয় হে, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ আজ এভারেস্ট-বিজয়ী ভারতবীর শেরপা তেনজিঙ্গ নোর্‌কের গৌরবে গৌরবান্বিত। সত্যমেব জয়তে।

রাত্রিতে স্বপ্ন দেখলাম, শ্যামবাজারের মোড়ে তেনজিঙ্গ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বসে শেরপা-সন্দেশ খাচ্ছি।

দশ

ছেলেবেলায় মনে পড়ে, বুক ফুলিয়ে, গলা ফাটিয়ে সমবেত-কণ্ঠে গেয়েছি ডি. এল. রায়ের সেই অমর গান, মানুষ আমরা নহি তো মেষ······

বড় হয়ে ডি. এল. রায়ের চরিত্র ও প্রতিভার সঙ্গে যখন পরিচিত হলাম, তখন বুঝলাম লোকটা কি নিদারুণ রসিক ছিলেন। এত জীবজন্তু থাকতে, বাঙালীদের প্রসঙ্গে কেন তাঁর মনে মেষের কথা এসেছিল? শুধু "দেশ"এর সঙ্গে ছন্দ মেলাবার লোভ? ছন্দ নিয়ে যিনি ছিনিমিনি খেলতে জানতেন, তিনি অনায়াসে আর কোন শব্দ দিয়ে মিল রক্ষা করতে পারতেন।

যতই অভিজ্ঞতা বাড়ছে, নিজের জাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে, ডি. এল. রায় যেরকম তীব্রভাবে ঘোষণা করে গিয়েছেন, আমরা মেষ নই, সেই প্রতিবাদের তীব্রতার ভেতরই যেন গোপনে উঁকি মারছে একটা লজ্জাকর স্বীকৃতি। আজকের বাঙালীর মনের ও মস্তিষ্কের প্রকাশ দেখে আশঙ্কা হয়, যে বাঙালী জাতির জয়-গৌরব গেয়ে গিয়েছেন বাংলার কবিরা, সে জাতি যেন আমাদের যুগের সূচনার ঠিক আগেই তাঁদের গান-বাজনার পালা শেষ করে চলে গিয়েছেন···আজকের আমরা বাঙালী একটা সম্পূর্ণ নতুন যাত্রার দলের লোক···ইতিহাসের ভাঙা আসরে আমরা মুখ-ভেংচিয়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে প্রহসন দেখিয়ে লোক জমাতে চেষ্টা করছি। শুধু এভারেস্ট-অভিযানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে একথা মনে জাগেনি, ছোট-বড় আজকের যুগের অধিকাংশ ঐতিহাসিক ঘটনায়, নিজেদের জীবনের প্রতিদিনের অভিব্যক্তিতে, আমাদের রাজনীতির কর্মহীন, উদ্দেশ্যহীন ব্যস্ততায়, আমাদের আনন্দহীন উৎসবের প্রমত্ত কলরবে, আমাদের লক্ষ্যহীন সাহিত্যের প্রাণহীন কথার অজস্রতায়, আমাদের পাষাণ-ভার শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান অশিক্ষায়, আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের কাঁচস্বচ্ছ মিথ্যায় আমরা সেই রূপকথার পরিপূর্ণ উলঙ্গ রাজার মতন সগৌরবে রাজপথ দিয়ে হেঁটে চলেছি, এই ধারণায় যে আমাদের

গায়ে আমাদের ঐতিহাসিক গৌরবের অদৃশ্য মায়াবস্ত্র জড়ানো আছে। যতই দিন যাচ্ছে, যতই আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠছে, ততই আমাদের কথায়, কাজে ও ব্যবহারে একটা আদুরে নাবালকত্ব ফুটে উঠছে। জ্যেষ্ঠত্ব আর জ্যাঠামি যে একবস্তু নয়, তা বোঝবার বয়স জাতিগতভাবে নিশ্চয়ই আমাদের হয়েছে।

এভারেস্ট-অভিযানের এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সংগ্রামের মধ্যে আমাদের আত্মগরিমাবোধের একমাত্র বিষয় হলো, হিমালয় আমাদের ভারতবর্ষে অবস্থিত। চিররহস্যময় এই বিরাট পার্বতী-শক্তির বিরুদ্ধে আধুনিক যুগের মানুষের এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, ব্যথা-বেদনা, সংশয়-সমস্যা, মৃত্যু ও আঘাত বহন করেছে দুটি বিচিত্র মানবগোষ্ঠী। সভ্যতার দুই দূরতম প্রান্তের দুই প্রতিনিধি......একদল হলো অতি সুশিক্ষিত য়ুরোপীয় পর্বত-আরোহী, আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যোগ্যতম প্রতিনিধি, অপর দল হলো হিমালয়ের তুষার-প্রাচীরে অবরুদ্ধ, আধুনিক সভ্যতা থেকে নির্বাসিত নেপালী-ভুটিয়া-তিব্বতী শেরপা বা কুলী। এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রেরণা ও উৎসাহ যাঁরা জুগিয়েছেন, তাঁদের দলেও আমরা ছিলাম না। য়ুরোপের আলপাইন ক্লাব আর ইংলণ্ডের রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগেই অধিকাংশ এভারেস্ট-অভিযান পরিচালিত হয়। এমন কি, ভারতবর্ষে যে হিমালয়ান্ ক্লাব পরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তারও মূলে ছিল য়ুরোপীয়ানদের উৎসাহ ও সহযোগিতা, কেনেথ ম্যাসনের প্রাণপণ চেষ্টাতেই হিমালয়ান্ ক্লাব তার খ্যাতি অর্জন করে। হিমালয়ের তুষারক্ষেত্রে পঞ্চাশ বছর ধরে মানুষের এই মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনায়, আমরা অর্থাৎ ভারতের জনসাধারণ নিষ্ঠাসহকারে একটি কাজ করে এসেছি, এক-একটি অভিযান ব্যর্থ হয়েছে আর আমরা পরম-বিজ্ঞের মত রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে বলেছি, তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্ত সঞ্চিত তপস্যার মত...এভারেস্টের চূড়ায় ওঠা ইয়ার্কি নয় বাছাধনেরা! সার্কাসে দর্শকের আসনে বসে লোহার খাঁচার ভেতর বাঘের লড়াই দেখার যে-থ্রিল, আমরা বড়জোর সেই থ্রিল উপভোগ করেছি।

অথচ এভারেস্ট-বিজয়ে আমাদের স্বাদেশিকতা এমনভাবে হঠাৎ জেগে উঠলো যে, আমরা সভা করে প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম, তেনজিঙ্গই প্রথম উঠেছেন, হিলারী নয়, অর্থাৎ এভারেস্টের চূড়ায় প্রথম পদার্পণ করবার গৌরব একজন ভারতবাসীরই। সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল, এভারেস্টের বিদেশী নামটাও বদলে ফেলা দরকার…কেউ বল্লেন, তার নাম হোক তেনজিঙ্গ-পর্বত, কেউ বল্লেন রাধানাথ শৈল, আমাদের হরি-খুড়ো দেখলাম কাগজে কাগজে চিঠি লিখছে, কংগ্রেসের গৌরবময় রাজত্বে এভারেস্ট-বিজয় সার্থক হয়েছে, তাই বিলিতী নাম বদলে রাখা হোক কংগ্রেসী পাহাড়। অথচ যেদিন তেনজিঙ্গ এভারেস্টের পথে নবমবার যাত্রা করেন, সেদিন এই বিরাট ভারতবর্ষের মধ্যে একটি লোক, একটি প্রতিষ্ঠানও তেনজিঙ্গের হাতে একটি ছোট ভারতীয় পতাকা দিতে আসেননি এবং এভারেস্টের চূড়ায় ভারতীয় পতাকা উঠতো না, যদি না তেনজিঙ্গের এক বাঙালী বন্ধু একটা ছোট ভারতীয় পতাকা তাঁর সঙ্গে দিতেন।

এই জাতীয় অভিযানের অন্তরঙ্গ ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা জানেন যে, আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমস্ত উত্তেজনা সত্ত্বেও, এই সব অভিযানের ভেতর দিয়ে আজকের মানুষ মৃত্যু আর মহাবেদনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়ের সমস্ত ক্ষুদ্র গণ্ডী ভেঙে, ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্রতা আর বিভেদ ছাড়িয়ে অস্তিত্বের এক নতুন আদর্শকে জগতের সামনে তুলে ধরেছে। মেরুর জনহীন শব্দহীন অনন্ত শুভ্র স্তব্ধতায়, এভারেস্টের তুঙ্গ তুষার-চূড়ায় যেখানে অদৃশ্য হয়ে যায় সমস্ত পৃথিবী, যে মানুষেরা গিয়ে পৌঁছয়, তারা জানে সেই বিরাট স্তব্ধ মহারহস্যের সামনে মানুষের সমস্ত ছোট ছোট বিচার, লাভ-লোকসানের হিসাব, আগে-পরের দৌড়াদৌড়ি আপনা থেকে শান্ত হয়ে যায়…মহৎ মৃত্যুর সামনে, বৃহৎ বেদনার স্পর্শে মানুষ খুঁজে পায় তার মনের শতস্তরের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া সত্যিকারের মানবত্বকে। এভারেস্টের চূড়ায় যে মানুষ গিয়ে ওঠে, সে মানুষ আপনা থেকে গিয়ে ওঠে মানবমনের সর্বোচ্চ চূড়ায় এবং সেই মুষ্টিমেয় মানুষের পাওয়া অদৃশ্যভাবে গিয়ে জমা হয় সর্বমানবের চেতনায়।

গত একশো বছর ধরে দুঃসাহসিক য়ুরোপীয় অভিযাত্রীরা আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, মেরুতে, এভারেস্টের চূড়ায়, গোবী আর সাহারা মরুভূমিতে অপরাজেয়, মহা-ভয়ঙ্করের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে যে সব অমূল্য মুহূর্তের সৃষ্টি করেছেন, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক বিপ্লবের মত তার প্রভাব সদ্যসদ্য আমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু সেই সব দিব্য মুহূর্ত মানুষের ক্রমবিকাশধারার মূলে গিয়ে প্রভাব বিস্তার করে ……মানুষের এই চলমান সভ্যতার রথ সেই সব মুহূর্তের চাকার ওপর দিয়েই এগিয়ে চলে।

একান্ত বেদনার বিষয়, এই অভিনব বীর্য-সাধনার ইতিহাসে আমাদের অংশ শুধু নাবালকের মতন হাততালি দেওয়া, যে বিপুল কর্মশালায় বিশ্ব-মানবের চেতনা আগুনে পুড়ছে, ভাঙছে, গড়ছে, নব-নব রূপ নিচ্ছে, আমরা আজও তার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হয় চীৎকার করছি, জয় দাদার জয়!—নয় গালাগালি দিচ্ছি, মার শালাকে! ব্যক্তিগতভাবে হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটতে পারে; কিন্তু আমাদের জাতীয় চেতনা, অনেক সময় মনে হয়, যেন মুঘলযুগেরও পেছনে পড়ে আছে। আজও পর্যন্ত জগৎ-ব্যাপারে যা কিছু ঘটছে তা ঘটছে পাশ্চাত্য জাতির লোকদের দ্বারাই। তারা ভুল করে, অন্যায় করে কিন্তু চলে এবং চলে বলেই ভুলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলে। আমরা দাঁড়িয়ে থেকে সমালোচনা করি। ফেউ-এর মতন আমরা বাঘের পেছনে পেছনে ঘুরি, শিকারের ঝঞ্ঝাট নেবার মতন শক্তি আমাদের নেই, আছে শুধু অপরের শিকার করা মৃত পশুর প্রতি লোভ।

তেনজিঙ্গের জয়-গৌরবে আজ শেরপা-কুলীদের মানবীয়তা আমাদের চোখে পড়েছে…হয়ত ইতিমধ্যে সে সম্বন্ধে অনেক কবিতাও লেখা হয়ে গিয়েছে…কিন্তু হিমালয়ের মৃত্যুসঙ্কুল মহানির্জন পথে বর্ণদ্বেষী অভিজাত য়ুরোপীয়েরাই দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ জীবনের বাস্তবতায় এই অশিক্ষিত শেরপা কুলীদের দিয়েছেন মর্যাদা, সম্মান, সমগোত্রতা। বাস্তবতার চাপে এই য়ুরোপীয় অভিযাত্রীরাই ক্রমশ নিজেদের সংস্কারজাত ত্রুটিকে নিজেরাই চেষ্টা করে ছাড়িয়ে উঠেছেন এবং সেই সঙ্গে অশিক্ষিত

শেরপাদের ভেতর থেকে জাগিয়ে তুলেছেন মানবীয় শৌর্য ও বীর্যের পরমপ্রকাশকে।

হিমালয়-অভিযানের গোড়ার দিকেই এই সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে, হিমালয়কে যদি জয় করতে হয়, তাহলে সুশিক্ষিত য়ুরোপীয় আর অশিক্ষিত শেরপা, এই দুই পরস্পর-বিরোধী ও একান্ত দূরবর্তী মানব-গোষ্ঠীর মাঝখানের প্রচণ্ড ফাঁককে ভরাট করে তুলতে হবে। গোড়ার দিকে জগৎ-খ্যাত ইতালীয়ান পর্বত-আরোহী ডিউক অফ্ আলক্রুৎসী যখন কে-টুতে আরোহণ করবার জন্যে আসেন, তখন তিনি সঙ্গে করে ইতালীয়ান মালবাহীদের নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন, হিমালয়ের এই অতি দুরূহ বিশালতায় স্থানীয় শেরপাদের ছাড়া গত্যন্তর নেই। গোড়ার দিকে শেরপাদের মালবাহী কুলী হিসাবেই দেখা হতো; কিন্তু য়ুরোপীয়রা হলেন রিয়ালিষ্ট, তাঁরা যখন বুঝলেন হিমালয়ের পথে, বিশেষতঃ যত উঁচুর দিকে ওঠা যাবে, ততই জীবন-মৃত্যুর সমস্ত দায়িত্ব তাঁদের সঙ্গে সমানভাবেই ভারবাহী শেরপাদের নিতে হবে, সুতরাং একই পথে, একই দায়িত্ব বহন করে, তারা যদি একই মর্যাদা ও ব্যবহার না পায়, তাহলে কখনই তাদের এভারেস্টের চূড়ায় টেনে আনা যাবে না। তাই ক্রমশ য়ুরোপীয় অভিযাত্রীরা স্বীকার করে নিলেন শেরপাদের পথসহায়রূপে এবং সেখানে তাঁদের মানসিক সততাকে সন্দেহ একমাত্র তারাই করে, যারা জগতের সব সুন্দর জিনিসকেই সন্দেহের চোখে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে। সত্যমেব জয়তে, আমাদের রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র বটে···আমাদের মাথার ওপরে রাষ্ট্রীয় ভবনে-ভবনে, পতাকায় পতাকায় সত্যের জয়ঘোষণা উড়ছে; কিন্তু জাতীয় চরিত্রের দিকে চাইলে দেখি, ক্রমশ সেই জয়-পত্র মাটির তলায় অন্ধকারে মাটি চাপা পড়ে যাচ্ছে।

আজ শেরপা তেনজিঙের সঙ্গে হিলারী যে এভারেস্টের চূড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন, তার মধ্যে একটা ঐতিহাসিক সুবিচারই সংসাধিত হয়েছে। এভারেস্ট-অভিযানের গোড়ার দিকে, স্বনামখ্যাত স্যার ফ্রান্সিসইয়ংহাসবাণ্ড হিমালয়-অভিযানে সুশিক্ষিত য়ুরোপীয় আর অশিক্ষিত শেরপাদের

মৈত্রী ও সহযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন,

"Their reward should be that one of them (Sherpa's) should stand with an Englishman on the summit of that supreme peak (Everest)."

সেদিন এই মনীষী হিমালয়-অভিযানে এই দুই দলের কৃতিত্বের বিচার সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন, এভারেস্ট-অভিযানের সমস্ত তর্কের হলো সেই একমাত্র উত্তর,

"And I believe this will always be the case on Himalayan expeditions···Europeans and Himalayans will always have to depend upon each other and be at times the child and at times the leader to one another."

আজ আমরা শেরপা তেনজিঙ্গকে অভিনন্দন করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছি···কিন্তু তেনজিঙ্গের মতই যে সব শেরপা বিভিন্ন হিমালয়-অভিযানে শৌর্য ও বীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তাঁদের প্রকাশ্যে একটা ধন্যবাদও জানাইনি। প্রতিষ্ঠিত যে জয়, তাকে সম্মান দেখানোর মধ্যে কৃতিত্ব নেই, তাকে সম্মান দেখাতে আমরা বাধ্য। কিন্তু জয়-পরাজয় নিরপেক্ষ মানুষের কৃতিত্বকে স্বেচ্ছায় মাথা নত করে কিভাবে সম্মান দেখাতে হয়, তা এখনো য়ুরোপীয়দের কাছ থেকে আমাদের শিখ্‌তে হবে।

১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাস। প্যারিসের বিমানক্ষেত্র। একটা চার্টার্ড প্লেন ঘুরতে ঘুরতে নামলো। সেই প্লেন আসছে নেপাল থেকে। তার ভেতর থেকে নামলো বিছানাপত্র হাতে নিয়ে আংথারকে···একজন শেরপা কুলী। চারদিক থেকে জ্বলে উঠলো ক্যামেরার আলো। দলে দলে ছুটে এলো সম্ভ্রান্ত নর-নারী, আংথারকের সঙ্গে করমর্দন করবার জন্যে। ফ্রান্সের কৃতী সন্তান মার্সেল আইজাক হাসতে হাসতে আংথারকের সামনে এসে হাত বাড়িয়ে তার হাত থেকে তার মোট-টা নিলেন। বল্লেন, আংথারকে, হিমালয়ের চূড়ায় তুমি আমাদের মোট বয়েছ, ফ্রান্সের এই সমতল ক্ষেত্রে তোমার মোট আমাকে বইতে দাও।

মার্সেল আইজাক আংথারকের কাছ থেকে জোর করে নিয়ে নিলেন তার মোট।

প্যারিসে হবে "অন্নপূর্ণার শিখর-বিজয়" ছায়াচিত্রের বিশেষ প্রদর্শন।

অন্নপূর্ণা-বিজয়ের সহচর শেরপা আংথারকে না এলে হবে না তার উদ্বোধন।

এই হলো স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি থেকে যায় মানুষের ইতিহাসের গতির সঙ্গে মিশে। আর যা কিছু, তা হলো, হাক্সলীর ভাষায় Vulgar …too vulgar.